contents

নবী-রাসুল সিরিজ-৮

কাসাসুল কুরআন-১০

হযরত ইসা আ.

মূল
মাওলানা হিফযুর রহমান সিওহারবি রহ.
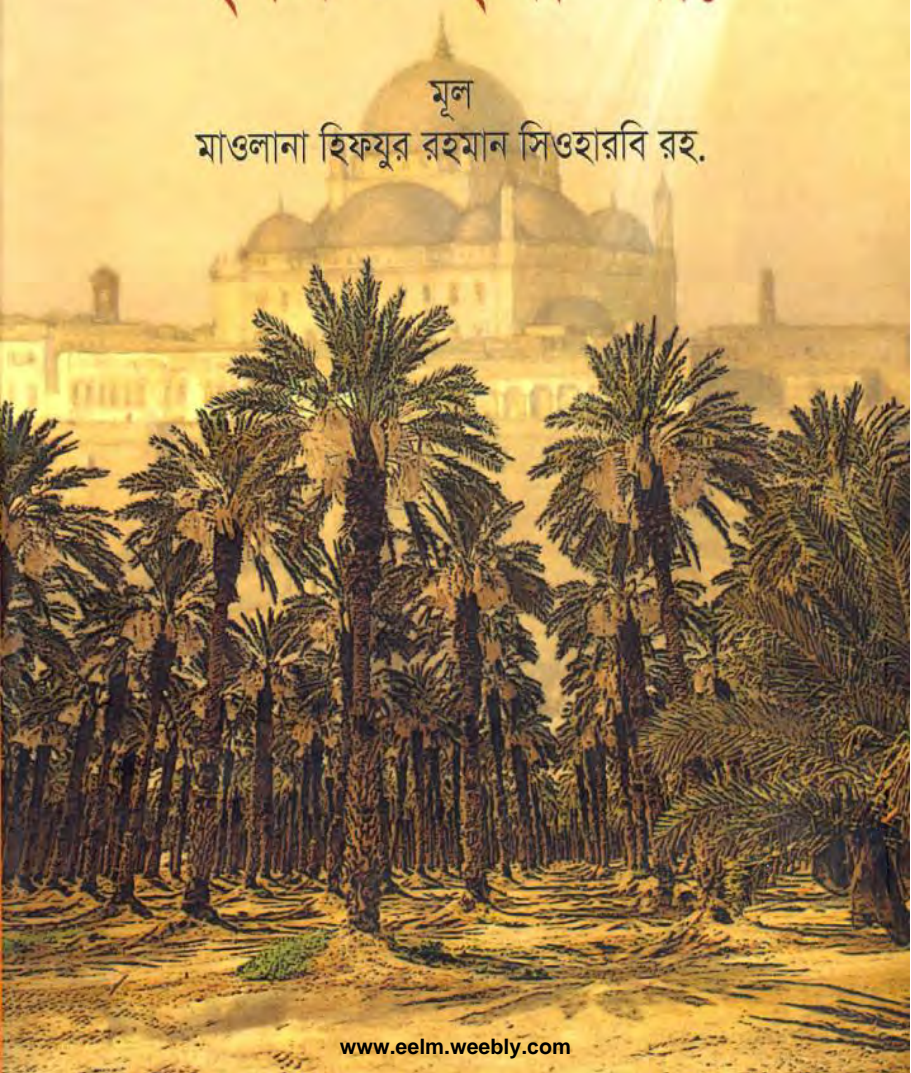
নবী-রাসুল সিরিজ-৮

কাসাসুল কুরআন-১০

হযরত ইসা আলাইহিস সালাম

মূল
মাওলানা হিফযুর রহমান সিওহারবি রহ.

অনুবাদ
মাওলানা আবদুস সাত্তার আইনী

contents

কাসাসুল কুরআন-১০
মাওলানা হিফযুর রহমান সিওহারবি রহ.

অনুবাদ
মাওলানা আবদুস সাত্তার আইনী

সম্পাদনা
মাকতাবাতুল ইসলাম সম্পাদনা বিভাগ

প্রকাশক
হাফেজ কুতুবুদ্দীন আহমাদ

প্রথম প্রকাশ
সেপ্টেম্বর, ২০১৫ খ্রি.

প্রচ্ছদ ॥ তকি হাসান

সার্বিক যোগাযোগ
মাকতাবাতুল ইসলাম
[সেরা মুদ্রণ ও প্রকাশনার অগ্রপথিক]

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র
৬৬২ আদর্শনগর, মধ্যবাড্ডা
ঢাকা-১২১২
০১৯১১৬২০৪৪৭
০১৯১১৪২৫৬১৫

বাংলাবাজার বিক্রয়কেন্দ্র
ইসলামি টাওয়ার (২য় তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
০১৯১২৩৯৫৩৫১
০১৯১১৪২৫৮৮৬

মূল্য : ২৫০ [দুইশত পঞ্চাশ] টাকা মাত্র

QASASUL QURAN [10]
Writer : Mawlana Hifjur Rahman RH
Translated by : Abdus Sattar Aini
Published by : Maktabatul Islam
Price : Tk. 250.00
ISBN : 978-984-91049-0-2
www.facebook/Maktabatul Islam
www.maktabatulislam.net

সূচি

কুরআনুল কারিম ও হযরত ইসা আলাইহিস সালাম ৬
ইমরান ও হান্নাহ ১০
হযরত মারইয়াম আলাইহিস সালাম-এর জন্মগ্রহণ ১১
হান্নাহ এবং ইশা বা ইয়াশি ১৪
হযরত মারইয়াম আলাইহিস সালাম-এর পরহেযগারি ও তাকওয়া ১৬
আল্লাহ তাআলার নৈকট্য ১৬
নারী কি নবী হতে পারেন? ১৮
নারীর নবুওত ও ইবনে হাযাম আল-আনদালুসি ২২
হযরত মারইয়াম আলাইহিস সালাম কি নবী ছিলেন? ৩১
وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ আয়াতটির উদ্দেশ্য ৩২
হযরত ইসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সুসংবাদ প্রদান ৩৫
পবিত্র জন্মগ্রহণ ৩৯
জন্মগ্রহণের সুসংবাদ ৪৮
শারীরিক গঠন ও অবয়ব ৫০
নবুওত ও রিসালাত ৫০
প্রকাশ্য মুজিযাসমূহ ৫৫
প্রণিধানযোগ্য বিষয় এবং মুজিযাসমূহের স্বরূপ ৬০
হযরত ইসা আলাইহিস সালাম এবং তাঁর শিক্ষার সারকথা ৮৫
হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর হাওয়ারি ৮৭
হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর হাওয়ারি এবং কুরআন ও ইঞ্জিলের তুলনা ৮৯
খাদ্যের খাঞ্চা নাযিল হওয়া ৯৪
জীবিত অবস্থায় আসমানে উঠিয়ে নেয়া ১০০
ভণ্ড নবীর প্রতারণা ও তার জবাব ১২৩
হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর উর্ধ্বলোকে উত্তোলিত হওয়া এবং কিছু আবেগময় উক্তি ১৪২
وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ-এর তাফসির ১৪৫

হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর জীবিত থাকা ১৪৮
আয়াত: لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ১৪৯
হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর জীবিত থাকা এবং পৃথিবীতে পুনরাগমন : সহিহ হাদিসসমূহ ১৫৮
ইসা মাসিহ আলাইহিস সালাম-এর জীবিত থাকা এবং পৃথিবীতে অবতরণের হেকমত ১৭২
সহিহ হাদিসসমূহের আলোকে অবতরণের ঘটনাবলি ১৮৮
হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর ওফাত ১৯২
আয়াত : وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ১৯৩
আয়াত : فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ২০৫
হযরত ইসা মাসিহ আলাইহিস সালাম-এর সংশোধনমূলক দাওয়াত এবং বনি ইসরাইলের বহুধা বিভক্তি ২০৯
ইঞ্জিল চতুষ্টয় ২১২
কুরআন এবং ইঞ্জিল ২২২
ইঞ্জিল এবং ইসা আলাইহিস সালাম-এর হাওয়ারিগণ ২২৭
হযরত ইসা আলাইহিস সালাম এবং বর্তমান খ্রিস্টধর্ম ২২৯
ত্রিত্ববাদ ২২৯
পিতা ২৩৫
পুত্র ২৩৬
রুহুল কুদ্‌স বা পবিত্র আত্মা ২৩৬
অন্ধকার যুগ এবং গির্জাসমূহের সংশোধনের আওয়াজ ২৩৯
পবিত্র কুরআন ও ত্রিত্ববাদের আকিদা ২৪২
হযরত ইসা মাসিহ আলাইহিস সালাম আল্লাহর সান্নিধ্যপ্রাপ্ত ও মনোনীত রাসুল ২৪৩
হযরত মাসিহ আলাইহিস সালাম আল্লাহও নন, আল্লাহর পুত্রও নন ২৪৫
প্রণিধানযোগ্য বিষয় ২৫২
কাফ্‌ফারা বা প্রায়শ্চিত্ত ২৫৩

হযরত ইসা আলাইহিস সালাম

কুরআনুল কারিম ও হযরত ইসা আলাইহিস সালাম

হযরত ইসা আলাইহিস সালাম ছিলেন উচ্চ মর্যাদাশীল ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ (أُولُو الْعَزْمِ) নবীগণের অন্যতম। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেমন সমস্ত নবী ও রাসুলের মধ্যে সর্বশেষ নবী ও রাসুল, তেমনি হযরত ইসা আলাইহিস সালাম বনি ইসরাইল বংশীয় সকল নবী ও রাসুলের মধ্যে সর্বশেষ নবী ও রাসুল। সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায়ে কেরাম এ-ব্যাপারে একমত যে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর মধ্যবর্তী সময়ে কোনো নবী বা রাসুল প্রেরিত হন নি। এই অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে, যা প্রায় ৫৭০ বছর, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ওহি অবতীর্ণ হয় নি। এটা ছিলো ওহি বন্ধ থাকার যুগ।

হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর মহান ,মর্যাদা ও মাহাত্ম্যের এটাও এটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য যে, যদি হযরত মুসা আলাইহিস সালাম বনি ইসরাইল বংশোদ্ভূত নবী ও রাসুলগণের মধ্যে ইমামের মর্যাদার অধিকারী হন, তবে হযরত ইসা আলাইহিস সালাম বনি ইসরাইল বংশোদ্ভূত নবী ও রাসুলগণের মধ্যে মুজাদ্দিদের মর্যাদার অধিকারী। কারণ, আল্লাহ তাআলার বিধান (তাওরাত)-এর পর বনি ইসরাইলের সঠিক পথ প্রদর্শন ও হেদায়েতের জন্য ইঞ্জিল (বাইবেল) ছাড়া অধিক মর্যাদাসম্পন্ন আর কোনো কিতাব নাযিল হয় নি। আর এটি একটি বাস্তবতা যে, তাওরাতের বিধানসমূহের পরিপূরক হিসেবেই ইঞ্জিল নাযিল হয়েছে। অর্থাৎ, তাওরাত নাযিল হওয়ার পর ইহুদিরা সত্যধর্মে যেসব গোমরাহি ও পথভ্রষ্টতা সৃষ্টি করেছিলো, ইঞ্জিল তাওরাতের ব্যাখ্যাকারী হয়ে বনি ইসরাইলকে ওইসব পথভ্রষ্টতাকে আত্মরক্ষার জন্য দাওয়াত প্রদান করেছে এবং এইভাবে তাওরাতের পরিপূরকের দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছে। আর বনি ইসরাইলিরা হেদায়েতের পয়গাম ও বাণীসমূহের মধ্যে যা-কিছু ভুলে গিয়েছিলো, হযরত ইসা আলাইহিস সালাম পুনরায় তাদেরকে সেসব পয়গাম ও বাণী স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন এবং রহমতের নতুন বৃষ্টিতে ওই শুষ্ক ভূমিকে দ্বিতীয়বার সজীব ও উর্বর করে তুলেছেন। তা ছাড়া হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর উচ্চ মর্যাদার আরো একটি নিমিত্ত এই যে, তিনি দো-জাহানের সরদার হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শুভাগমনের শ্রেষ্ঠ ঘোষক ও সুসংবাদ

প্রদানকারী। আর এই দুজন পবিত্র নবীর মধ্যে অতীত ও ভবিষ্যৎ—উভয় কালেই বিশেষ সংযোগ ও সম্পর্ক দেখা যায়।[১]

কুরআনুল কারিম হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গে সাদৃশ্য ও সামঞ্জস্য যে-সকল পুণ্যাত্মার ঘটনাবলি অনেক বেশি আলোচনা করেছে তাদের মধ্যে হযরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম, হযরত মুসা আলাইহিস সালাম ও হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর পবিত্র ব্যক্তিত্বসমূহ অধিক দীপ্তিমান।

হযরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম-এর ব্যক্তিত্ব التذكير بأيام الله (প্রাচীনকালে কাফেরদের ওপর আল্লাহ তাআলার যে-গযব নাযিল হয়েছিলো তার উল্লেখ করে বর্তমানকালের লোকদেরকে উপদেশ প্রদান করা)-এর জন্য এ-কারণে অধিক গুরুত্বপূর্ণ যে, যে-সত্য দীন ও আলোকিত ধর্মের উন্নতি ও পরিপূর্ণতা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্রতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আর যে-ধর্মের দাওয়াত ও তাবলিগের কেন্দ্রবিন্দু রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র সত্তা, তাকে ইবরাহিমি ধর্ম নামে নামাঙ্কিত করা হয়েছে। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন, مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ (এটা তোমাদের পিতা ইবরাহিমের মিল্লাত—ধর্মাদর্শ)। কেননা, এই বৃদ্ধ নবীই শিরকের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম আল্লাহ তাআলার তাওহিদকে 'হানিফি ধর্ম' উপাধিতে ভূষিত করেছেন এবং চিরকালের জন্য আল্লাহ তাআলার সরল ও সঠিক পথের জন্য 'মিল্লাতে ইবরাহিমিয়্যাহ'-এর বৈশিষ্ট্য প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছেন। অর্থাৎ, যারা আল্লাহ তাআলার ইবাদতের জন্য পৃথিবীর দৃশ্যমান বস্তুসমূহের উপাসনাকে উপলক্ষ বানায় তারা মুশরিক। আর যারা বিশ্বনিখিলের স্রষ্টার একত্ববাদের ঘোষণা দিয়ে সরাসরি তাঁরই এবং কেবল তাঁরই ইবাদত করে তারা হানিফ। এই পবিত্র নবী (হযরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম) আল্লাহর ইবাদতের এই বাস্তব চিন্তাকে কার্যকর পর্যায়ে এতটা উজ্জ্বল ও উন্নত করেছেন যে, ভবিষ্যতে সত্যধর্মের জন্য সেটারই অনুসরণ সত্য ও সততার মানদণ্ডে পরিণত হয়েছে এবং মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তা গ্রহণ করার এই মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে যে, এই পবিত্র নবী বিশ্বনিখিলের পথপ্রদর্শন ও হেদায়েতের

[১] যথাস্থানে বিস্তারিত আলোচনা থাকবে।

সবচেয়ে বড় ইমাম বা মুজাদ্দিদে আজম সাব্যস্ত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারিমে নির্দেশ দিয়েছেন—

فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا

"তোমরা একনিষ্ঠ ইবরাহিমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ করো।" [সুরা আলে ইমরান : আয়াত ৯৫]

অর্থাৎ, তোমরা তোমাদের পূর্বপুরুষ ইবরাহিমের ধর্মের অনুসরণ করো, যিনি সবধরনের বাতিল ও শিরক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একমাত্র আল্লাহ-অভিমুখী হয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَٰذَا

"এটা তোমাদের পিতা ইবরাহিমের মিল্লাত ধর্মাদর্শ। তিনি পূর্বে তোমাদের নামকরণ করেছেন মুসলিম[২] এবং এই কিতাবেও।" [সুরা হজ : আয়াত ৭৮]

আর হযরত মুসা আলাইহিস সালাম-এর পবিত্র জীবনের আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ এ-কারণে যে, তাঁর দাওয়াত ও তাবলিগের ঘটনাবলি—তাঁর জাতির মূর্খতা, নাফরমানি, আল্লাহর শত্রুদের সঙ্গে সংঘাত, অবিরাম দুঃখ-দুর্দশায় ধৈর্য ধারণ করা ও দৃঢ় থাকা—এবং এ-জাতীয় অন্যান্য বিষয়ে তাঁর ও হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মধ্যে খুব বেশি সাদৃশ্য ও সামঞ্জস্য পাওয়া যায়। আর এ-কারণে সেসব ঘটনাবলি ও অবস্থাবলি সত্যকে গ্রহণ ও সত্যকে অস্বীকার এবং তার পরিফল ও পরিণামের ধরাবাহিকতায় শিক্ষা ও উপদেশের উপকরণ যোগিয়ে দেয় এবং দৃষ্টান্ত ও সাক্ষ্য হওয়ার মর্যাদা রাখে। আর হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর পবিত্র জীবনের পবিত্র আলোচনা উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্বের ভিত্তিতে বিশেষ গুরুত্ব রাখে।

মোটকথা, কুরআনুল কারিম হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর জীবনের অবস্থা ও ঘটনাবলিকে বিস্তারিত ও পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা করেছে। তাঁর পবিত্র জীবনের সূচনারূপে তাঁর সম্মানিতা মাতা হযরত মারইয়াম আলাইহিস সালাম-এর জীবনের ঘটনাবলিকেও উজ্জ্বল করে দিয়েছে যাতে কুরআনুল

---

[২] মুসলিম ও হানিফ শব্দদুটির ভাবার্থ এক। মুসলিম শব্দের অর্থ আল্লাহ তাআলার অনুগত; আর হানিফ শব্দের অর্থ যাবতীয় বিষয়-আশয় থেকে বিমুখ হয়ে একমাত্র আল্লাহ-অভিমুখী।

কারিমের উদ্দেশ্য— التذكير بأيام الله (প্রাচীনকালে কাফেরদের ওপর আল্লাহ তাআলার যে-গযব নাযিল হয়েছিলো তার উল্লেখ করে বর্তমানকালের লোকদেরকে উপদেশ প্রদান করা) সফল হয়েছে।

কুরআনুল কারিমের তেরোটি সুরায় এই পবিত্র আলোচনা করা হয়েছে। তার মধ্যে কোনো কোনো জায়গায় তাঁর নাম ইসা (ইয়াসু) বলা হয়েছে, আবার কোনো কোনো জায়গায় 'মাসিহ' ও 'আবদুল্লাহ' উপাধিতে আর কোনো স্থানে 'ইবনে মারইয়াম' বলে তাঁকে উল্লেখ করা হয়েছে।

নিম্নের নকশাটি উপরিউক্ত বিষয়কে স্পষ্ট করে দেবে এবং পাঠকদের জ্ঞানলাভের জন্য সহায়ক হবে।

সুরার নাম	আয়াত সংখ্যক	ইসা	মাসিহ	আবদুল্লাহ	ইবনে মারইয়াম	আয়াত-সংখ্যা
আল-বাকারা	৮৭, ১৩৬, ১৩৭, ১৩৮, ২৫৩	৩	-	-	২	৫
আলে ইমরান	৪২, ৪৬, ৮৪	৫	১	-	১	২৪
আন-নিসা	১৫৬, ১৫৯, ১৭১, ১৭২	৩	৩	-	২	৬
আল-মায়িদা	১৭, ৪৬, ৭২, ৭৫, ৭৮, ১১০, ১২০	৬	৫		১০	১৮
আনআম	৮৫	১	-	-	-	১
তাওবা	২০, ৩১	-	১	-	১	২
মারইয়াম	১৬-৩৫	১	১	১	১	১৯
মুমিনুন	৫০	১	-	-	১	১
আল-আহযাব	৭-৮	১	-	-	১	২
আশ-শুরা	১৩	১	-	-	-	১
আয-যুখরুফ	৫৭-৬৩	১	-	-	১	২
আল-হাদিদ	২৭	১	-	-	১	১
আস-সাফ	৬-১৪	২	-	-	২	২

contents

ইমরান ও হান্নাহ

হযরত যাকারিয়া ও হযরত ইয়াহইয়া (আলাইহিমাস সালাম)-এর ঘটনাবলিতে আলোচনা করা হয়েছে যে, বনি ইসরাইলের মধ্যে ইমরান একজন আবেদ ও সংসারত্যাগী লোক ছিলেন। তাঁর সংসার ত্যাগ ও ইবাদতের কারণে নামাযের ইমামতির দায়িত্বও তাঁর ওপর ন্যস্ত ছিলো। ইমরানের স্ত্রী হান্নাও অত্যন্ত পরহেযগার ও আবেদা নারী ছিলেন। নিজেদের সৎকাজ ও সদাচারের কারণ তাঁরা স্বামী-স্ত্রী দুজনই বনি ইসরাইলের কাছে অত্যন্ত প্রিয় ও গ্রহণযোগ্য ছিলেন।[৩]

মাগাযি বা যুদ্ধের ঘটনাবলির সংকলক মুহাম্মদ বিন ইসহাক রহ. ইমরানের বংশপরম্পরার বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে—

هو عمران بن ياشم بن أمون بن ميشا بن حزقيا بن أحريق بن يوثم بن عزاريا ابن أمصيا بن ياوش بن أجريهو بن يازم بن يهفاشاط بن إنشا بن أبيان بن رخيعم بن سليمان بن داود، عليهما السلام.

ইমরান বিন ইয়াশিম বিন আমুন বিন মিশা বিন হিযকিয়া বিন আহরিক বিন ইউসাম বিন আযারিয়া (বা আযাযিয়া) বিন আমসিয়া বিন ইয়াওয়াশ বিন আজরিহু বিন ইয়াযাম বিন ইয়াহফাশাত বিন ইনশা বিন আবইয়ান (বা আসান বা আয়ান) বিন রাখিআম বিন সুলাইমান বিন দাউদ আলাইহিমাস সালাম।

আর ইবনুল আসাকির এই নামগুলো ছাড়া অন্যান্য নাম বর্ণনা করেছেন। এই দুটি বর্ণনার মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ লক্ষ করা যায়। তারপরও বংশবিদ্যায় বিশেষজ্ঞ উলামায়ে কেরাম এ-ব্যাপারে একমত যে, ইমরান হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম-এর বংশধর। আর হান্নাহ বিনতে ফাকুয বিন কাবিলও হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম-এর বংশের।[৪]

ইমরান নিঃসন্তান ছিলেন। তাঁর স্ত্রী হান্নাহ প্রচণ্ড আকাঙ্ক্ষিণী ছিলেন যে, তাদের একটি সন্তান হোক। এইজন্য তিনি সবসময় আল্লাহ তাআলার দরবারে দোয়া করতেন এবং কবুল হওয়ার অপেক্ষায় থাকতেন।

[৩] তাফসিরে ইবনে কাসির, প্রথম খণ্ড, সুরা আলে ইমরান।
[৪] তাফসিরে ইবনে কাসির, প্রথম খণ্ড, সুরা আলে ইমরান।

কথিত আছে যে, একদিন হান্নাহ তাঁর গৃহের আঙ্গিনায় পায়চারি করছিলেন। ইতোমধ্যে তিনি দেখতে পেলেন যে, একটি পাখি তার ছানাকে খাওয়াচ্ছে। এই দৃশ্য দেখে হান্নাহর অন্তর অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো এবং সন্তানলাভের আকাঙ্ক্ষা তাঁর ভেতরে উথলে উঠলো। এই অস্থির অবস্থায় আল্লাহ তাআলার দরবারে প্রার্থনা করার জন্য তিনি হাত উঠালেন এবং নিবেদন করলেন, 'হে আমার প্রতিপালক, এইভাবে আমাকেও সন্তান দান করুন, যে হবে আমাদের চোখের আলো এবং আত্মার প্রশান্তি।' হৃদয়ের গভীরতা থেকে উৎসারিত প্রার্থনা আল্লাহ তাআলা মঞ্জুর করলেন। হান্নাহ কয়েকদিন পর অনুভব করলেন যে, তিনি গর্ভবতী। এই অনুভূতির ফলে হান্নাহ আনন্দে এতটাই উদ্বেলিত হলেন যে, তিনি মান্নত করলেন, আমার গর্ভ থেকে যে-সন্তান ভূমিষ্ঠ হবে আমি তাকে পবিত্র উপাসনাগৃহ (মসজিদুল আকসা)-এর খেদমতের জন্য ওয়াক্‌ফ করে দেবো।'[৫]

যাই হোক, আল্লাহ তাআলা ইমরানের স্ত্রী হান্নাহর দোয়া কবুল করলেন এবং তিনি আনন্দের সঙ্গে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হওয়ার মুহূর্তটির প্রতীক্ষা করতে থাগলেন।

বিশর বিন ইসহাক বলেন, হান্নাহ তখনো গর্ভবতী ছিলেন, ইতোমধ্যে তাঁর স্বামী ইমরান ইন্তিকাল করলেন।[৬]

হযরত মারইয়াম আলাইহিস সালাম-এর জন্মগ্রহণ

যখন গর্ভকাল পূর্ণ হয়ে প্রসবের সময় এলো, হান্নাহ জানতে পারলেন যে, তিনি একটি কন্যাসন্তান প্রসব করেছেন। সন্তানের বিবেচনায় হান্নাহর এই কন্যাও পুত্রের চেয়ে কম ছিলো না; কিন্তু তার এই আক্ষেপ অবশ্যই হয়েছিলো যে, 'আমি যে-মান্নত করেছিলাম তা তো পূর্ণ হতে পারবে না। কারণ, আমার কন্যা কী করে মসজিদের খেদমত করবে?' কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাঁর আক্ষেপকে বদলে দিলেন এই কথা বলে যে, 'আমি

---

[৫] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, দ্বিতীয় খণ্ড। বনি ইসরাইলে ধর্মীয় প্রথাগুলোর মধ্যে নিজেদের সন্তানদেরকে পবিত্র উপাসনাগৃহের জন্য ওয়াক্‌ফ করে দেয়ার প্রথাকে অত্যন্ত পবিত্র মনে করা হতো।

[৬] ফাতহুল বারি, ষষ্ঠ খণ্ড, ৩৬৪ পৃষ্ঠা।

তোমার এই কন্যাকেই কবুল করলাম এবং এ-কারণে তোমার বংশও সম্মানিত ও পবিত্র বলে সাব্যস্ত হলো।' হান্নাহ তাঁর কন্যার নাম রাখলেন 'মারইয়াম'। সুরিয়ানি ভাষায় মারইয়াম শব্দটির অর্থ খাদেম।[৭] তাঁকে পবিত্র উপাসনাগৃহের সেবার জন্য নিয়োজিত করা হয়েছিলো বলে এই নামটি সঙ্গত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়েছিলো।[৮]

কুরআনুল কারিম এই ঘটনাকে অলৌকিক সংক্ষিপ্ততার সঙ্গে বর্ণনা করেছে এভাবে—

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ () ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ () إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ () فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ () فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا (سورة آل عمران)

"নিশ্চয় আল্লাহ আদমকে, নুহকে ও ইবরাহিমের বংশধর ও ইমরানের বংশধরকে (নিজ নিজ যুগে) বিশ্বজগতে মনোনীত করেছেন। তারা একে অপরের বংশধর। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। স্মরণ করো, যখন ইমরানের স্ত্রী বলেছিলো, 'হে আমার প্রতিপালক, আমার গর্ভে যা (যে-সন্তান) আছে আমি তা একান্ত তোমার জন্য উৎসর্গ করলাম। সুতরাং, তুমি আমার পক্ষ থেকে তা কবুল করো। নিশ্চয় তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।' তারপর সে যখন তাকে প্রসব করলো, সে বললো, 'হে আমার প্রতিপালক, আমি কন্যা প্রসব করেছি।' সে যা প্রসব করেছে আল্লাহ তা সম্যক অবগত। 'আর ছেলে তো মেয়ের মতো নয়। (অর্থাৎ, উপসনাগৃহের সেবা পুত্র করতে পারে, কন্যা পারে না।) আমি তার নাম মারইয়াম রেখেছি এবং অভিশপ্ত শয়তান থেকে তাকে ও তার বংশধরকে তোমার আশ্রয়ে প্রদান করছি।' তারপর তার প্রতিপালক তাকে ভালোরূপে কবুল করলেন এবং তাকে উত্তমরূপে লালন-পালন করলেন

---

[৭] ফাতহুল বারি, ষষ্ঠ খণ্ড, ৩৬৫ পৃষ্ঠা।

[৮] [illegible]

এবং তিনি তাকে যাকারিয়ার তত্ত্বাবধানে রেখেছিলেন।" [সূরা আলে ইমরান : আয়াত ৩৩-৩৭]

হযরত মারইয়াম আলাইহিস সালাম বুদ্ধি ও বিবেচনার বয়সে পৌঁছলেন এবং এই প্রশ্ন উত্থিত হলো যে, পবিত্র উপাসনাগৃহের (মসজিদের) এই আমানত কার হাতে অর্পণ করা হবে। কাহিনদের[৯] মধ্যে প্রত্যেকেই এই আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করলেন যে, এই পবিত্র আমানতের তত্ত্বাবধায়ক আমাকে বানানো হোক। কিন্তু এই আমানতের তত্ত্বাবধানের জন্য হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালাম-এর চেয়ে অধিক উপযুক্ত আর কেউ ছিলেন না। কারণ তিনি হযরত মারইয়াম আলাইহিস সালাম-এর খালা ঈশা (ایشاع) বা ইয়াশি (الیشیع)-এর স্বামী ছিলেন, পবিত্র উপাসনাগৃহের সম্মানিত কাহিন এবং আল্লাহ তাআলার নবীও ছিলেন। এ-কারণে তিনি সবার আগে নিজের নাম পেশ করলেন। কিন্তু প্রত্যেক কাহিনই এই একই ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। ফলে তাঁদের পরস্পরের মধ্যে কলহের সম্ভাবনা দেখা দিলে তাঁরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, লটারির সাহায্যে এই সমস্যার সমাধান করা হোক। ইসরাইলি রেওয়ায়েতসমূহে দেখা যায় যে, তিনবার লটারি করা হয়েছিলো। কাহিনগণ তাঁদের নিজ নিজ কলম নদীতে নিক্ষেপ করলেন; কিন্তু লটারির শর্তে প্রত্যেক বারই যাকারিয়া আলাইহিস সালাম-এর নাম এলো। কাহিনগণ দেখলেন যে, এই ব্যাপারে যাকারিয়া আলাইহিস সালাম-এর সঙ্গে গায়বি সাহায্য রয়েছে। তখন তাঁরা সবাই আনন্দের সঙ্গে এই সিদ্ধান্ত মেনে নিলেন। এইভাবে পবিত্র আমানত হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালাম-এর হাতে ন্যস্ত হলো।

কথিত আছে যে, হযরত মারইয়াম আলাইহিস সালাম-এর তত্ত্বাবধানের এই বিষয়টির প্রয়োজন ছিলো এই জন্য যে, তিনি এতিম ছিলেন। তাঁর কোনো পুরুষ অভিভাবক ছিলো না। কেউ কেউ বলেন, সেই সময় ভীষণ দুর্ভিক্ষ ছিলো। কাজেই লালনপালনের ভার গ্রহণের প্রয়োজন পড়েছিলো।[১০] কিন্তু এই দুটি ব্যাপার না হলেও তত্ত্বাবধানের প্রশ্নটি যথাস্থানে বহাল থাকতো। কেননা, মারইয়াম আলাইহিস সালাম তাঁর

---

[৯] ওই সকল পবিত্রাত্মা যাঁরা উপসনাগৃহে ধর্মীয় সংস্কার পালন করতেন এবং উপসনাগৃহের সেবার জন্য নিযুক্ত ছিলেন।

[১০] তাফসিরে ইবনে কাসির : প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৬০।

মায়ের মান্নত অনুযায়ী মসজিদের জন্য উৎসর্গিত হয়েই গিয়েছিলেন। তবে তিনি বালিকা হওয়ার কারণে এটা একান্ত জরুরি ছিলো যে, তিনি কোনো সৎ লোকের তত্ত্বাবধানে থেকে মসজিদের খেদমতের কাজ সম্পন্ন করেন।

মোটকথা, হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালাম হযরত মারইয়াম আলাইহিস সালাম-এর নারীসুলভ মান ও মর্যাদার প্রেক্ষিতে পবিত্র উপাসনাগৃহের পাশেই তাঁর জন্য একটি কক্ষ নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন, যাতে দিবাভাগে তাতে অবস্থান করে আল্লাহর তাআলার ইবাদতে মগ্ন থাকতে পারেন। রাতের বেলায় তাঁকে তাঁর খালাম্মা আল-ইয়াশির কাছে নিয়ে যাওয়া হতো এবং তিনি ওখানেই রাত্রিযাপন করতেন।[১১]

হান্নাহ এবং ইশা বা ইয়াশি

ইবনে কাসির বলেন, জমহুর উলামায়ে কেরামের মত এই যে, ইশা (আল-ইয়াশি) হযরত মারইয়াম আলাইহিস সালাম-এর সহোদর ভগ্নি ছিলেন। মিরাজ শরিফের হাদিসে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত ইসা আলাইহিস সালাম ও হযরত ইয়াহইয়া আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বলেছেন, هما ابنا خالة 'তারা দুইজন পরস্পর খালাতো

---

[১১] তাফসিরে রুহুল মাআনি : সুরা আলে ইমরান।

মাওলানা আবুল কালাম আযাদ 'তরজুমানুল কুরআন'-এ লিখেছেন, কুরআনুল কারিমের দুই জায়গায় হযরত মাসিহ আলাইহিস সালাম-এর আবির্ভাবের আলোচনা অধিক বিস্তারিতভাবে করা হয়েছে। এই আয়াতগুলোতে এবং সুরা আলে ইমরানের ৩৫-৬৩ সংখ্যক আয়াতসমূহে। এখানে হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালাম-এর দোয়া এবং হযরত ইয়াহইয়া আলাইহিস সালাম-এর জন্মলাভের বর্ণনার সঙ্গে শুরু করা হয়েছে। আর ইঞ্জিল চতুষ্টয়ের মধ্যে লুকের ইঞ্জিলও হুবহু এইরূপেই আলোচনাটি শুরু করেছে। কিন্তু সুরা আলে ইমরানে এই আলোচনা এরও পূর্বের একটি ঘটনার সঙ্গে, অর্থাৎ, হযরত মারইয়াম আলাইহিস সালাম-এর জন্ম এবং পবিত্র উপাসনাগৃহে তাঁর প্রতিপালিত হওয়ার ঘটনা থেকে শুরু হয়েছে। এ-ব্যাপারে চারটি ইঞ্জিলই নীরব। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে পরিত্যাগকৃত ইঞ্জিলসমূহের যে-কপি ভ্যাটিকান লাইব্রেরিতে পাওয়া গেছে, তা হযরত মারইয়াম আলাইহিস সালাম-এর জন্মবৃত্তান্তের এই হারানো অংশটুকু সরবরাহ করেছে। তা থেকে বুঝা যায় যে, খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত বিবরণের এই অংশটুকু তেমনই ইলহামি (আল্লাহ প্রদত্ত বাণী) বিশ্বাস করা হতো, যেমন অন্যান্য অংশকে বিশ্বাস করা হয়। [তরজুমানুল কুরআন, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৪৩]

ভাই।' এই হাদিসে জমহুর উলামায়ে কেরামের মতেরই সমর্থন পাওয়া যায়।

কিন্তু তাদের এই মত কুরআনুল কারিম ও ইতিহাসের বিপরীত। কেননা, কুরআনুল কারিম হযরত মারইয়াম আলাইহিস সালাম-এর জন্মবৃত্তান্তকে যেভাবে বর্ণনা করেছে তা থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, ইমরান ও হান্নাহ হযরত মারাইয়াম আলাইহিস সালাম-এর জন্মের পূর্বে সম্পূর্ণরূপে নিঃসন্তান ছিলেন। এ-কারণেই হান্নাহ হযরত মারইয়াম আলাইহিস সালাম-এর জন্মের পর এ-কথা বলেন নি যে, 'হে আল্লাহ, আগেও আমার একটি কন্যা সন্তান ছিলো, এখন আবারো আপনি আমাকে একটি কন্যাই দান করলেন!' বরং আল্লাহ তাআলার দরবারে তিনি এমন প্রার্থনা করেছিলেন, 'হে আল্লাহ, যে-আকারে আপনি আমার দোয়া কবুল করলেন, তাকে আমার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আপনার উদ্দেশ্যে কেমন করে উৎসর্গ করবো?'

তা ছাড়া তাওরাত ও বনি ইসরাইলের ইতিহাসেও কোথাও কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় নি যে, হযরত মারইয়াম আলাইহিস সালাম ছাড়া ইমরান ও হান্নাহ দম্পত্তির অন্যকোনো সন্তান ছিলো। বরং তার বিপরীতে ইহুদিদের ইতিহাস ও ইসরাইলি রেওয়ায়েতসমূহের বিখ্যাত বক্তব্য এই যে, ইশা (আল-ইয়াশি) হযরত মারইয়াম আলাইহিস সালাম-এর খালা ছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে জমহুর উলামায়ে কেরামের প্রতি সম্পর্কিত বক্তব্যটি কেবল মিরাজের হাদিসের উল্লিখিত উক্তি অনুযায়ীই প্রকাশ পেয়েছে। অথচ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যবহারিক অর্থে هما ابنا خالة 'তারা পরস্পর খালাতো ভাই' বলেছেন। অর্থাৎ, তিনি মায়ের খালাকে ইসা আলাইহিস সালাম-এর খালা বলেছেন। এমন ব্যাপকার্থের ব্যাপার ভাষায় প্রচুর আছে।

তা ছাড়া ইবনে কাসির রহ. যে একে জমহুর উলামায়ে কেরামের অভিমত বলেছেন তা-ও প্রশ্নতীত নয়। কেননা, মুহাম্মদ বিন ইসহাক, ইসহাক বিন বিশর, ইবনে আসাকির, ইবনে জারির, ইবনে হাজার আসকালানি (রহিমাহুমুল্লাহ)-এর মতো উচ্চ মর্যাদাশীল মুহাদ্দিসিনে কেরাম ও ইতিহাসবিদগণ এই মতই পোষণ করেছেন যে, ইশা (ইয়াশি) হান্নাহর সহোদর বোন এবং হযরত মারইয়াম আলাইহিস সালাম-এর খালা, হান্নাহর কন্যা নন।

হযরত মারইয়াম আলাইহিস সালাম-এর পরহেযগারি ও তাকওয়া

হযরত মারাইয়াম আলাইহিস সালাম দিনরাত আল্লাহ তাআলার ইবাদতে মশগুল থাকতেন। আর উপাসনাগৃহের (মসজিদের) খেদমতে যখন তাঁর পালা আসতো, তখন তিনি সেই খেদমতও যথাযথভাবে পালন করতেন। এমনকি তার পরহেযগারি ও তাকওয়া বনি ইসরাইলের মধ্যে দৃষ্টান্তমূলক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। মানুষ তাঁর পরহেযগারি ও তাকওয়াকে উদাহরণস্বরূপ পেশ করতো।

আল্লাহ তাআলার নৈকট্য

হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালাম হযরত মারইয়াম আলাইহিস সালাম-এর প্রয়োজনীয় তত্ত্বাবধানের জন্য মাঝে মাঝে তাঁর কক্ষে যেতেন। কিন্তু তিনি একটি ব্যাপার দেখে বিস্মিত হতেন যে, যখন তিনি মারইয়াম আলাইহিস সালাম-এর নির্জন প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করতেন, অধিকাংশ সময় সেখানে বে-মৌসুমি তাজা ফল দেখতে পেতেন।[১২] তাই হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালাম জিজ্ঞেস না করে থাকতে পারলেন না যে, 'মারইয়াম, তোমার কাছে বে-মৌসুমের ফল কোথা থেকে আসে?' মারইয়াম আলাইহিস সালাম বললেন, 'এটা আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহের দান। যিনি যাকে ইচ্ছা ধারণাতীতভাবে রিযিক দান করে থাকেন। হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালাম এই কথা শুনে বুঝতে পারলেন যে, আল্লাহ তাআলার দরবারে মারইয়াম আলাইহিস সালাম-এর বিশেষ মর্যাদা ও সম্মান রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে এই বে-মৌসুমের ফলের ঘটনাটি তাঁর অন্তরে এই আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করলো যে, যে-আল্লাহ তাঁর পূর্ণ কুদরতের মাধ্যমে বে-মৌসুমে এই ফল সৃষ্টি করেছেন, তিনি আমাকে এই বৃদ্ধকালে এবং আমার স্ত্রী বন্ধ্যা হওয়া

---

[১২] এই বিবরণটি তাফসিরসমূহের রেওয়ায়েত থেকে গৃহীত। কুরআনুল কারিমের আয়াতে শুধু 'রিযক' শব্দের উল্লেখ রয়েছে। আয়াত থেকে এ-কথা পরিষ্কার বুঝা যায় যে, মারইয়াম আলাইহিস সালাম-এর কাছে এসব বস্তু মানুষের দান ছিলো না। বরং মারইয়াম আলাইহিস সালাম-এর কারামতস্বরূপ তা আল্লাহর পক্ষ থেকে আসতো। সুতরাং তা সাধারণ ও স্বাভাবিক কিছু না হয়ে অসাধারণ ও অলৌকিক কিছু হতো।

সত্ত্বেও আমাকে বে-মৌসুমের ফল (পুত্র) দান করবেন না? এই ভেবে তিনি অত্যন্ত বিনয় ও মিনতির সঙ্গে আল্লাহ তাআলার দরবারে দোয়া করলেন। তখন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে দোয়া কবুল হওয়ার সুখবর প্রদান করা হলো। এই বিষয়টি কুরআনুল কারিমে ব্যক্ত করা হয়েছে এভাবে—

وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (سورة آل عمران)

"এবং তিনি তাকে যাকারিয়ার তত্ত্বাবধানে রেখেছিলেন। যখনই যাকারিয়া কক্ষে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যেতো তখনই তার কাছে খাদ্যসামগ্রী দেখতে পেতো। সে বলতো, 'হে মারইয়াম, এইসব তুমি কোথায় পেলে?' সে বলতো, 'তা আল্লাহর কাছ থেকে।' নিশ্চয় আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত রিযিক দান করেন।" [সুরা আলে ইমরান : আয়াত ৩৭]

হযরত মারইয়াম আলাইহিস সালাম এইভাবেই এক দীর্ঘকাল পর্যন্ত তাঁর পবিত্র দায়িত্ব পালনের সঙ্গে সঙ্গে পবিত্র জীবনযাপন করতে থাকলেন। পবিত্র উপাসনাগৃহের সবচেয়ে পবিত্র খাদেম হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালাম-ও তাঁর পরহেযগারি ও তাকওয়া দেখে অত্যন্ত প্রভাবিত হলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর মাহাত্ম্য ও উচ্চ মর্যাদা আরো বৃদ্ধি করে দেন এবং ফেরেশতাদের মাধ্যমে তাঁকে আল্লাহর দরবারে মনোনীত হওয়ার সুসংবাদ প্রদান করেন—

وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ () يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ () ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ (سورة آل عمران)

"স্মরণ করো, যখন ফেরেশতাগণ বলেছিলো, 'হে মারইয়াম, আল্লাহ তোমাকে মনোনীত ও পবিত্র করেছেন এবং বিশ্বের নারীগণের মধ্যে তোমাকে মনোনীত করেছেন। হে মারইয়াম, তোমার প্রতিপালকের অনুগত হও ও সিজদা করো এবং যারা রুকু করে তাদের সঙ্গে রুকু

করো।' এটা অদৃশ্য বিষয়ের সংবাদ—যা তোমাকে ওহি দ্বারা অবহিত করছি। মারইয়ামের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব তাদের মধ্যে কে গ্রহণ করবে তার জন্য যখন তারা কলম[১৩] নিক্ষেপ করছিলো তখন তুমি তাদের কাছে উপস্থিত ছিলে না এবং তারা যখন বাদানুবাদ করছিলো, তখনো তুমি তাদের কাছে ছিলে না।" [সুরা আলে ইমরান : আয়াত ৩২-৪৪]

যখন হযরত মারইয়াম আলাইহিস সালাম চূড়ান্ত রিয়াযত, ইবাদত, পরহেযগারি, তাকওয়া ও পবিত্রতার ক্ষেত্রে দৃষ্টান্তস্বরূপ ছিলেন এবং যখন তিনি অচিরকালের মধ্যেই উচ্চ মর্যাদাশীল নবী হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর সম্মানিত মাতা হওয়ার মর্যাদার অধিকারিণী হবেন, তখন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তাঁর সম্মান ও পবিত্রতার এই ঘোষণা নিঃসন্দেহে প্রকৃত হকদারের উদ্দেশ্যেই হয়েছে। তো জ্ঞান ও ইতিহাসের দিক থেকে, বরং স্বয়ং কুরআনুল কারিম ও হাদিসসমূহের মর্মার্থের প্রেক্ষিতে এটি একটি প্রণিধানযোগ্য বিষয় যে, وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ আয়াতটির উদ্দেশ্য কী। কাউকে বাদ না দিয়ে পৃথিবীর সমস্ত নারীর উপরই হযরত মারইয়াম আলাইহিস সালাম-এর মর্যাদা ও ফযিলত অধিক? কেবল তা-ই নয়, বরং ফযিলতের এই আয়াতটি প্রাথমিক যুগের উলামায়ে কেরামের মধ্যে হযরত মারইয়াম আলাইহিস সালাম সম্পর্কে কয়েকটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচ্য করে তুলেছিলো : ১. নারী কি নবী হতে পারে? ২. হযরত মারইয়াম আলাইহিস সালাম কি নবী ছিলেন? যদি তিনি নবী না-ই ছিলেন তবে وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ আয়াতটির উদ্দেশ্য কী?

নারী কি নবী হতে পারেন?

মুহাম্মদ বিন ইসহাক, শায়খ আবুল হাসান আশাআরি, কুরতুবি, ইবনে হাযাম (নাওওয়ারাল্লাহু মারকাদাহুম) এই মত পোষণ করেছেন যে, হযরত হাওয়া আলাইহিস সালাম সারা, হাজেরা, মুসা আলাইহিস সালাম-এর মা, (ফেরআউনের স্ত্রী) আসিয়া ও হযরত মারইয়াম

---

[১৩] এর এক অর্থ লিখনি, আরেক অর্থ তীর।

আলাইহিস সালাম নবী ছিলেন। আর মুহাম্মদ বিন ইসহাক রহ. বলেন, অধিকাংশ ফুকাহা (ফেকাহ শাস্ত্রবিদ) এই মত পোষণ করেছেন যে, নারী নবী হতে পারেন। আর ইমাম কুরতুবি রহ. বলেন, মারইয়াম আলাইহিস সালাম নবী ছিলেন।

এই মনীষীদের বক্তব্যের বিপরীতে খাজা হাসান বসরি, ইমামুল হারামাইন, শায়খ আবদুল আযিয এবং কাজি ইয়ায (নাওওয়ারাল্লাহু মারকাদাহুম) এই মত পোষণ করেছেন যে, নারী নবী হতে পারেন না। সুতরাং, মারইয়াম আলাইহিস সালাম-ও নবী ছিলেন না। কাজি ইয়ায ও ইবনে কাসির এটাও বলেন যে, জমহুর উলামায়ে কেরামের অভিমত এটাই। আর ইমামুল হারামাইন তো এই অভিমতের ক্ষেত্রে ইজমায়ে উম্মতের (উম্মত ঐকমত্যের) দাবি করেন। যে-সকল উলামায়ে কেরাম নারীর নবী হতে না পারার পক্ষপাতী, তাঁরা তাঁদের বক্তব্যের প্রমাণে এই আয়াতটি পেশ করে থাকেন—

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

"তোমার পূর্বে আমি ওহিসহ পুরুষই প্রেরণ করেছিলাম, তোমরা যদি না জানো তবে জ্ঞানীগণকে[১৪] জিজ্ঞেস করো।" [সুরা নাহল : আয়াত ৪৩]

আর বিশেষ করে হযরত মারইয়াম আলাইহিস সালাম-এর নবী না হওয়ার এই প্রমাণ পেশ করেন যে, কুরআনুল কারিম তাঁকে 'সিদ্দিকা' বলেছে। সুরা মায়েদার একটি আয়াতে আছে—

مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ (سورة المائدة)

"মারইয়াম তনয় মাসিহ তো কেবল একজন রাসুল। তার পূর্বে অনেক রাসুল গত হয়েছে এবং তার মা সত্যনিষ্ঠ ছিলো।" [সুরা মায়িদা : আয়াত ৭৫]

আর সুরা নিসায় কুরআনুল কারিম আল্লাহ তাআলার নেয়ামতপ্রাপ্ত লোকদের যে-তালিকা করেছে তা এ-কথার অকাট্য প্রমাণ যে, 'সিদ্দিক'-এর মর্যাদা নবীর মর্যাদার চেয়ে কম এবং নিম্নস্তরের।[১৫]

---

[১৪] আল্লাহর প্রেরিত জ্ঞান যাদের আছে তাদের জিজ্ঞেস করো।

[১৫] আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

আর যারা নারীর নবী হতে পারার পক্ষপাতী তাঁরা বলেন, কুরআনুল কারিম হযরত সারা, মুসা আলাইহিস সালাম-এর মা এবং হযরত মারইয়াম আলাইহিস সালাম সম্পর্কে যেসব ঘটনা প্রকাশ করেছে তাতে পরিষ্কারভাবে বিদ্যমান রয়েছে যে, তাঁদের কাছে আল্লাহ তাআলার ফেরেশতা ওহি নিয়ে নাযিল হয়েছিলেন এবং তাঁদেরকে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সুসংবাদ প্রদান করেছেন। আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের মাধ্যমে তাঁদের কাছে তাঁর পরিচয় ও ইবাদতের হুকুম পৌঁছে দিয়েছেন। যেমন, হযরত সারার জন্য সুরা হুদে ও সুরা আয-যারিয়াতে, মুসা আলাইহিস সালাম-এর মাতার জন্য সুরা কাসাসে এবং হযরত মারইয়াম আলাইহিস সালাম-এর জন্য সুরা মারইয়ামে ও সুরা আলে ইমরানে ফেরেশতাদের মাধ্যমে ফেরেশতাদের মাধ্যমে ও সরাসরি আল্লাহ তাআলার সম্বোধন বিদ্যমান রয়েছে। জানা কথা যে, এসব স্থানে وحی শব্দের আভিধানিক অর্থ (আত্মিক হেদায়েত বা ইলহাম বা অদৃশ্য ইঙ্গিত) উদ্দেশ্য নয়। যেমন—وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ "তোমার প্রতিপালক মৌমাছিকে তার অন্তরে ইঙ্গিত[১৬] দ্বারা নির্দেশ দিয়েছেন।"[১৭] এই আয়াতে মৌমাছির জন্য وحی শব্দ ব্যবহার করেছেন।

আর বিশেষ করে মারইয়াম আলাইহিস সালাম-এর নবী হওয়ার স্পষ্ট প্রমাণ এই যে, সুরা মারইয়ামে তাঁর উল্লেখ করা হয়েছে সেই বিশেষ পদ্ধতির মাধ্যমে যে-পদ্ধতিতে অন্য আম্বিয়ায়ে কেরামের আলোচনা করা হয়েছে। যেমন—

وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ فَأُولٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولٰئِكَ رَفِيقًا

"আর যে কেউ আল্লাহ এবং রাসুলের আনুগত্য করলে সে নবী, সত্যনিষ্ঠ, শহীদ ও সৎকর্মপরায়ণ—যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন—তাদের সঙ্গী হবে এবং তারা কতই না উত্তম সঙ্গী!"

[১৬] وحی, অর্থাৎ প্রত্যাদেশ; যে-অর্থে নবী ও রাসুলগণের সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়েছে, সে-অর্থে তা এখানে ব্যবহৃত হয় নি। এখানে এই শব্দটি 'অন্তরে ইশারা বা ইঙ্গিত করা' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং এই প্রকার ইঙ্গিত দ্বারা মৌমাছিকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। 'ওহি' শব্দটির এক অর্থ 'অন্তরে ইঙ্গিত করা'।—লিসানুল আরব।

[১৭] সুরা নাহল : আয়াত ৬৮

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ—وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ—وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى—وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ—وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ[18]

অথবা যেমন—

فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا

"আর আমি তার কাছে আমার রুহকে[১৯] (জিবরাইলকে) পাঠালাম, সে তার কাছে পূর্ণ মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করলো।।"[২০]

অথবা যেমন—

قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ

"সে বললো, 'আমি তো তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রেরিত (তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে পয়গাম বহনকারী)।'"[২১]

তা ছাড়া সুরা আলে ইমরানে আল্লাহ তাআলার ফেরেশতাগণ যেভাবে মারইয়াম আলাইহিস সালামকে আল্লাহর পক্ষ থেকে পয়গামবাহী হয়ে সম্বোধন করেছেন, তা-ও উল্লিখিত বক্তব্যের জ্বলন্ত প্রমাণ।

আর হযরত মারইয়াম আলাইহিস সালাম-এর সিদ্দিকা হওয়ার ব্যাপারে যে-প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে, যাঁরা নারীর নবী হওয়ার পক্ষপাতী তাঁরা তার জবাব দিয়ে বলেছেন, যদিও কুরআন মারইয়াম আলাইহিস সালামকে সিদ্দিকা বলেছে, তবে এই উপাধি তাঁর নবুওতের বা নবী হওয়ার বিরোধী নয় এ-কারণে যে, হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম সর্বসম্মতিক্রমে উচ্চ পর্যায়ের নবী হওয়া সত্ত্বেও يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ আয়াতে তাঁকে 'সিদ্দিক' বলা হয়েছে এবং তা তাঁর নবুওতের ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধক হয় নি। তা হলে মারইয়াম আলাইহিস সালাম-এর ক্ষেত্রে কেনো প্রতিবন্ধক হবে? বরং আয়াতে সিদ্দিক বা সিদ্দিকা শব্দ মর্যাদার বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতে উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, যিনি নবী

---

[১৮] সুরা মারইয়াম : আয়াত ১৬, ৪১, ৫১, ৫৪, ৫৬।

[১৯] কুরআনে উল্লেখিত روح শব্দটি বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে روح দ্বারা ফেরেশতাদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে শক্তিশালী ও মর্যাদাবান তাঁকে অর্থাৎ জিবরাইলকে বুঝানো হচ্ছে।

[২০] সুরা মারইয়াম : আয়াত ১৭।

[২১] সুরা মারইয়াম : আয়াত ১৭।

তিনি সর্বাবস্থায় অবশ্যই সিদ্দিক। এর বিপরীতে প্রত্যেক সিদ্দিকের নবী হওয়া জরুরি নয়। যেমন, হযরত আবু বকর সিদ্দিক রা.।

বিখ্যাত মুহাদ্দি ইবনে হাযাম রহ. এ-সকল উলামায়ে কেরামের অভিমত যে-বিস্তারিত বিবরণের সঙ্গে 'কিতাবুল ফাসল'-এ উল্লেখ করেছেন, এমন জোরেশোরে অন্য কোথাও এর বিবরণ চোখে পড়ে নি। অতএব, নিচের অংশে ইবনে হাযামের পূর্ণ বিষয়বস্তুর তরজমা অনুধাবনযোগ্য।

নারীর নবুওত ও ইবনে হাযাম আল-আনদালুসি

(ইবনে হাযাম রহ. বলেন,) এই অধ্যায়টি এমন একটি বিষয় প্রসঙ্গে যা নিয়ে আমাদের সময়ে করডোবায় (স্পেনে) ভীষণ মতভেদ দেখা দিয়েছে। আলেমগণের একটি দল বলেন, 'নারী নবী হতে পারেন না এবং যাঁরা বলেন যে, নারী নবী হতে পারেন তাঁরা নতুন একটি বিদআত সৃষ্টি করেন।' আর আলেমগণের অপর একটি দল বলেন, 'নারী নবী হতে পারেন এবং নবী হয়েছেন।' আলেমগণের এই দুই দল থেকে ভিন্ন তৃতীয় একটি দল এ-ব্যাপারে নীরব। নারী নবী হতে পারেন কি পারেন না উভয় ব্যাপারেই তাঁরা নীরব থাকাকে পছন্দ করেন। কিন্তু যে-সকল উলামায়ে কেরাম নারীর নবুওতের পদ বা নারীর নবী হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করেন, তাঁদের কাছে তাঁদের অস্বীকৃতির পক্ষে কোনো প্রমাণ দেখা যায় না। অবশ্য কোনো কোনো আলেম তাঁদের ভিন্নমত পোষণের পক্ষে নিচের আয়াতটি পেশ করে থাকেন—

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ

"তোমার পূর্বে জনপদবাসীদের মধ্য থেকে পুরুষগণকেই প্রেরণ করেছিলাম, যাদের কাছে ওহি পাঠাতাম।"[২২]

আমি বলি, এ-ব্যাপারে কার মতভেদ রয়েছে এবং কে এমন দাবি করেছে যে, আল্লাহ তাআলা নারীকে মানুষের হেদায়েতের জন্য রাসুল বানিয়ে পাঠিয়েছেন? মূল আলোচনা নারীর রাসুল হওয়া সম্পর্কে নয়, বরং নবী হওয়া সম্পর্কে। সুতরাং, সত্য অন্বেষণের জন্য অবশ্য কর্তব্য এই যে, প্রথমে চিন্তা করা উচিত আরবি ভাষায় নবুওত শব্দটির অর্থ কী।

---

[২২] সুরা ইউসুফ : আয়াত ৯।

আমরা দেখতে পাই যে, নবুওত শব্দটি إنباء শব্দ থেকে গৃহীত। إنباء-এর অর্থ সংবাদ প্রদান করা। সুতরাং, ফল এই দাঁড়ায় যে, যে-ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা কোনো ঘটনা ঘটার পূর্বে ওহির মাধ্যমে তা জানিয়ে দেন অথবা অন্যকোনো ব্যাপারে তাঁর প্রতি ওহি নাযিল করেন, সে-ব্যক্তি ধর্মীয় পরিভাষায় নিঃসন্দেহে নবী।

আপনি এখানে এ-কথা বলতে পারেন না যে, ওহি শব্দের অর্থ সেই ইলহাম যা আল্লাহ তাআলা কোনো সৃষ্ট জীবের মধ্যে প্রাকৃতিকভাবে দিয়ে দিয়েছেন। যেমন, মৌমাছি সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন— وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ। আর ওহি শব্দের অর্থ 'ধারণা' বা 'কল্পনা' করতে পারেন না। কারণ, উন্মাদ ছাড়া 'ধারণা' বা 'কল্পনা'কে কেউ দিব্যজ্ঞান বা ইলমে ইয়াকিন (যা ওহির অবশ্যম্ভাবী ফল) মনে করতে পারে না। আর এখানে ওহি শব্দের সেই অর্থও উদ্দেশ্য হতে পারে না যা গণকের সঙ্গে সম্পর্কিত। অর্থাৎ, শয়তানের আসমানের কথা চুপি চুপি শোনার চেষ্টা করে এবং আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তাদের ওপর উল্কা নিক্ষিপ্ত হয়ে থাকে যে ব্যাপারে কুরআনুল কারিম বলে—

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا

"এইভাবে আমি মানব ও জিনের মধ্যে শয়তানদেরকে প্রত্যেক নবীর শত্রু করেছি, প্রতারণার উদ্দেশ্যে তাদের একে অন্যকে চমকপদ বাক্য দ্বারা প্ররোচিত করে।"[২৩]

গণকগিরির এই পন্থা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র জন্মকাল থেকে বন্ধ হয়ে গেছে। আর এখানে ওহির অর্থ জ্যোতিষশাস্ত্রের অভিজ্ঞতাও হতে পারে না, যা মানুষই পরস্পর শিক্ষা লাভ করে থাকে। আবার ওহির অর্থ সেই স্বপ্নও হতে পারে না যার সত্য বা মিথ্যা হওয়ার কোনো নিশ্চয়তা নেই। বরং এসব অর্থ থেকে পৃথক 'নবুওতের অর্থে ওহি' এই যে, আল্লাহ তাআলা স্বেচ্ছায় কোনো ব্যক্তিকে এমনসব বিষয়ের সংবাদ প্রদান করেন যা ওই ব্যক্তি পূর্বে জানতেন না। উপরিউক্ত জ্ঞানলাভের উপায়সমূহ থেকে ভিন্ন ওহির বিষয়গুলো প্রমাণিত সত্যরূপে

---

[২৩] সুরা আনআম : আয়াত ১১২।

ওই ব্যক্তির সামনে এমনভাবে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে যেনো তিনি তা নিজ চোখে দেখতে পাচ্ছেন। আল্লাহ তাআলা ওই বিশেষ ইলমের দ্বারা ওই ব্যক্তিকে বিনা চেষ্টায় ও বিনা অর্জনে সরাসরি বিশুদ্ধ ও সঠিক বিশ্বাস প্রদান করেন। ফলে ওই ব্যক্তি ওই বিষয়গুলো এমনভাবে উপলব্ধি ও অনুধাবন করতে পারেন যেভাবে তিনি ইন্দ্রিয়সমূহ ও বুদ্ধি দ্বারা লাভ করতে পারেন এবং তার কোনো ধরনের সংশয় ও সন্দেহের অবকাশ থাকে না। আর আল্লাহ তাআলার এই ওহি হয়তো এভাবে হয়ে থাকে যে, ফেরেশতা এসে ওই ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলার পয়গাম শুনিয়ে দেন অথবা এভাবে যে, আল্লাহ তাআলা তাঁকে সরাসরি সম্বোধন করে কথা বলেন।

অতএব যারা নারীর নবী হওয়ার পক্ষপাতী নন, তাঁদের কাছে যদি নবুওতের অর্থ এটা না হয় তবে তাঁরা আমাদেরকে বুঝিয়ে দিন, নবুওতের অর্থ কী? আসল কথা এই যে, তারা এটা ছাড়া নবুওতের অন্যকোনো অর্থ বর্ণনাই করতে পারেন না।

যখন নবুওতের অর্থ ওটাই প্রমাণিত হলো যা আমি বর্ণনা করলাম, তো এখন কুরআনুল কারিমের ওইসব স্থান গভীর চিন্তার সঙ্গে পাঠ করুন যেসব স্থানে উল্লেখ রয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা ওই সকল নারীর কাছে ফেরেশতাদের প্রেরণ করেছেন এবং ফেরেশতারা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সে-সকল নারীকে আল্লাহ তাআলার ‘সত্য ওহি’ জানিয়ে দিতেন। যেমন, ফেরেশতারা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে হযরত ইসহাক আলাইহিস সালাম-এর মা হযরত সারা আলাইহিস সালামকে ইসহাক আলাইহিস সালাম-এর জন্মলাভের সুসংবাদ জানিয়েছিলেন। কুরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ () قَالَتْ يَا وَيْلَتَى أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ () قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ (سورة هود)

আর তাঁর স্ত্রী দণ্ডায়মান (ছিলো) এবং সে হেসেও ফেললো।[২৪] এরপর আমি তাকে ইসহাকের এবং ইসহাকের পরবর্তী (তার পুত্র) ইয়াকুবের

---

[২৪] ইবরাহিম আলাইহিস সালাম-এর ভয় দূর হওয়ার কারণে হাসলেন।

সুসংবাদ দিলাম। সে (ইবরাহিম আলাইহিস সালাম-এর স্ত্রী) বললো, "কী আশ্চর্য! সন্তানের জননী হবো, যখন আমি (নব্বই বছর বয়স্ক) বৃদ্ধা এবং এই আমার স্বামী (একশো বছর বয়স্ক) বৃদ্ধ! এটা অবশ্যই এক অদ্ভুত ব্যাপার।" তারা (ফেরেশতারা) বললো, "আল্লাহর কাজে তুমি বিস্ময়বোধ করছো, হে পরিবারবর্গ (ইবরাহিম আলাইহিস সালাম-এর পরিবারবর্গ)?' [সুরা হুদ : আয়াত ৭১-৭৩]

এই আয়াতগুলোতে ফেরেশতাগণ ইসহাক আলাইহিস সালাম এবং তাঁর পরে ইয়াকুব আলাইহিস সালাম-এর জন্মের সুসংবাদ প্রদান করেছেন এবং এতে হযরত সারা আলাইহিস সালাম বিস্মিত হওয়ায় পুনরায় তাকে এই বলে সম্বোধন করেছেন, أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ 'আপনি আল্লাহর কাজে বিস্ময়বোধ করছেন?'
তবে এটা কেমন করে সম্ভব যে, ইসহাক আলাইহিস সালাম-এর মা (সারা আলাইহিস সালাম) নবী না হন আর আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের মাধ্যমে তাঁকে এইভাবে সম্বোধন করেছেন?
একইভাবে আমরা দেখতে পাই যে, আল্লাহ তাআলা ফেরেশতা জিবরাইল আলাইহিস সালামকে হযরত মারইয়াম আলাইহিস সালাম (ইসা আলাইহিস সালাম-এর মা)-এর কাছে প্রেরণ করেছেন এবং তাঁকে সম্বোধন করে বলছেন—

قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا

"সে (জিবরাইল আলাইহিস সালাম) বললো, 'আমি তো তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রেরিত, তোমাকে এক পবিত্র পুত্র দান করার জন্য (আল্লাহ তাআলার নির্দেশে আল্লাহর পথে)।'"[২৫]
তো এই সত্য ওহি দ্বারা নবুওত না হলে আর কী হবে। এই আয়াতে কি পরিষ্কারভাবে বলা হয় নি যে, মারইয়াম আলাইহিস সালাম-এর কাছে জিবরাইল আলাইহিস সালাম আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে পয়গামবাহী হয়ে এসেছেন? তা ছাড়া, যাকারিয়া আলাইহিস সালাম যখন মারইয়াম আলাইহিস সালাম-এর কক্ষে আসতেন তখন তাঁর কাছে গায়ব থেকে

[২৫] সুরা মারইয়াম : আয়াত ১৭।

আল্লাহ তাআলার প্রদত্ত খাদ্যদ্রব্য দেখতে পেতেন। যাকারিয়া আলাইহিস সালাম সেই খাদ্যদ্রব দেখে তাঁর একটি বরকতময় পুত্রসন্তান লাভের জন্য আল্লাহ তাআলার দরবারে দোয়া করেছিলেন। একইভাবে আমরা মুসা আলাইহিস সালাম-এর মায়ের ব্যাপারে দেখতে পাচ্ছি যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর কাছে ওহি প্রেরণ করলেন, 'তুমি তোমার শিশুকে নদীতে ফেলে দাও', এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে জানিয়ে দিলেন, 'আমি পুনরায় তাকে তোমার কাছে ফিরিয়ে এনে দেবো এবং তাকে নবী ও রাসুল বানাবো।' সুতরাং, কে সন্দেহ করতে পারবে যে, এটা নবুওতের ব্যাপার নয়? সাধারণ বুদ্ধি ও অনুভূতিসম্পন্ন মানুষও সহজেই বুঝতে পারবে যে, যদি মুসা আলাইহিস সালাম-এর মায়ের এই কাজটি আল্লাহ তাআলার প্রদত্ত নবুওতের মর্যাদার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট না হতো এবং শুধু স্বপ্নের ভিত্তিতে বা মনে সৃষ্টি হওয়া কল্পনার কারণে তিনি এমন কাজ করতেন তবে তাঁর এই কাজ অত্যন্ত পগালামিমূলক ও ধ্বংসাত্মক বলে বিবেচিত হতো। আজ আমাদের মধ্যে কেউ যদি এমন কাজ করে বসে তা হলে আমাদের এই কাজ হয়তো অপরাধ বলে সাব্যস্ত হবে অথবা আমাদেরকে উন্মাদ ও বিকৃতমস্তিষ্ক বলা হবে এবং চিকিৎসার জন্য পাগলাগারদে পাঠানো হবে। এটা একটি স্পষ্ট ও পরিষ্কার কথা, যাতে সংশয় ও সন্দেহের প্রশ্নই ওঠে না।

সুতরাং, এ-কথা অকাট্য সত্য যে, হযরত মুসা আলাইহিস সালাম-এর মায়ের মুসা আলাইহিস সালামকে নদীতে ফেলে দেয়া তেমনই আল্লাহ তাআলার ওহির ভিত্তিতে ছিলো, যেমন হযরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম স্বপ্নের মধ্যে তাঁর পুত্র (ইসমাইল আলাইহিস সালাম)-কে করার বিষয়টি ওহির মাধ্যমে জানতে পেরেছিলেন।[২৬]

হযরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম যদি নবী না হতেন এবং আল্লাহ তাআলার ওহির সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক না থাকতো এবং শুধু একটি স্বপ্ন বা মনের কল্পনার ভিত্তিতে এই কাজটি করতেন, তবে সব মানুষই তাঁর এই কাজকে হয়তো অপরাধ মনে করতো অথবা চরম পাগলামি বলে বিশ্বাস করতো। সুতরাং, এখন সন্দেহাতীতভাবে ও দ্বিধাহীন চিত্তে

---

[২৬] নবীর স্বপ্নও ওহি হয়ে থাকে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও একটি হাদিসে এ-কথা বলেছেন।

বলা যেতে পারে যে, হযরত মুসা আলাইহিস সালাম-এর মা নবী ছিলেন।

তা ছাড়া, হযরত মারইয়াম আলাইহিস সালাম-এর নবী হওয়ার পক্ষে একটি প্রমাণ এটাও পেশ করা যেতে পারে যে, আল্লাহ তাআলা সুরা মারইয়ামে আম্বিয়া কেরাম (আলাইহিমুস সালাম)-এর দলে তাঁকে উল্লেখ করেছেন এবং তারপর বলেছেন—

أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ

"এরাই তারা, নবীদের মধ্যে যাদেরকে আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন, আদমের বংশ থেকে এবং যাদেরকে আমি নুহের সঙ্গে নৌকায় আরোহণ করিয়েছিলাম... ।" [সুরা মারইয়াম : আয়াত ৫৮]

এই আয়াতের এই ব্যাপকার্থ থেকে হযরত মারইয়াম আলাইহিস সালামকে বাদ দিয়ে তাঁকে আম্বিয়া কেরামের তালিকা থেকে পৃথক করে দেয়া কোনোভাবেই শুদ্ধ হতে পারে না।

এখন বাকি থাকলো এই প্রশ্নটি যে, কুরআনুল কারিম হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর উল্লেখ করে তাঁর মা হযরত মারইয়াম আলাইহিস সালামকে 'সিদ্দিকাহ' বলেছে। তো এই উপাধি তাঁর নবুওতের বিরোধী নয়। যেমন, يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ আয়াতে 'সিদ্দিক' উপাদি হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম-এর নবুওতের বিরোধী হয় নি। এটি একটি অনস্বীকার্য সত্য।

এখন হযরত সারা আলাইহিস সালাম, হযরত মারইয়াম আলাইহিস সালাম এবং হযরত মুসা আলাইহিস সালাম-এর মা (আলাইহাস সালাম)-এর সঙ্গে ফেরআউনের স্ত্রী হযরত আসিয়াকেও যুক্ত করে নিন। কেননা, নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون

"পুরুষদের মধ্যে তো অনেক লোক কামেল হয়েছে বা পূর্ণতা লাভ করেছেন; কিন্তু স্ত্রীজাতির মধ্যে কেবল দুইজনই কামেল হয়েছেন

মারইয়াম বিনতে ইমরান এবং ফেরআউনের স্ত্রী আসিয়া বিনতে মুহাযিম।"[২৭]

আর সহিহ বুখারির রেওয়ায়েত আছে—

كَمَلَ مِنْ الرِّجَالِ كَثِيرٌ وَلَمْ يَكْمُلْ مِنْ النِّسَاءِ إِلَّا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَآسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ وَفَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ

"পুরুষের মধ্যে অনেকেই পূর্ণতা লাভ করেছেন; কিন্তু নারীদের মধ্যে মারইয়াম বিনতে ইমরান আর ফেরআউনের স্ত্রী আসিয়া ছাড়া আর কেউ পূর্ণতা লাভ করতে পারে নি। আর নারীদের ওপর আয়েশার মর্যাদা তেমনই, যেমন যাবতীয় খাদ্যের ওপর সারিদের মর্যাদা।"[২৮]

আর এটা স্পষ্ট যে, পুরুষদের মধ্যে থেকে এই পূর্ণতার মর্যাদা কতিপয় রাসুল (আলাইহিমুস সালাম) লাভ করেছেন। তাঁদের ছাড়া আরো অনেক রাসুল ও নবী (আলাইহিমুস সালাম) নবুওতের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত রয়েছেন; কিন্তু তাঁরা পূর্ণতাপ্রাপ্ত রাসুলগণের মর্যাদা থেকে নিম্নমর্যাদার অধিকারী। সুতরাং, হাদিসটির মর্মার্থ এই যে, আল্লাহ তাআলা যে-সকল স্ত্রীলোককে নবুওতের মর্যাদা দান করেছেন তাঁদের মধ্যে এই দু-জনই (মারইয়াম বিনতে ইমরান আলাইহিস সালাম এবং ফেরআউনের স্ত্রী আসিয়া বিনতে মুহাযিম আলাইহিস সালাম) পূর্ণতার স্তরে পৌছার মর্যাদা লাভ করেছিলেন। কেননা, হাদিস শরিফে যে-পূর্ণতার স্তরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যে-কেউই সেই স্তরের নিচে রয়েছে তাঁরা পূর্ণতার অধিকারী নন।

মোটকথা, এই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, কতিপয় নারী কুরআনুল কারিমের অকাট্য প্রমাণ দ্বারা নবী সাব্যস্ত হয়েছেন; কিন্তু তাঁদের মধ্যে দুইজন নারী নবীও পূর্ণতার স্তর লাভ করেছেন। নবী ও রাসুলগণের স্ত রসমূহের ভিন্নতাকে কুরআন বর্ণনা করেছে এভাবে—

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ

"এই রাসুলগণ, তাদের মধ্যে কাউকে কারো ওপর প্রাধান্য দিয়েছি।"[২৯]

---

[২৭] সুনানুন নাসায়ি : হাদিস ৮৩৫৩।
[২৮] সহিহুল বুখারি : হাদিস ৫৪১৮।
[২৯] সুরা বাকারা : আয়াত ২৫৩।

বাস্তবতা এই যে, কামিল বা পূর্ণ তাঁকেই বলা হয়, যাঁর শ্রেণির মধ্য থেকে অন্যকেউ তাঁর সমকক্ষ নয়। পুরুষ শ্রেণির মধ্য থেকে এমন কামিল বা পূর্ণ আল্লাহ তাআলার কয়েকজন রাসুলই হয়েছেন। তাঁদের সমকক্ষতা অন্য নবী বা রাসুলগণকে দেয়া হয় নি। নিঃসন্দেহে এই কামিল বা পূর্ণতাপ্রাপ্তদের মধ্যে আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসলিম উম্মাহর পিতা হযরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম রয়েছেন। তাঁদের সম্পর্কে কুরআনুল কারিম ও হাদিস শরিফ যে-মর্যাদা ও পূর্ণতা বর্ণনা করেছে, অন্য নবী বা রাসুলগণের ব্যাপারে তা প্রকাশ করে নি। একইভাবে নারী নবীগণের মধ্যে তাঁরাই পূর্ণতার স্তরে পৌঁছেছেন যাঁদের কথা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদিস শরিফে উল্লেখ করেছেন।[৩০]

ইবেন হাযাম আন্দালুসি রহ.-এর এই সুদীর্ঘ আলোচনার সারমর্ম এই যে, যদি ওহির যেসব অর্থের ব্যবহার ব্যাপকার্থের প্রেক্ষিতে প্রাকৃতিক ভাষা বা অন্তরে উদিত ধারণা ও কল্পনার স্তরের 'ইলকা' ও 'ইলহাম'-এর জন্য করা হয় সেগুলোর প্রতি লক্ষ না করে ওই পারিভাষিক অর্থ গ্রহণ করা হয় যাকে কুরআনুল কারিম নবী ও রাসুলদের জন্য নির্দিষ্ট করেছে, তবে তার দুটি প্রকার রয়েছে : একটি হলো ওই ওহি যার সম্পর্ক আল্লাহ তাআলার সৃষ্ট জীবের হেদায়েত ও নসিহতের এবং আদেশাবলি ও নিষেধাবলি শিক্ষা প্রদানের সঙ্গে আর দ্বিতীয়টি এই যে, আল্লাহ তাআলা সরাসরি বা ফেরেশতাদের মাধ্যমে, কোনো ব্যক্তির সঙ্গে এইভাবে সম্বোধন করে কথাবার্তা বলেন, যার দ্বারা সুসংবাদ প্রদান করা অথবা বিশেষ করে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির নিজের জন্য কোনো নির্দেশ প্রদান বা নিষেধ করা উদ্দেশ্য হয়। এখন যদি প্রথম প্রকারের ওহি হয় তবে তা রিসালাতসহ নবুওত (النبوة مع الرسالة)।[৩১] এবং উম্মতের সকলের

---

[৩০] الفصل في الملل والأهواء والنحل, আবু মুহাম্মদ আলি বিন আহমদ বিন সাঈদ বিন হাযাম বিন গালিব আল-আন্দালুসি রহ.। ১৩৪৮ সালে মিসরে মুদ্রিত, পঞ্চম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১২-১৪। এই আলোচনাটি মিসরে মুদ্রিত ফাতহুল বারি, ষষ্ঠ খণ্ড, ৩৪৭, ৩৪৮ ও ৩৬৮ সংখ্যক পৃষ্ঠায় প্রণিধানযোগ্য।

[৩১] ইলমে কালামের বিশেষ পরিভাষায় নবী ও রাসূলের মধ্যে যে-পার্থক্য রয়েছে এখানে তার প্রতি লক্ষ করা হয় নি। কেননা, কুরআনুল কারিম অনেক ক্ষেত্রে নবী ও রাসূল শব্দ দুটিকে সমঅর্থে ব্যবহার করেছে)

ঐকমত্যে এই মর্যাদা কেবল পুরুষের জন্য নির্দিষ্ট। যেমন, সুরা আন-নাহলের আয়াত থেকে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে। আর এ-বিষয়টি সম্পর্কে নিশ্চয় কোনো দ্বিমত নেই।

আর যদি আল্লাহ তাআলার ওহির দ্বিতীয় প্রকার হয় তবে ইবনে হাযাম ও তাঁর সমর্থক উলামায়ে কেরামের মতে ইহাও নবুওতেরই একটি পর্যায়। কেননা, কুরআনুল কারিম সুরা শুরায় আম্বিয়া কেরাম (আলাইহিমুস সালাম)-এর ওপর ওহি নাযিল হওয়ার যে-পন্থাসমূহ বর্ণনা করেছেন, তা এই পর্যায়ের ওহির ওপরই প্রযোজ্য হয়। সুরা শুরায় বলা হয়েছে—

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللّٰهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ

"মানুষের এমন মর্যাদা নেই যে, আল্লাহ তার সঙ্গে কথা বলবেন ওহির মাধ্যম ব্যতিরেকে, অথবা এমন দূত ব্যতিরেকে, যে-দূত তাঁর অনুমতিক্রমে তিনি যা চান তা ব্যক্ত করেন, তিনি সমুন্নত, প্রজ্ঞাময়।" [সুরা শুরা : আয়াত ৫১]

আর কুরআনুল কারিম ওহির এই দ্বিতীয় প্রকারের প্রয়োগ স্পষ্ট শাব্দিক প্রমাণে হযরত মারইয়াম আলাইহিস সালাম, হযরত সারা আলাইহিস সালাম, হযরত মুসা আলাইহিস সালাম-এর মাতা এবং হযরত আসিয়া আলাইহিস সালাম-এর ক্ষেত্রে করেছে, যেমন সুরা হুদ, সুরা কাসাস ও সুরা মারইয়াম থেকে প্রকাশ পাচ্ছে। সুতরাং, এই পবিত্রা নারীদের জন্য 'নবী' উপাধি প্রয়োগ করা অত্যন্ত সঠিক এবং একে বিদআত বলা মারাত্মক ভুল।

এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে, কুরআনুল কারিম যেভাবে পুরুষ নবীগণকে পরিষ্কার শব্দে নবী বলেছে, সেভাবে ওই নারীদের মধ্য থেকে কাউকে নবী বলে নি। ইবনে হাযাম রহ.-এর সমর্থক উলামায়ে কেরাম এই প্রশ্নের যে-জবাব দিয়েছেন তার সারমর্ম এই যে, রিসালাতসহ নবুওত পুরুষ জাতির জন্য নির্দিষ্ট, যা মানবজগতের হেদায়েত, নসিহত এবং তালিম ও তাবলিগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। সুতরাং, এর আবশ্যক ফল এই যে, আল্লাহ তাআলা যাঁকে এই সম্মানে সম্মানিত করেছেন তাঁর সম্পর্কে তিনি পরিষ্কাররূপে এই ঘোষণা করেছেন যে, তিনি আল্লাহ তাআলার প্রেরিত নবী ও রাসুল। যাতে তাঁর দাওয়াত ও

হেদায়েত কবুল করে নেয়া মানুষের জন্য অবশ্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় এবং আল্লাহ তাআলার প্রমাণ পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়। আর নবুওতের যে-প্রকারটির ব্যবহার নারীদের জন্যও হয়ে থাকে, বিশেষ করে ওই সত্তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে থাকে, যিনি এই মর্যাদা লাভ করেছেন। সুতরাং, তাঁর সম্পর্কে শুধু এতটুকু প্রকাশ করে দেয়াই যথেষ্ট যে, যে-ওহি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আম্বিয়া ও রাসুলগণের জন্য নির্দিষ্ট, সেই ওহির সম্মানে কয়েকজন নারীকে ভূষিত করা হয়েছে।

নারীদের নবুওত প্রাপ্তি স্বীকার করা এবং অস্বীকার করা ভিন্ন তৃতীয় অভিমত ওইসকল উলামায়ে কেরামের, যাঁরা এ-ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বনকে প্রধান্য দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে শায়খ তকিউদ্দিন সুবকি রহ.-এর নাম উল্লেখযোগ্য। ফাতহুল বারিতে তাঁর এই উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে—

وقال السبكي اختلف في هذه المسألة ولم يصح عندي في ذلك شيء

“সুবকি রহ. বলেন, এই বিষয়ে উলামায়ে কেরাম ভিন্ন ভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন। আর আমার মতে, তার মধ্যে কোনোটিই সঠিক নয়।” (তাই এ-ব্যাপারে কোনো মত প্রকাশ না করে নীরবতা অবলম্বন করাই উত্তম।)

হযরত মারইয়াম আলাইহিস সালাম কি নবী ছিলেন?

উপরিউক্ত বিবরণ থেকে অবশ্যই এ-কথা বুঝা যায় যে, নারীর নবী না হওয়ার ব্যাপারে ইমামুল হারামাইন যে-ইজমালে উম্মতের (উম্মতের ঐকমত্যের) দাবি করেছেন করেছেন তা ঠিক নয়। তা ছাড়া এটাও স্বীকার করতে হবে যে, আম্বিয়ায়ে কেরামের তালিকায় অন্য পবিত্র নারীদের উল্লেখ না করে শুধু মারইয়াম আলাইহিস সালামকে উল্লেখ করায় হযরত মারইয়াম আলাইহিস সালাম-এর নবুওত সম্পর্কে কুরআনের প্রমাণ অধিক স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এ-কারণেই ইমাম শা'রানি, ইবনে হাযাম ও কুরতুবি রহ. (রহিমাহুমুল্লাহ)-এর মধ্যে হযরত মারইয়াম আলাইহিস সালাম ছাড়া অন্য নারীদের নবী হওয়ার ক্ষেত্রে মতভেদ

দেখা দিয়েছে।[৩২] আর হযরত মারইয়াম আলাইহিস সালাম-এর নবী হওয়ার ব্যাপারে নারীর নবুওত প্রমাণকারী সকল উলামায়ে কেরামের ঐকমত্য রয়েছে। ইবনে কাসির রহ. যে দাবি করেছেন জমহুর উলামায়ে কেরাম নারীর নবী হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করেছেন, আমরা তাঁর এই দাবির সঙ্গে একমত নই। তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায়ে কেরাম সম্ভবত নীরবতা অবলম্বনকেই পছন্দ করেছেন।

وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ আয়াতটির উদ্দেশ্য

যে-সকল উলামায়ে কেরাম নারীর নবী হওয়ার পক্ষপাতী এবং হযরত মারইয়াম আলাইহিস সালামকে নবী বলে স্বীকার করেন তাঁর মত অনুযায়ী তো وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ 'বিশ্বের নারীগণের মধ্যে তোমাকে মনোনীত করেছেন' আয়াতটির অর্থ স্পষ্ট ও পরিষ্কার। আর তা এই যে, গোটা বিশ্বের সমস্ত নারীর ওপর হযরত মারইয়াম আলাইহিস সালাম-এর মর্যাদা অধিক। যে-সকল নারী নবী নন তাদের ওপর তাঁর মর্যাদা অধিক এইজন্য যে, মারইয়াম আলাইহিস সালাম নবী; আর যে-সকল নারী নবীর শ্রেণিভুক্ত তার ওপর এই জন্য যে, হযরত মারইয়াম আলাইহিস সালাম-এর মর্যাদা ও পূর্ণতা সম্পর্কে কুরআনুল কারিমে যে-সকল আয়াত রয়েছে সেগুলোর প্রেক্ষিতে তিনি অন্য নারী নবীগণের ওপর অধিক মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী।

কিন্তু যে-সকল উলামায়ে কেরাম নারীর নবী হওয়ার ব্যাপারটি অস্বীকার করেন এবং হযরত মারইয়াম আলাইহিস সালামকে নবী বলে স্বীকার করেন না তাঁরা এই আয়াতের অর্থের ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। কেউ কেউ বলেন, نِسَاءِ الْعَالَمِينَ বাক্যাংশটি ব্যাপকার্থক এবং অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের নারী জাতির সবাইকে শামিল করছে। সুতরাং, এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, কাউকে বাদ না দিয়ে মানবজগতের সকল নারীর ওপর মারইয়াম আলাইহিস সালাম-এর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। আর অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের মত এই

---

[৩২] ফাতহুল বারি, ষষ্ঠ খণ্ড, কিতাবুল আম্বিয়া।

যে, আয়াতটির الْعَالَمِيْنَ শব্দ দ্বারা বিশ্বের ওইসব নারী উদ্দেশ্য যারা হযরত মারইয়াম আলাইহিস সালাম-এর সমসাময়িক ছিলো। অর্থাৎ, কুরআনুল কারিম হযরত মারইয়াম আলাইহিস সালাম-এর সময়কার ঘটনা উল্লেখ করে বলছে যে, আল্লাহ তাআলা মারইয়াম আলাইহিস সালামকে সুসংবাদ প্রদান করেছেন যে, তিনি তাঁর সময়কার গোটা বিশ্বের সমস্ত নারীর মধ্যে ফযিলত ও পূর্ণতার অধিকারিণী এবং আল্লাহ তাআলা তাঁকে সমস্ত নারীর মধ্য থেকে মনোনীত করেছেন। এখানে الْعَالَمِيْنَ অর্থাৎ বিশ্বাবাসীর এই অর্থ ঠিক তেমনই, যেমন অর্থ হযরত মুসা আলাইহিস সালাম-এর উম্মত (বনি ইসরাইল)-এর ব্যাপারে নিচের আয়াতে গ্রহণ করা হয়েছে—

وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِيْنَ

"আমি জেনে-শুনেই তাদেরকে বিশ্বে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম।" [সুরা দুখান : আয়াত ৩২] অর্থাৎ, সমসাময়িক বিশ্বে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম।

সর্বসম্মতিক্রমে বনি ইসরাইলের মর্যাদা সম্পর্কে এ-কথা বলা হয় যে, الْعَالَمِيْنَ শব্দ দ্বারা তাদের সমকালীন বিশ্বের সব জাতি ও সম্প্রদায় উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, সবার মধ্যে হযরত মুসা আলাইহিস সালাম-এর উম্মতই বেশি ফযিলতের অধিকারী ছিলো। সুতরাং, হযরত মারইয়াম আলাইহিস সালাম-এর ফযিলত সম্পর্কেও এই অর্থ গ্রহণ করা উচিত।

হযরত মারইয়াম আলাইহিস সালাম-এর পবিত্রতা, তাকওয়া, পরহেযগারি, হযরত মুসা আলাইহিস সালাম-এর মতো উচ্চ মর্যাদাশীল নবীর জননী হওয়ার সম্মান, পুরুষের স্পর্শ ব্যতীত অলৌকিকরূপে তাঁর পবিত্র গর্ভ থেকে হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর জন্মগ্রহণ প্রভৃতি নিঃসন্দেহে এমনসব ব্যাপার যার দ্বারা তিনি সমসাময়িক নারীদের ওপর ফযিলত ও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছিলেন।

আর এই সত্যটিও ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, ফযিলত একটি ব্যাপক বিষয়। একটি বস্তুর স্বরূপ বর্ণনা করতে পূর্ণ ও উত্তম পন্থা এই যে, তা হবে ব্যাপক ও নির্দষ্টতাজ্ঞাপক, যা ওই বস্তুর স্বরূপকে এমনভাবে নির্দিষ্ট করবে যে, তা অতিরিক্ত বিষয় থেকে পৃথক ও ভিন্ন থাকবে। যেনো এমন ত্রুটি না থেকে যায় যে, আসল স্বরূপ পূর্ণরূপে বর্ণিত না হয় এবং বর্ণনার

মধ্যে এমনকিছু বাড়তিও না হয়, যার ফলে অন্য বস্তু তার অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। একইভাবে এই পন্থার বিপরীতে, ফযিলতের বর্ণনার জন্য মার্জিত ও স্থানোচিত হওয়া চাহিদা এই যে, স্বরূপ বর্ণনার মতো তাকে সীমারেখা ও শর্তাবলির সঙ্গে জুড়ে দেয়া হয় না। কেননা, এখানে বস্তুটির স্বরূপ বর্ণনা করা হচ্ছে না; বরং ফযিলত বর্ণনা করা হচ্ছে। আর ফযিলত অন্য বস্তুতে পাওয়া গেলেও স্বরূপ বর্ণনার মতো তাতে কোনো ক্ষতি হয় না। এ-ক্ষেত্রে বরং বর্ণনার ব্যাপকতারই বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। যাতে ফযিলত প্রকাশ করার মাধ্যমে শ্রোতার অন্তরে যে-প্রভাব সৃষ্টি করা হচ্ছে তা যেনো দৃঢ়মূল ও শক্তিশালী হয়।

সুতরাং, এই অবস্থায় عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ-এর অর্থ এই নয় যে, হযরত মারইয়াম আলাইহিস সালাম ব্যতীত অন্যকোনো পবিত্র সতীসাধ্বী নারী এই মর্যাদা লাভ করতে পারেন না বা লাভ করেন নি। বরং তার অর্থ এই যে, ফযিলত ও পূর্ণতার ক্ষেত্রে হযরত মারইয়াম আলাইহিস সালাম উচ্চতম মর্যাদার অধিকারিণী। ফযিলতের স্বরূপ এটাই যা ভুলে যাওয়ার ফলে সাহাবায়ে কেরাম ও অন্যান্য বুযুর্গ ব্যক্তির ফযিলতের ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময় আমাদের পদস্খলন ঘটে এবং কতিপয় পবিত্র ও মহান ব্যক্তিত্বের ফযিলতের ক্ষেত্রে বিরোধ ও বৈপরীত্য দৃষ্ট হতে থাকে। অবশ্য এ-সকল ফযিলতের আসল স্বরূপ উপলব্ধি করে যখন আমরা ফযিলতসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের ব্যক্তিগত ও সামগ্রিক অবস্থা বিবেচনা করে তাদের মধ্যকার মর্যাদাগত পার্থক্য বর্ণনা করি তখন তা অবশ্যই তাদের পরস্পরের জন্য ব্যবধান-নির্ণায়ক সাব্যস্ত হয়। যেমন, পুরুষ সাহাবি ও নারী সাহাবির ফযিলতের প্রেক্ষিতে তাদের তাঁদের মর্যাদার যে-পার্থক্য তার মীমাংসা করা তখনই সম্ভব হতে পারে যখন তাঁদের যে-সকল ফযিলত ওহির ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে তার সঙ্গে সঙ্গে ফযিলত সম্পর্কে কুরআনুল কারিম ও হাদিসসমূহের বিশেষ বিশেষ ইরশাদ, তাঁদের বিশেষ খেদমতসমূহ, ইসলামের জন্য জীবন দান, সত্যের সাহায্যার্থে তাঁদের ধন-সম্পদ বিলিয়ে দেয়া, ইসলামের সঙ্কটময় মুহূর্তে তাঁদের জ্ঞান ও গবেষণা দ্বারা সঙ্কট সমাধান এবং তাঁদের কর্মপ্রচেষ্টা ও সাধনাকে সামনে রেখে মীমাংসা করা হবে।

হযরত ইসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সুসংবাদ প্রদান

ধর্ম ও মতাদর্শ সম্পর্কিত কিতাবসমূহ পাঠ করলে জানা যায় যে, সত্য ধর্ম ও উজ্জ্বল ধর্মাদর্শের প্রচার ও প্রসারের ধারা হযরত আদম আলাইহিস সালাম থেকে শুরু হয়ে খাতিমুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত বিরামহীনভাবে চলে আসছে। এই ধারাকে অধিক শক্তিশালী ও উন্নত করার জন্য আল্লাহ তাআলার নীতি ছিলো এই যে, কয়েক শতাব্দী পর পর এমন একজন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ (أُولُو الْعَزْمِ) ও উচ্চ মর্যাদাশীল প্রেরণ করেছেন যিনি দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার কারণে উদ্ভূত ব্যাপক আত্মিক শৈথিল্য ও স্খলন দূরীভূত করে সত্য গ্রহণের মৃতপ্রায় আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষাকে নতুনত্ব প্রদান করেন এবং আত্মা জীর্ণ অবস্থাসমূহকে সজীব ও সবল করে তোলেন। যেনো, ধর্মের ঘুমন্ত জগতে সত্য ও সততার সিঙা ফুঁকে এক মহাবিপ্লব সৃষ্টি করে এবং মৃত অন্তরসমূহে নতুন জীবন সঞ্চার করে। অধিকাংশ সময় এমন হয়েছে যে, যেসব সম্প্রদায় ও জাতির মধ্যে সেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ (أُولُو الْعَزْمِ) ও উচ্চ মর্যাদাশীল নবীর আবির্ভাব ঘটার কথা, বহু শতাব্দী পূর্বে সেসব সম্প্রদায় ও জাতির সাধারণ আম্বিয়ায়ে কেরাম (আলাইহিমুস সালাম) আল্লাহ তাআলার ওহির মাধ্যমে ওই উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নবীর আগমনের সুসংবাদ শুনিয়ে দিতেন। যেনো তাঁর সত্যের দাওয়াত ও তাবলিগ এবং প্রচার ও প্রসারের জন্য অনুকূল ও উর্বর ক্ষেত্র প্রস্তুত হয় এবং যখন আল্লাহর ওই আলো সমুজ্জ্বল হওয়ার সময় আসে, তখন সেসব সম্প্রদায় ও জাতির জন্য তাঁর আকস্মিক আগমন অনাহূত এবং আশাতীত ব্যাপার না হয়ে যায়।

হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-ও ওই أُولُو الْعَزْمِ (দৃঢ়প্রতিজ্ঞ), উচ্চ মর্যাদাশীল ও পবিত্র রাসুলগণের অন্যতম। এ-কারণেই দেখা যাচ্ছে যে, বনি ইসরাইল বংশোদ্ভূত আম্বিয়া কেরাম (আলাইহিমুস সালাম)-এর মধ্যে কয়েকজন নবী ইসা আলাইহিস সালাম-এর আবির্ভাবের আগে তাঁর ব্যাপারে ঘোষণা করেছেন এবং তাঁর আগমনের শুভ সংবাদ শুনিয়েছেন। তাঁদের সুসংবাদের ফলেই বনি ইসরাইল দীর্ঘকাল প্রতীক্ষায় ছিলো যে,

প্রতিশ্রুত মাসিহ্-এর আবির্ভাব ঘটবে। তখন তারা পুনরায় হযরত মুসা আলাইহিস সালাম-এর যুগের মতো পৃথিবীর সব জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশিষ্ট ও সম্মানিত বলে গণ্য হবে। কল্যাণ ও হেদায়েতের বিরান মাঠ আবার সজীব ও সতেজ হয়ে উঠবে। আল্লাহ তাআলার মহিমা ও মাহাত্ম্যের দ্বারা তাদের অন্তর আরো একবার উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। বাইবেল (তাওরাত ও ইঞ্জিল) তার শাব্দিক ও আর্থিক বিকৃতি সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত ওইসব সুসংবাদ তার বুকে ধারণ করে আছে যা হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর শুভাগমনের সঙ্গে সম্পর্কিত। তাওরাতের ইস্তি সনা অংশে বলা হয়েছে :

"আর মুসা বললেন, খোদা সাইনা থেকে এসেছেন এবং শাঈর থেকে উদিত হয়েছেন এবং ফারান পর্বতশ্রেণি থেকে আলোকিত হয়েছেন।"

এই সুসংবাদে 'সাইনা থেকে খোদার আগমন' হযরত মুসা আলাইহিস সালাম-এর নবুওতের প্রতি ইঙ্গিত। আর 'শাঈর থেকে উদিত হওয়া'র দ্বারা উদ্দেশ্য হলো হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর নবুওত লাভ। কেননা, তাঁর পবিত্র জন্মগ্রহণ হয়েছে এই পর্বতেরই অন্তরর্গত 'বাইতুল লাহাম' নামক স্থানে। আর এটাই সেই পবিত্র স্থান যেখান থেকে সত্যের আলো উদিত হয়েছিলো। আর 'ফারানের পর্বতশ্রেণি থেকে আলোকিত হওয়া' হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রিসালাতের সূর্যোদয়ের ঘোষণা। কেননা, ফারান হিজাযের বিখ্যাত পর্বতশ্রেণির নাম।[৩৩]

আর নবী ইয়াসাইয়াহ আলাইহিস সালাম-এর সহিফায় আছে :

"দেখো, আমি তোমাদের সামনে আমার নবী প্রেরণ করছি, যিনি তোমাদের পরিত্রাণের পথ প্রস্তুত করবেন। ময়দানে আহ্বানকারীর আওয়াজ আসছে যে, আল্লাহর পথ প্রস্তুত করো, তাঁর রাস্তাকে সরল করো।"[৩৪]

এই ভবিষ্যদ্বাণীতে 'নবী' শব্দ দ্বারা হযরত ইসা আলাইহিস সালাম উদ্দেশ্য। আর ময়দানে আহ্বানকারী হযরত ইয়াহইয়া আলাইহিস সালাম, যিনি হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর ঘোষণাকারী ছিলেন।

---

[৩৩] বিস্তারিত বিবরণ যথাস্থানে আসবে।

[৩৪] অনুচ্ছেদ ৪০, আয়াত ৩-৮।

আর হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর নবুওত লাভের পূর্বে বনি ইসরাইল তাঁর নবুওত ও রিসালাতের সুসংবাদ শুনেছিলো।

ম্যাথুর ইঞ্জিলে (Gospel of Matthew) বলা হয়েছে :

"ইয়াসু যখন বাদশাহ হিরোদিয়াস (হ্যারড)-এর যুগে ইয়াহুদিয়ার বাইতুল লাহামে জন্মগ্রহণ করলেন, তখন দেখো, পূর্বদিক থেকে কয়েকজন অগ্নিপূজক জেরুজালেমে এসে বললো, ইহুদিদের যে-বাদশাহ জন্মগ্রহণ করেছেন তিনি কোথায়?... এ-কথা শুনে বাদশা হিরোদিয়াস এবং জেরুজালেমের সব ঘাবড়ে গেলো। হিরোদিয়াস তার কওমের কাহিন (গণক) ও ধর্মজ্ঞানীদের একত্র করে তাদের জিজ্ঞেস করলো যে, মাসিহের জন্ম কোথায় হওয়া উচিত? তারা বললো, ইয়াহুদিয়ার বাইতুল লাহামে। কেননা, নবী ইয়াসাইয়াহ আলাইহিস সালাম-এর মারফত লিখিত হয়েছে যে, হে ইয়াহুদার বাইতুল লাহাম অঞ্চল, তুমি ইয়াহুদার শাসকবৃন্দের মধ্যে কারো চেয়ে ছোট নও। কেননা, তোমার মধ্য থেকে এমন একজন নেতা আবির্ভূত হবেন, যিনি আমার উম্মত বনি ইসরাইলকে পরিচালনা করবেন।"

আর ম্যাথুর ইঞ্জিলের অন্য জায়গায় আছে :

"আর যখন তিনি যাইতুনের পাহাড়ের ওপর 'বাইতে ফাগা'র কাছে এলেন, তখন ইয়াসু দুইজন শিষ্যকে বলে পাঠালেন যে, তোমাদের সামনে জনপদে যাও, সেখানে পৌঁছতেই তোমরা একটি বাঁধা গর্দভী এবং তার সঙ্গে বাচ্চা দেখতে পাবে। তার বাঁধ খুলে দিয়ে আমার কাছে নিয়ে এসো। তোমাদেরকে কেউ যদি এ-ব্যাপারে কিছু বলে, তবে তোমরা বলো, এটা খোদা তাআলার দরকার। তারা তৎক্ষণাৎ সেগুলোতে তোমাদের সঙ্গে পাঠিয়ে দেবে। এটা এইজন্য হলো যে, নবীর মারফতে যা কিছু বলা হয়েছিলো তা যেনো পূর্ণ হয়। অর্থাৎ, সাইহুনের কন্যাকে বলো, দেখো, তোমাদের বাদশাহ তোমাদের কাছে আসছেন। তিনি ধৈর্যশীল এবং গাধার ওপর আরোহী; বরং বাচ্চার ওপর দিয়ে দাও।"[৩৫]

আর ইউহান্নার ইঞ্জিলে আছে :

"আর ইউহান্না (হযরত ইয়াহইয়া আলাইহিস সালাম)-এর সাক্ষ্য এই যে, যখন ইহুদিরা জেরুজালেম থেকে কাহিন নিয়ে এলো, তারা

ইয়াহইয়াকে জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি কে?' তখন তিনি স্বীকার করলেন, অস্বীকার করলেন না। বরং তিনি স্বীকার করলেন যে, 'আমি মাসিহ (ইসা) নই। তারা তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, 'তবে তুমি কে? তুমি কি ইলিয়া?' তিনি বললেন, 'না, আমি ইলিয়া নই।' তারা বললো, 'তুমি কি সেই নবী?' তিনি জবাব দিলেন, 'না, আমি তা-ও নই।' তখন তারা তাঁকে বললো, 'তবে তুমি কে? বলো, তাহলে আমাদেরকে যারা পাঠিয়েছে তাদেরকে আমরা ফিরে গিয়ে জবাব দিতে পারবো যে, তুমি নিজের সম্পর্কে কী বলছো।' তিনি বললেন, 'আমি নবী ইয়াসাইয়াহ যেমন ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, ময়দানে আহ্বানকারী, তার আওয়াজ এই যে, তোমরা আল্লাহর রাস্তা সরল করো।"[৩৬]

মার্ক ও লুকের ইঞ্জিলে আছে :

"তারা প্রতীক্ষা করছিলো এবং সবাই নিজ নিজ মনে ইউহান্না (ইয়াহইয়া আলাইহিস সালাম)-এর বাণী সম্পর্কে চিন্তা করছিলো যে, তিনি মাসিহ ছিলেন কি-না। তখন (ইয়াহইয়া আলাইহিস সালাম) তাদের সকলের জিজ্ঞাসার জবাবে বললেন, আমি তো তোমাদের অপ্সুদীক্ষা করছি, কিন্তু যিনি আমার চেয়ে অধিক শক্তিশালী তিনি অচিরকালের মধ্যেই আগমন করবেন। আমি তো তাঁর জুতার ফিতা খোলারও যোগ্য নই। তিনি রুহুল কুদস (জিবরাইল আলাইহিস সালাম)-এর মাধ্যমে আমাদেরকে অপ্সুদীক্ষা[৩৭] করাবেন।"[৩৮]

এই দুটি ভবিষ্যদ্বাণী থেকেও বুঝা যায় যে, ইহুদিরা তাদের ধর্মীয় রেওয়ায়েতসমূহের ভিত্তিতে যে-সকল أُولُو الْعَزْمِ নবীর আগমনের প্রতীক্ষা করছিলো তাঁদের মধ্যে হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-ও ছিলেন। হযরত ইয়াহইয়া আলাইহিস সালাম তাদেরকে বলেছিলেন যে, তিনি ইলিয়াও নন, ওই নবীও নন এবং মাসিহ আলাইহিস সালামও নন। বরং

---

[৩৬] পরিচ্ছেদ ১, আয়াত ১৯-২৩।

[৩৭] অপ্সুদীক্ষা (Baptism) : খ্রিস্টানদের একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে কোনো ব্যক্তিকে পবিত্র জলে স্নান করিয়ে বা তার ওপর পবিত্র বারি সিঞ্চন করে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করা হয় এবং ওই ধর্মগোষ্ঠীতে প্রবেশাধিকার দেয়া হয়। এই অনুষ্ঠানে সাধারণত ওই ব্যক্তির নামকরণও করা হয়।

[৩৮] পরিচ্ছেদ ২, আয়াত ১৫-১৬।

মাসিহ আলাইহিস সালাম-এর আগমনের ঘোষণাকারী ও সুসংবাদদাতা।[৩৯]

কুরআনুল কারিমও হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালাম ও হযরত ইয়াহইয়া আলাইহিস সালাম-এর ঘটনাকে হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর প্রেরিত হওয়ার ভূমিকা সাব্যস্ত করেছে। ইয়াহইয়া আলাইহিস সালামকে হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর আগমনের ঘোষণাকারীও সুসংবাদ প্রদানকারী বলেছে। যেমন, সুরা আলে ইমরানে আছে—

فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ

"যখন যাকারিয়া কক্ষে নামাযে দাঁড়িয়ে ছিলো তখন ফেরেশতাগণ তাঁকে সম্বোধন করে বললো, 'আল্লাহ তোমাকে ইয়াহইয়ার সুসংবাদ দিচ্ছেন, সে হবে আল্লাহর বাণীর সমর্থক, নেতা, স্ত্রীবিরাগী এবং পুণ্যবানদের মধ্যে একজন নবী।'" [সুরা আলে ইমরান : আয়াত ৩৯]

পবিত্র জন্মগ্রহণ

আবেদা, পরহেযগার, পবিত্র ও সতীসাধ্বী হযরত মারইয়াম আলাইহিস সালাম তাঁর নির্জন কক্ষে সবসময় ইবাদতে মশগুল থাকতেন। একান্ত জরুরি প্রয়োজন ছাড়া কখনো তাঁর কক্ষ থেকে বের হতেন না। একবার মসজিদে আকসা (পবিত্র উপসনাগৃহ)-এর পূর্বদিকে একটু দূরে লোকচক্ষুর আড়ালে কোনে বিশেষ প্রয়োজনে একাকী বসে ছিলেন। অকস্মাৎ আল্লাহ তাআলার ফেরেশতা জিবরাইল আলাইহিস সালাম মানুষের আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করলেন। হযরত মারইয়াম আলাইহিস সালাম এভাবে বেপর্দা অবস্থায় একজন অপরিচিত মানুষকে সামনে দেখতে পেয়ে ভীষণ ঘাবড়ে গেলেন এবং বলতে লাগলেন, 'যদি তোমার অন্তরে সামান্যও আল্লাহর ভয় থাকে, তবে আমি করুণাময় আল্লাহর

[৩৯] বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্টে বর্ণিত আছে যে, ইউহান্না নামে দুই ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি আছেন : প্রথমজন হলে নবী ইয়াহইয়া আলাইহিস সালাম আর দ্বিতীয়জন হলেন হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর অনুসারী ও শিষ্য।

কসম দিয়ে তোমার কাছ থেকে নিরাপত্তা চাচ্ছি।' ফেরেশতা বললেন, 'মারইয়াম, ভয় করো না, আমি মানুষ নই, আমি আল্লাহ তাআলার প্রেরিত ফেরেশতা। আমি তোমাকে একটি পুত্রসন্তানের সুসংবাদ প্রদান করার জন্য এসেছি।' মারইয়াম আলাইহিস সালাম এ-কথা শুনে বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন, 'আমার গর্ভে পুত্র হওয়া কেমন করে সম্ভব হবে, কারণ আজ পর্যন্ত কোনোও পুরুষ আমাকে স্পর্শ করে নি। কেননা, আমি বিয়েও করি নি এবং আমি ব্যভিচারিণীও নই।' ফেরেশতা বললেন, আমি তো তোমার প্রতিপালকের প্রেরিত দূত। তিনি আমাকে এইরূপই বলে দিয়েছেন এবং এটাও বলে দিয়েছেন, তা আমি এইজন্য করবো যে, আমি তোমাকে ও তোমার পুত্রকে বিশ্বজগতের জন্য অসীম ক্ষমতার ও অলৌকিকতার নিদর্শন বানাবো। তোমার পুত্র আমার পক্ষ থেকে (জগতের জন্য) রহমত বলে সাব্যস্ত হবে। আর আমার এই সিদ্ধান্ত অটল। মারইয়াম, আল্লাহ তাআলা তোমাকে এমন একজন পুত্রের সুসংবাদ প্রদান করছেন, যিনি তাঁর কালিমা[৪০] হবেন। তাঁর উপাধি হবে মাসিহ[৪১]। আর তার নাম হবে ইসা (ইয়াসু)। তিনি ইহলোকে ও পরলোকে খুব সম্মানিত ও মর্যাদাবান হবেন। কেননা, তিনি আল্লাহ তাআলার সান্নিধ্যপ্রাপ্তদের অন্যতম হবেন। তিনি আল্লাহ তাআলার কুদরতের নিদর্শনস্বরূপ মাতৃস্তন্যপায়ী বয়সেই মানুষের সঙ্গে বুদ্ধিদীপ্ত কথাবার্তা বলবেন। আর তিনি পূর্ণবয়সের প্রথম ধাপ (বার্ধক্যের প্রথম ধাপ) প্রাপ্ত হবেন। যাতে তিনি আল্লাহর বান্দাদের হেদায়েত ও নসিহতের কাজ সম্পন্ন করতে পারেন। আর এসব ব্যাপার অবশ্যই ঘটবে এইজন্য যে, আল্লাহ তাআলার কুদরতের বিধান এই যে, যখন তিনি কোনো বস্তুকে অস্তিত্ব প্রদান করতে ইচ্ছা করেন, তখন তার উদ্দেশে কেবল 'হয়ে যাও' বলে আদেশ করা বা ইচ্ছা করাই সেই বস্তুকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ববিশিষ্ট করে দেয়। এটা এইরূপেই হয়ে থাকবে। আর আল্লাহ তাআলা তাঁকে নিজের কিতাব দান করবেন। তাঁকে হেকমত

[৪০] অর্থাৎ, সাধারণ প্রজনন ও জন্মগ্রহণের নিয়ম থেকে ভিন্ন আল্লাহ তাআলার অলৌকিক ক্ষমতার নীতি অনুযায়ী আল্লাহ তাআলার হুকুম ও ইচ্ছায়ই তিনি মারইয়াম আলাইহিস সালাম-এর গর্ভে আসবেন।

[৪১] মাসিহ শব্দের অর্থ বরকতময় বা পর্যটক, যার কোনো আবাসস্থল নেই।

(প্রজ্ঞা) শিক্ষা দেবেন এবং তাঁকে বনি ইসরাইলের হেদায়েত ও নসিহতের জন্য রাসুল ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নবী বানাবেন।

কুরআনুল কারিম এই ঘটনাগুলোকে অলৌকিক বর্ণনাশৈলীর সঙ্গে সুরা আলে ইমরান ও সুরা মারইয়ামে উল্লেখ করেছে এভাবে—

إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ () وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ () قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ () وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ () وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ (سورة آل عمران)

"স্মরণ করো (সেই সময়ের কথা), যখন ফেরেশতাগণ বললো, 'হে মারইয়াম, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাকে তাঁর পক্ষ থেকে একটি কালিমার[৪২] সুসংবাদ দিচ্ছেন। তার নাম মাসিহ[৪৩] মারইয়াম-তনয় ইসা, সে দুনিয়া ও আখেরাতে সান্নিধ্যপ্রাপ্তগণের অন্যতম হবে। সে দোলনায় থাকা অবস্থায় ও পরিণত বয়সে মানুষের সঙ্গে কথা বলবে এবং সে হবে পুণ্যবানদের একজন।' সে বললো, 'হে আমার প্রতিপালক, আমাকে কোনো পুরুষ স্পর্শ করে নি, আমার সন্তান হবে কীভাবে?' তিনি বললেন, 'এভাবেই', আল্লাহ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। তিনি যখন কিছু স্থির করেন, তখন (অস্তিত্বপ্রাপ্তির জন্য) বলেন, 'হও' এবং তা (অস্তিত্বপ্রাপ্ত) হয়ে যায়। এবং তিনি তাকে শিক্ষা দেবেন কিতাব, হিকমত, তাওরাত ও ইনজিল। এবং তাকে বনি ইসরাইলের জন্য রাসুল করবেন।" [সুরা আলে ইমরান : আয়াত ৪৫-৪৯]

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا () فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا () قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا () قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا

---

[৪২] كلمة-এর অর্থ মানুষ যা বলে।

[৪৩] الْمَسِيحُ-এর অর্থ ওই ব্যক্তি যে কোনোকিছুর ওপর হাত বোলায়। হযরত ইসা আলাইহিস সালাম রোগীর ওপর হাত বুলিয়ে রোগীকে রোগমুক্ত করতেন—এই অর্থে তাঁকে মাসিহ বলা হতো। শব্দটি পর্যটক অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

() قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا () قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا (سورة مريم)

"বর্ণনা করো এই কিতাবে উল্লেখিত মারইয়ামের কথা, যখন সে তার পরিবারবর্গ থেকে পৃথক হয়ে নিরালায় (মসজিদে আকসার) পূর্বদিকে একস্থানে আশ্রয় নিলো। তারপর তাদের থেকে সে পর্দা করলো। তখন আমি তার কাছে আমার রুহকে[৪৪] (জিবরাইলকে) পাঠালাম, সে তার কাছে পূর্ণ মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করলো। মারইয়াম বললো, 'আল্লাহকে ভয় করো, যদি তুমি মুত্তাকি হও, আমি তোমার থেকে দয়ময়ের আশ্রয় প্রার্থনা করছি।' সে বললো, 'আমি তো তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রেরিত (ফেরেশতা), তোমাকে এক পবিত্র পুত্র দান করার জন্য (আল্লাহ তাআলার নির্দেশে আল্লাহর পথে)।' মারইয়াম বললো, কেমন করে আমার পুত্র হবে যখন আমাকে কোনো পুরুষ স্পর্শ করে নি এবং আমি ব্যভিচারিণীও নই?' সে বললো, 'এইরূপেই হবে।' তোমার প্রতিপালক বলেছেন, 'তা আমার জন্য সহজসাধ্য এবং আমি তাকে এইজন্য সৃষ্টি করবো যেনো সে (মাসিহ) হয় মানুষের জন্য (আমার কুদরতের) এক নিদর্শন ও আমার নিকট থেকে এক অনুগ্রহ; এটা তো স্থীরিকৃত ব্যাপার।'" [সূরা মারইয়াম : আয়াত ১৬-২১]

জিবরাইল আলাইহিস সালাম হযরত মারইয়াম আলাইহিস সালামকে এই সুসংবাদ প্রদান করে তাঁর জামার বুকের অংশে ফুঁক দেন। এভাবে আল্লাহ তাআলার কালিমা মারইয়াম আলাইহিস সালাম পর্যন্ত পৌঁছে যায়। মারইয়াম আলাইহিস সালাম কিছুদিন পর নিজেকে গর্ভবতী অনুভব করলেন। তখন মানবসুলভ স্বভাবের কারণে তিনি অত্যন্ত অস্থির হয়ে উঠলেন এবং সে-সময়েই তাঁর অস্থিরতার অবস্থা অত্যন্ত প্রকট হয়ে উঠলো। তিনি যখন দেখতে পেলেন যে, তাঁর গর্ভধারণের সময় শেষ হয়ে গিয়ে সন্তান প্রসবের সময় অত্যাসন্ন, তিনি ভাবলেন, এই ঘটনা যদি

---

[৪৪] কুরআনে উল্লেখিত روح শব্দটি বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে روح দ্বারা ফেরেশতাদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে শক্তিশালী ও মর্যাদাবান তাঁকে অর্থাৎ জিবরাইলকে বুঝানো হচ্ছে।

আমার সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকেই ঘটে যায়, তবে তারা যেহেতু প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে কিছু জানে না, জানি না, এ-কারণে তারা কীভাবে কীভাবে দুর্নাম রটিয়ে ও মিথ্যা অপবাদ দিয়ে আমাকে কী পরিমাণ অস্থির ও উদ্বিগ্ন করে তুলবে। সুতরাং, আমার জন্য সঙ্গত হলো জনপদ থেকে দূরে কোথাও চলে যাওয়া। এই ভেবে তিনি জেরুজালেম (বাইতুল মুকাদ্দাস) থেকে প্রায় নয় মাইল দূরে সারাত (সাঈর) পর্বতের একটি টিলার ওপর চলে গেলেন। যা বর্তমানে বাইতুল লাহাম (বেথেলহেম) নামে বিখ্যাত। ওখানে পৌঁছার কয়েকদিন পর তাঁর প্রসববেদনা শুরু হলো। তখন যন্ত্রণা ও অস্থিরতার অবস্থায় তিনি একটি খেজুর গাছের নিচে তার একটি ডাল ধরে বসে পড়লেন এবং আসন্ন সঙ্কটময় অবস্থার কথা অনুমান করে অত্যন্ত অস্থিরতা ও উদ্বেগের সঙ্গে বলতে লাগলেন, কতই না ভালো হতো, যদি আমি এর পূর্বে মরে যেতাম এবং আমার অস্তিত্বকে মানুষ একেবারে ভুলে যেতো! তখন খেজুর বাগানের নিম্নভাগ থেকে আল্লাহ তাআলার ফেরেশতা পুনরায় তাঁকে ডেকে বললেন, হে মারইয়াম, চিন্তা করো না, আল্লাহ তোমার নিম্নভাগে নহর[৪৫] সৃষ্টি করে দিয়েছেন। আর তুমি খেজুরের ডাল ধরে নিজের দিকে নাড়া দাও, তাহলে পাকা ও তাজা খেজুরের থোকা তোমার ওপর পড়তে থাকবে। তারপর তুমি খাও ও পান করো এবং তোমার সদ্যজাত শিশুকে দেখে প্রাণ জুড়াও এবং যাবতীয় দুঃখ-যন্ত্রণা ভুলে যাও।

হযরত মারইয়াম আলাইহিস সালাম-এর ওপর একাকিত্ব, যন্ত্রণা ও সঙ্কটময় অবস্থার কারণে যে-আতঙ্ক ও উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছিলো, ফেরেশতার সান্ত্বনাবাণী এবং হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর মতো সম্মানিত শিশুর চেহারা দেখে তা দূর হয়ে গেলো। তিনি হযরত ইসা আলাইহিস সালামকে দেখে দেখে আনন্দিত হতে লাগলেন। তবুও একটি দুশ্চিন্তা কাঁটার মতো সবসময় তাঁর অন্তরে বিদ্ধ হচ্ছিলো যে,

---

[৪৫] আরবি ভাষায় سَرِيًّا যেমন নহরকে বলা হয়, তেমনি তা উচ্চ মর্যাদাশীল ব্যক্তিত্বকেও বুঝিয়ে থাকে। জমহুর উলামায়ে কেরাম এখানে প্রথম অর্থই গ্রহণ করেছেন। আর হাসান বসরি রহ., রবি বিন আনাস রহ. এবং ইবনে আসলাম রহ. দ্বিতীয় অর্থটি গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা তোমার নিম্নে এক উচ্চ মর্যাদাশীল ব্যক্তি সৃষ্টি করে দিয়েছেন।—আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, দ্বিতীয় খণ্ড।

যদিও আমার জাতি ও সম্প্রদায় আমার পবিত্রতা ও সতীত্ব সম্পর্কে বিশেষভাবে অবগত রয়েছে, তারপরও তাদের এই বিস্ময়কে কেমন করে দূর করা সম্ভব হবে যে, পিতার সংস্পর্শ ব্যতীত কী করে মায়ের গর্ভে থেকে সন্তান জন্ম নিতে পারে!

কিন্তু যে-মহান আল্লাহ মারইয়াম আলাইহিস সালামকে এই সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলেন তিনি তাঁকে এই যন্ত্রণা ও অস্থিরতার মধ্যে ফেলে রাখবেন কেনো? সুতরাং, আল্লাহ ফেরেশতার মাধ্যমে পুনরায় মারইয়াম আলাইহিস সালাম-এর কাছে এই পয়গাম পাঠালেন যে, যখন তুমি তোমার সম্প্রদায়ের কাছে পৌঁছবে এবং তারা তোমাকে এসব ব্যাপার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে, তখন তুমি নিজে কোনো উত্তর দিও না; বরং ইঙ্গিতে তাদেরকে জানিয়ে দিও যে, 'আমি রোযাদার, সুতরাং আজ আমি কারো সঙ্গে কথা বলবো না। তোমাদের যা-কিছু জিজ্ঞাসা করার দরকার এই শিশুকে জিজ্ঞাসা করো।' তখন তোমার প্রতিপালক তাঁর পূর্ণ কুদরতের নিদর্শন প্রকাশ করে তাদের বিস্ময়কে দূর করে দেবেন এবং তাদের অন্তরকে শান্ত ও তৃপ্ত করবেন।

হযরত মারইয়াম আলাইহিস সালাম আল্লাহর ওহির পয়গামে নিশ্চিত হয়ে সদ্যজাত শিশুকে কোলে নিয়ে বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে যাত্রা করলেন। তিনি শহরে পৌঁছার পর লোকেরা মারইয়াম আলাইহিস সালামকে এই অবস্থায় দেখে চারপাশ থেকে ঘিরে ধরলো এবং বলতে লাগলো, মারইয়াম, এটা কী! তুমি তো বড়ই বিস্ময়কর কাণ্ড ঘটিয়ে দেখালে এবং তুমি মারাত্মক দুর্নামের কাজ করে ফেলেছো। হে হারুনের বোন, তোমার পিতাও মন্দ লোক ছিলেন না, তোমার জননীও কখনো ব্যভিচারিণী ছিলেন না। তবে তুমি এটা কী করে বসলে?

মারইয়াম আলাইহিস সালাম আল্লাহ তাআলার নির্দেশ পালন করে শিশুর দিকে ইঙ্গিত করে জানিয়ে দিলেন, যা কিছু জিজ্ঞেস করতে হয় এর কাছে জিজ্ঞেস করো। আমি তো আজ রোযাদার[৪৬]। লোকেরা এ-কথা শুনে চরম বিস্ময়ের সঙ্গে বললো, আমরা কী করে এমন দুগ্ধপোষ্য শিশুর সঙ্গে কথা বলতে পারি, যে এখনো মায়ের কোলে শায়িত? কিন্তু শিশু তৎক্ষণাৎ বলে উঠলো, 'আমি আল্লাহর বান্দা। আল্লাহ তাআলা (তাঁর তাকদিরের

---

[৪৬] বনি ইসরাইলের ধর্মে রোযাদার অবস্থায় নীরবতাপালনও ইবাদতের মধ্যে গণ্য ছিলো।

সিদ্ধান্তে) আমাকে কিতাব (ইঞ্জিল) দান করেছেন এবং নবী নিযুক্ত করেছেন। তিনি আমাকে বরকতময় বানিয়েছেন। আমি যে-কোনো অবস্থায় ও যে-কোনো স্থানেই থাকি না কেনো, তিনি আমাকে নামায পড়া ও যাকাত আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। আমার জীবিতকাল পর্যন্ত তা-ই যেনো আমার অভ্যাস থাকে। আর তিনি আমাকে আমার জননীর খেদমতগার বানিয়ে দিয়েছেন এবং তিনি আমাকে অহঙ্কারী, স্বেচ্ছাচারী ও অবাধ্যাচারী বানান নি। আর আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আমার জন্য নিরাপত্তার বিধান রয়েছে—যেদিন আমি জন্মলাভ করেছি, যেদিন আমি মৃত্যুবরণ করবো এবং যেদিন আমাকে পুনরুজ্জীবিত করে ওঠানো হবে।

আল্লাহ তাআলা এসব বিস্তারিত বিবরণ সুরা আম্বিয়া, সুরা তাহরিম ও সুরা মারইয়ামে উল্লেখ করেছেন—

وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ

"এবং স্মরণ করো সেই নারীকে (মারইয়ামকে) যে নিজ সতীত্বকে রক্ষা করেছিলো, তারপর তার মধ্যে আমি আমার রুহ ফুঁকে দিয়েছিলাম এবং তাকে ও তার পুত্রকে করেছিলাম বিশ্ববাসীর জন্য এক নিদর্শন।" [সুরা আম্বিয়া : আয়াত ৯১]

وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ (سورة التحريم)

"আরো দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন ইমরান-তনয়া মারইয়ামের যে তার সতীত্ব রক্ষা করেছিলো, ফলে আমি তার মধ্যে রুহ ফুঁকে দিয়েছিলাম এবং সে তার প্রতিপালকের বাণী ও তাঁর কিতাবসমূহ সত্য বলে গ্রহণ করেছিলো, সে ছিলো অনুগতদের অন্যতম।" [সুরা আত-তাহরিম : আয়াত ১২]

فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا () فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا () فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا () وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا () فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا () فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ

شَيْئًا فَرِيًّا () يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا () فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا () قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا () وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا () وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا () وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا (سورة مريم)

"তারপর সে তাকে গর্ভে ধারণ করলো; তারপর সে (নিজের অবস্থা গোপন করে রাখার জন্য) তাকে-সহ এক দূরবর্তী স্থানে চলে গেলো; প্রসববেদনা (-এর অস্থিরতা) তাকে এক খর্জুরবৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য করলো (এবং সে তার ডাল ধরে বসে পড়লো)। সে বললো, 'হায়, এর পূর্বে আমি যদি মরে যেতাম এবং মানুষের স্মৃতি থেকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হতাম!' ফেরেশতা তাকে নিম্নপার্শ্ব থেকে আহ্বান করে তাকে বললো, তুমি দুঃখ করো না, তোমার পাদদেশে তোমার প্রতিপালক এক নহর সৃষ্টি করেছেন; তুমি তোমার দিকে খর্জুরবৃক্ষের কাণ্ডে নাড়া দাও; তা তোমাকে সুপক্ব তাজা খেজুর দান করবে। সুতরাং আহার করো, পান করো এবং (নিজের সদ্যজাত শিশুকে দর্শন করে) চক্ষু জুড়াও। মানুষের মধ্যে কাউকেও যদি তুমি দেখো (এবং সে তোমাকে জিজ্ঞেস করতে শুরু করে) তখন (ইঙ্গিতে) বলে দাও, 'আমি দয়াময়ের উদ্দেশ্যে মৌনতা অবলম্বনের মানত করেছি। সুতরাং আজ আমি কিছুতেই কোনো মানুষের সঙ্গে বাক্যালাপ করবো না।' তারপর সে সন্তান নিয়ে তার সম্প্রদায়ের কাছে উপস্থিত হলো; তারা (শিশুটিকে দেখেই) বললো, 'হে মারইয়াম, তুমি তো এক অদ্ভুত কাণ্ড করে বসেছো। হে হারুনের বোন[৪৭], তোমার পিতা অসৎ ব্যক্তি ছিলো না এবং তোমার মাতাও ছিলো না ব্যভিচারিণী।' (তুমি এটা কী করে বসলে?) তারপর মারইয়াম কোলের সন্তানের প্রতি ইঙ্গিত করলো (যে, এই শিশুই

[৪৭] তিনি হযরত মুসা আলাইহিস সালাম-এর ভাই হযরত হারুন আলাইহিস সালাম-এর বংশোদ্ভূত বলে তাঁকে হারুনের বোন বলা হয়েছে।
অথবা, হারুন মারইয়াম আলাইহিস সালাম-এর সম্প্রদায়ে একজন বড় আবেদ, পরহেযগার ব্যক্তি ছিলেন। এবং তিনি অতিশয় সৎ বলে খ্যাত ছিলেন।—তাফসিরে ইবনে কাসির

বলে দেবে প্রকৃত ঘটনা কী)। তারা বললো, যে কোলের শিশু[৪৮] তার সঙ্গে আমরা কেমন করে কথা বলবো?' সে বললো, 'আমি তো আল্লাহর বান্দা। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন[৪৯], আমাকে নবী বানিয়েছেন, যেখানেই আমি থাকি না কেনো তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন, তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যতদিন জীবিত থাকি ততদিন সালাত ও যাকাত আদায় করতে—আর আমাকে আমার মাতার প্রতি অনুগত করেছেন এবং তিনি আমাকে করেন নি উদ্ধত ও হতভাগ্য; আমার প্রতি শান্তি যেদিন আমি জন্মলাভ করেছি, যেদিন আমার মৃত্যু হবে এবং যেদিন জীবিত অবস্থায় আমি উত্থিত হবো।'" [সুরা মারইয়াম : আয়াত ২২-৩৩]

সম্প্রদায়ের লোকেরা একটি দুগ্ধপোষ্য শিশুর মুখে যখন এসব জ্ঞানগর্ভ কথা শুনতে পেলো, বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলো এবং তাদের দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গেলো যে, মারাইয়াম আলাইহিস সালাম সবধরনের অপবিত্রতা ও কলুষতা থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। আর এই শিশুর জন্মলাভের বিষয়টি অবশ্যই আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তাঁর পূর্ণ কুদরতের একটি নিদর্শন।

মারইয়াম আলাইহিস সালাম-এর সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সংবাদ এমন ছিলো না যে তা গোপনীয় থেকে যায়। নিকটবর্তী ও দূরবর্তী সব জায়গাতেই এই বিস্ময়কর ঘটনা এবং হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর অলৌকিক ও অস্বাভাবিক উপায়ে জন্মলাভের বিষয়টি চর্চিত হতে লাগলো। সৎ ব্যক্তিরা তাঁর অস্তিত্বকে কল্যাণ ও সৌভাগ্যের চাঁদ বলে মনে করতে লাগলো আর অসৎ ব্যক্তিরা তাঁর সত্তাকে নিজেদের জন্য অশুভ লক্ষণ মনে করলো এবং হিংসা ও বিদ্বেষের আগুন ভেতরে ভেতরে তাদের স্বাভাবিক যোগ্যতাকে নিঃশেষ করে দিতে লাগলো।

মোটকথা, প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে আল্লাহ তাআলা তাঁর নিরাপত্তা ও তত্ত্বাবধানের মধ্যে এই পবিত্র শিশুর প্রতিপালন করতে থাকলেন। কারণ, তিনি এই শিশুর মাধ্যমে বনি ইসরাইলের মৃত অন্তরসমূহকে সজীবতা ও

---

[৪৮] مهد শব্দটির অর্থ দোলনা; কিন্তু এখানে 'দোলনার শিশু' না বলে 'কোলের শিশু' বললে প্রকৃত অর্থ প্রকাশ পায়।—ইমাম রাযি রহ.।

[৪৯] তখনো কিতাব দেয়া হয় নি; তবে কিতাব যে দেয়া হবে এটা তাঁকে জানানো

নবজীবন দান করবেন। তাদের আত্মিক শক্তির শুষ্ক বৃক্ষকে পুনরায় ফলবান করবেন। কুরআনুল কারিমে আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ

“এবং আমি মারইয়াম-তনয় ও তার জননীকে করেছিলাম এক নিদর্শন, তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছিলাম এক নিরাপদ ও প্রস্রবণবিশিষ্ট উচ্চ ভূমিতে[৫০]।” [সুরা মুমিনুন : আয়াত ৫০]

জন্মগ্রহণের সুসংবাদ

কুরআনুল কারিম হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর শৈশবকালের অবস্থাবলি থেকে কেবল উল্লিখিত ঘটনাটুকু বর্ণনা করেছে। তাঁর শৈশবকালের অন্যান্য ঘটনা, যার সঙ্গে উপদেশ ও শিক্ষার উদ্দেশ্যের কোনো সম্পর্ক নেই, কুরআনুল কারিম সেগুলোকে বর্ণনা করে নি। কিন্তু ইসরাইলি রেওয়ায়েতসমূহের বিখ্যাত বর্ণনাকারী ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ

---

[৫০] وأقرب الأقوال في ذلك ما رواه العوفي، عن ابن عباس في قوله: { وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ} ، قال: المعين الماء الجاري، وهو النهر الذي قال الله تعالى: { قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا } [مريم: 24].

وكذا قال الضحاك، وقتادة: { إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ } : هو بيت المقدس. فهذا والله أعلم هو الأظهر؛ لأنه المذكور في الآية الأخرى. والقرآن يفسر بعضه بعضا. وهو أولى ما يفسر به، ثم الأحاديث الصحيحة، ثم الآثار.

“এ-ক্ষেত্রে সম্ভাব্য সঠিক বক্তব্য হলো যা আওফি আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি { وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ (তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছিলাম এক নিরাপদ ও প্রস্রবণবিশিষ্ট উচ্চ ভূমিতে) আয়াতের তাফসিরে বলেছেন, المعين শব্দের অর্থ ‘প্রবহমান পানি’; তার দ্বারা ওই নহর উদ্দেশ্য যাকে আল্লাহ তাআলা (তোমার পাদদেশে তোমার প্রতিপালক এক নহর সৃষ্টি করেছেন) আয়াতে উল্লেখ করেছেন।

আর কাতাদা রহ. ও যাহ্হাক রহ. একই মত ব্যক্ত করেছেন। অর্থাৎ, إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ আয়াত দ্বারা বাইতুল মুকাদ্দাস(-এর ভূমি) উদ্দেশ্য। এই অভিমতই অধিক সুস্পষ্ট। কারণ অন্য এক আয়াতে তার উল্লেখ রয়েছে। আর কুরআনের এক অংশ অপর অংশের তাফসির করে থাকে। কুরআনের কোনো আয়াতের যে-তাফসির অন্য আয়াত করে থাকে, সেটাই সর্বোত্তম তাফসির। তারপর সহিহ হাদিস দ্বারা কৃত তাফসির, তারপর সাহাবায়ে কেরাম রা.-এর বাণী দ্বারা কৃত তাফসির।” [তাফসিরে ইবনে কাসির, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৪৬]

থেকে যেসব ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে এবং ম্যাথুর ইঞ্জিলে যেসব ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে তার মধ্যে এই ঘটনার বর্ণনাও রয়েছে যে, হযরত ইসা আলাইহিস সালাম ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর সেই রাতেই পারস্যের সম্রাট আকাশে একটি অভিনব উজ্জ্বল নক্ষত্র দেখতে পেলেন। সম্রাট তার দরবারের জ্যোতিষীদের এই নক্ষত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তারা বললো, এই নক্ষত্রের উদয় একজন অতি মর্যাদাবান মহাপুরুষের জন্মলাভের সংবাদ বহন করছে। তিনি শামদেশে জন্মগ্রহণ করেছেন। সম্রাট এসব কথা শুনে সুগন্ধি দ্রব্যসমূহের উত্তম উপঢৌকনসহ একটি প্রতিনিধিদল শামদেশে প্রেরণ করলেন। তারা ওখানে গিয়ে ওই মর্যাদাবান শিশুর জন্মগ্রহণ সম্পর্কে যাবতীয় অবস্থা ও ঘটনা জেনে আসবে। এই প্রতিনিধিদল শামদেশে পৌঁছে অবস্থান অনুসন্ধান শুরু করে দিলো এবং ইহুদিদের বললো, আমাদেরকে সেই শিশুর জন্মবৃত্তান্ত শোনাও যিনি অচিরকালের মধ্যেই রুহানি জগতের সম্রাট সাব্যস্ত হবেন। ইহুদিরা পারস্যের প্রতিনিধিদলের মুখে এই কথাগুলো শুনে তাদের বাদশাহ হিরোদিয়াসকে (হ্যারডকে) এ-ব্যাপারে সংবাদ প্রদান করলো। বাদশাহ হিরোদিয়াস পারস্যের প্রতিনিধিদলকে তার দরবারে ডেকে এনে ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন এবং তাদের মুখে ঘটনা শুনে ভীষণভাবে ঘাবড়ে গেলেন। তিনি প্রতিনিধিদলকে অনুমতি দিলেন যে, তারা যেনো ওই শিশু সম্পর্কে আরো ভালোভাবে তথ্যাবলি জানেন।

পারস্যের এই প্রতিনিধিদল জেরুজালেমে (বাইতুল মুকাদ্দাসে) পৌঁছলো। যখন তারা ইয়াসু আলাইহিস সালামকে দেখলো, তাদের রীতি ও প্রথা অনুযায়ী প্রথমে তাঁকে সম্মান প্রদর্শপূর্বক সেজদা করলো। তারপর বিভিন্ন ধরনের সুগন্ধি দ্রব্য তার ওপর ছড়িয়ে দিলো। তারা কয়েক দিন বাইতুল মুকাদ্দাসেই অবস্থান করলো। ওখানে অবস্থানকালে প্রতিনিধিদলের কেউ কেউ স্বপ্নে দেখলো যে, বাদশাহ হিরোদিয়াস (হ্যারড) এই শিশুর শত্রু প্রমাণিত হবেন। সুতরাং এখন তোমরা তার কাছে যেয়ো না; বরং বাইতুল লাহাম থেকে সোজা পারস্যে চলে যাও। সকালে প্রতিনিধিদলের পারস্য যাত্রাকালে হযরত মারইয়াম আলাইহিস সালামকে তাদের স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনিয়ে বললো, মনে হয়, ইহুদিয়ার বাদশাহ হিরোদিয়াসের উদ্দেশ্য অসৎ এবং তিনি এই পবিত্র শিশুর শত্রু। সুতরাং, তোমার জন্য উত্তম ব্যবস্থা এই হবে যে, তুমি তোমার পুত্রকে এমন স্থানে

নিয়ে গিয়ে রাখো যা বাদশাহ হিরোদিয়াসের নাগালের বাইরে।' এই পরামর্শ পেয়ে হযরত মারইয়াম আলাইহিস সালাম ইয়াসুকে (মাসিহকে) নিয়ে মিসরে তাঁর কয়েকজন স্বজনের কাছে চলে গেলেন। তারপর তাঁকে নিয়ে ওখান থেকে নাসেরাহ নামক স্থানে চলে গেলেন। যখন হযরত ইসা আলাইহিস সালাম তেরো বছর বয়সে পদার্পণ করলেন, তখন তাঁকে নিয়ে পুনরায় বাইতুল মুকাদ্দাসে ফিরে এলেন।

এই রেওয়ায়েতগুলো এই তথ্যও প্রদান করছে যে, হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর শৈশবকালও ঘটনাবহুল ও অসাধান ছিলো এবং তাঁর মধ্য দিয়ে বিভিন্ন কারামত প্রকাশ পেয়েছিলো।[৫১]

শারীরিক গঠন ও অবয়ব

সহিহ বুখারিতে বর্ণিত মিরাজের হাদিসে আছে যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হলে আমি দেখলাম, তিনি মধ্যাকৃতির ও রক্তাভ শুভ্র বর্ণবিশিষ্ট। তার দেহ এত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ছিলো, মনে হচ্ছিলো যেনো তিনি এই মাত্র গোসলখানা থেকে গোসল করে এসেছেন। আর কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে যে, তাঁর কেশগুচ্ছ কাঁধ পর্যন্ত ঝুলে রয়েছে। আর কোনো কোনো হাদিসে আছে, তাঁর দেহের বর্ণ উজ্জ্বল গন্ধমের বর্ণ ছিলো। সহিহ বুখারির রেওয়ায়েতের সঙ্গে এই রেওয়ায়েতের পার্থক্য শুধু বর্ণনাভঙ্গির ক্ষেত্রে, তাদের মর্মার্থ একই। সৌন্দর্যে যদি ফর্সা রঙের সঙ্গে লাবণ্যেরও মিশ্রণ ঘটে, তবে সেই সৌন্দর্যে এক বিশেষ অবস্থার সৃষ্টি হয়। কখনো যদি তার সঙ্গে রক্তিম আভা ফুটে ওঠে, ফর্সা বর্ণটি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। আর কখনো যদি লাবণ্য প্রবল হয়, তখন মুখাবয়বে সৌন্দর্য ও কমনীয়তার সঙ্গে গোধূম রঙ ফুটে ওঠে।

নবুওত ও রিসালাত

হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর পূর্বে বনি ইসরাইলরা সবধরনের গর্হিত কর্মে লিপ্ত ছিলো এবং ব্যক্তিগত ও সামগ্রিক দোষ-ত্রুটি ও

---

[৫১] তারিখে ইবনে কাসির, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭৭; মতির ইঞ্জিল, দ্বিতীয় অধ্যায়।

অপরাধের এমন কোনো দিক নেই যা তাদের মধ্যে ছিলো না। তারা বিশ্বাসগত ও কর্মগত উভয় ধরনের পথভ্রষ্টতার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে গিয়েছিলো। এমনকি তাদের কওমের পথপ্রদর্শক ও নবীদেরকে হত্যা করতেও তারা বেপরোয়া ও দুঃসাহসী হয়ে উঠেছিলো। ইয়াহুদিয়ার বাদশাহ হিরোদিয়াস (হ্যারড) সম্পর্কে আপনারা জানতে পেরেছেন যে, সে তার প্রেয়সীর প্ররোচনায় কী নির্মমভাবে হযরত ইয়াহইয়া আলাইহিস সালামকে হত্যা করিয়েছিলো। সে এই গর্হিত অপরাধ শুধু এইজন্য করেছিলো যে, সে হযরত ইয়াহইয়া আলাইহিস সালাম-এর ক্রমবর্ধমান আত্মিক গ্রহণযোগ্যতাকে সহ্য করতে পারছিলো না এবং তাঁর প্রেয়সীর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কের বিরুদ্ধে ইয়াহইয়া আলাইহিস সালাম-এর নিষেধবাণীও সহ্য করতে পারে নি। এই শিক্ষামূলক ঘটনাটি হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর জীবিতকালেই তাঁর নবুওতপ্রাপ্তির পূর্বে ঘটেছিলো।

দায়িরাতুল মাআরিফ (পিটার্স বুস্তানি কর্তৃক রচিত বিশ্বকোষ)-এ ইহুদি-সম্পর্কিত যে-নিবন্ধ রয়েছে তার ঐতিহাসিক মৌলবস্তু থেকে প্রমাণিত হয় যে, হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর নবুওতপ্রাপ্তির পূর্বে ইহুদিদের আকিদা ও বিশ্বাস এবং কর্মকাণ্ডের অবস্থা এই ছিলো যে, তারা শিরকমূলক সংস্কার ও বিশ্বাসকে ধর্মের অংশ বানিয়ে নিয়েছিলো। আর মিথ্যা, প্রতারণা, হিংসা ও বিদ্বেষের মতো দুশ্চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে কার্যত সচ্চরিত্রতার মর্যাদা দিয়ে রেখেছিলো এবং এ-কারণেই লজ্জিত হওয়ার পরিবর্তে তারা গর্ব প্রকাশ করতো। আর তাদের উলামা ও ধর্মযাজকগণ তো পার্থিব স্বার্থে ও লোভে আল্লাহ তাআলার কিতাব তাওরাতকেও বিকৃত না করে ছাড়ে নি। তার রৌপ্যমুদ্রা ও স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে আল্লাহ তাআলার আয়াতসমূহকে বিক্রি করে ফেলেছিলো। অর্থাৎ, সাধারণ লোকদের থেকে মান্নত ও প্রসাদ লাভ করার উদ্দেশ্যে হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল সাব্যস্ত করতেও তারা ইতস্তত করে নি এবং এইভাবে তারা আল্লাহ তাআলার নীতিমালাকে বিকৃত করে ফেলেছিলো। ইহুদিদের বিশ্বাসগত ও কর্মমূলক জীবনের সংক্ষিপ্ত ও পূর্ণাঙ্গ চিত্র আমাদেরকে শা'ইয়া আলাইহিস সালাম-এর ভাষ্য—স্বয়ং তাওরাত দেখাচ্ছে এভাবে :

"খোদা বলেন, এই উম্মত (বনি ইসরাইল) মুখে তো আমার সম্মান করে থাকে; কিন্তু তাদের আমার থেকে বহু দূরে। আর এরা আমার নিষ্ফল ইবাদত করে থাকে। কেননা, আমার নির্দেশাবলিকে পেছনে ঠেলে মানুষের রচিত বিধানাবলি সর্বসাধারণকে শিক্ষ দিয়ে থাকে।"

সারকথা, যখন এই অন্ধকারদীর্ণ অবস্থায় হযরত ইয়াহইয়া আলাইহিস সালাম-এর হত্যাকাণ্ড ঘটে গেলো এবং বনি ইসরাইল আল্লাহ তাআলার বিধি-বিধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও অবাধ্যাচরণের চরম সীমায় পৌঁছলো, তখন সেই শুভ মুহূর্ত চলে এলো যে, যে-শিশু হযরত মারইয়াম আলাইহিস সালাম-এর কোলে থেকে সত্যের পয়গাম শুনিয়ে বনি ইসরাইলকে বিস্ময়ে হতবাক করে দিয়েছিলেন, প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে তিনি এই ঘোষণা দিলেন, আমি আল্লাহ তাআলার প্রেরিত নবী ও রাসুল এবং মানুষকে সত্য পথে পরিচালিত করা ও উপদেশ দেয়া আমার কর্তব্য। এসব কথা শুনে তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে শোরগোলের সৃষ্টি হলো। তিনি রিসালাতের সম্মানে সম্মানিত হয়ে এবং আল্লাহ তাআলার মুখপাত্র হয়ে এলেন এবং তাঁর সত্যতা ও সততার আলোতে গোটা ইসরাইলি জগৎকে উদ্ভাসিত করলেন। এই পবিত্র সত্তা তাঁর সম্প্রদায়কে ভীতি প্রদর্শন করলেন এবং ইহুদি উলামাদের ধর্মীয় সভাসমূহ, ধর্মযাজক ও দরবেশদের নির্জন বৈঠকসমূহে, বাদশাহ ও আমির-উমারার দরবারে এবং সাধারণ ও বিশিষ্ট লোকদের মাহফিলে, এমনকি অলিগলি ও বাজারসমূহে দিন-রাত আল্লাহ তাআলার এই পয়গাম শুনালেন :

"হে লোকসকল, আল্লাহ তাআলা আমাকে তাঁর নবী ও রাসুল বানিয়ে তোমাদের কাছে পাঠিয়েছেন। তিনি তোমাদের সংশোধনের দায়িত্ব আমার ওপর ন্যস্ত করেছেন। আমি তাঁর পক্ষ থেকে সত্যের পয়গাম নিয়ে এসেছি। আর তোমাদের হাতে আল্লাহর যে-বিধান (তাওরাত) আছে এবং যাকে তোমরা তোমাদের অজ্ঞতা ও বক্রতার কারণে পেছনে ফেলে দিয়েছো, আমি তার সত্যায়ন করছি এবং তার পূর্ণতা সাধনের জন্য আল্লাহর কিতাব (ইঞ্জিল) নিয়ে এসেছি। এই কিতাব সত্য-মিথ্যার মধ্যে মীমাংসা করবে এবং আজ সত্য ও মিথ্যার মধ্যে মীমাংসা হয়ে যাবে। তোমরা আমার কথা শুনো এবং বুঝো; তোমরা আনুগত্যের জন্য আল্লাহ তাআলার দরবারে অবনত হও। কেননা, এটাই ধর্মীয় ও পার্থিব সফলতা ও কল্যাণ লাভের পথ।"

এখন এই সত্য কথাগুলো এবং তা কী পরিণতি দাঁড়িয়েছিলো, তা কুরআনের ভাষায় শুনুন। সত্যের প্রতিষ্ঠা ও মিথ্যার বাতিল হওয়ার মর্ম উপলব্ধি করে উপদেশ ও নসিহত লাভ করুন। التذكير بأيام الله বা কুরআন কর্তৃক প্রাচীন উম্মত ও জাতিসমূহের কাহিনি বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হলো তার থেকে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করা।

আল্লাহ তাআলা বলছেন—

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ () وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ (سورة البقرة)

"এবং আমি নিশ্চয় মুসাকে কিতাব (তাওরাত) দিয়েছি এবং তার পরে পর্যায়ক্রমে রাসুলগণকে প্রেরণ করেছি, মারইয়াম-তনয় ইসাকে 'স্পষ্ট প্রমাণ'[৫২] দিয়েছি এবং 'পবিত্র আত্মা'[৫৩] দ্বারা তাকে শক্তিশালী করেছি। তবে কি যখনই কোনো রাসুল তোমাদের কাছে এমনকিছু এনেছে যা তোমাদের মনঃপূত নয়, তখনই তোমরা অহঙ্কার করেছো এবং (নবী ও রাসুলদের) কতককে অস্বীকার করেছো আর কতককে হত্যা করেছো? তারা বলেছিলো, 'আমাদের হৃদয় (সত্য গ্রহণ থেকে) আচ্ছাদিত',[৫৪] বরং কুফরির জন্য আল্লাহ তাদের লানত করেছেন। সুতরাং, তাদের অল্প সংখ্যকই ঈমান আনে।[৫৫]" [সুরা বাকারা : আয়াত ৮৭-৮৮]

وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ

"(স্মরণ করো, হে ইসা) যখন আমি তোমার থেকে বনি ইসরাইলকে (তাদের পাকড়াও ও হত্যা করার ষড়যন্ত্রকে) নিবৃত্ত রেখেছিলাম; তুমি

---

[৫২] 'প্রমাণ' অর্থে এখানে মুজিযা।

[৫৩] এখানে 'পবিত্র আত্মা দ্বারা' জিবরাইল আলাইহিস সালাম-কে বুঝাচ্ছে।

[৫৪] মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা-ই বলুন না কেনো, তাঁর কোনো কথাই আমাদের অন্তরে প্রবেশ করবে না।

[৫৫] এর অর্থ 'অতি অল্পই বিশ্বাস করে'ও হয়।

যখন তাদের কাছে স্পষ্ট নিদর্শন এনেছিলে তখন তাদের মধ্যে যারা কুফরি করেছিলো তারা বলছিলো, 'এটা তো স্পষ্ট জাদু।'" [সুরা মায়িদা : আয়াত ১১০]

وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ () إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ () فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (سورة آل عمران)

"(ইসা আলাইহিস সালাম বললেন,) 'আর আমি এসেছি আমার সামনে তাওরাতের যা-কিছু রয়েছে তার সমর্থকরূপে এবং তোমাদের জন্য যা নিষিদ্ধ ছিলো (তোমাদের বক্রতার অপরাধে) তার কতকগুলোকে বৈধ করতে। এবং আমি তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট নিদর্শন নিয়ে এসেছি। সুতরাং আল্লাহকে ভয় করো আর আমাকে অনুসরণ করো। নিশ্চয় আল্লাহ আমার প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক, সুতরাং তোমরা তার ইবাদত করবে। এটাই সরল পথ।' যখন ইসা তাদের অবিশ্বাস উপলব্ধি করলো তখন সে বললো, 'আল্লাহর পথে কারা আমার সাহায্যকারী?' হাওয়ারিগণ[৫৬] বললো, 'আমরাই আল্লাহর পথে সাহায্যকারী। আমরা আল্লাহে ঈমান এনেছি। আমরা আত্মসমর্পণকারী, তুমি এর সাক্ষী থেকো।" [সুরা আলে ইমরান : আয়াত ৫০-৫২]

مَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي لُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ ضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ اسِقُونَ (سورة الحديد)

"অতঃপর আমি তাদের পশ্চাতে অনুগামী করেছিলাম আমার রাসুলগণবে এবং অনুগামী করেছিলাম মারইয়াম-তনয় ইসাকে, আর তাবে দিয়েছিলাম ইঞ্জিল এবং তার অনুসারীদের অন্তরে দিয়েছিলাম করুণা ও দয়া। আর সন্ন্যাসবাদ—এটা তো তারা নিজেরাই আল্লাহর সন্তুা

[৫৬] হাওয়ারি অর্থ হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর অনুসারী।

লাভের জন্য প্রবর্তন করেছিলো। আমি তাদের এর (সন্ন্যাসবাদের) বিধান দিই নি; অথচ এটাও তারা যথাযথভাবে পালন করে নি। তাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছিলো, তাদেরকে আমি দিয়েছিলাম পুরস্কার এবং তাদের অধিকাংশই সত্যত্যাগী।" [সূরা আল-হাদিদ : আয়াত ২৭]

إِذْ قَالَ اللّٰهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ

"স্মরণ করো, আল্লাহ বলবেন, 'হে মারইয়াম-তনয় ইসা, তোমার প্রতি ও তোমার জননীর প্রতি আমার অনুগ্রহ স্মরণ করো : পবিত্র আত্মা (জিবরাইল আলাইহিস সালাম) দ্বারা তোমাকে আমি শক্তিশালী করেছিলাম এবং তুমি দোলনায় থাকা অবস্থায় ও পরিণত বয়সে মানুষের সঙ্গে কথা বলতে; তোমাকে কিতাব, হিকমত[৫৭], তাওরাত ও ইঞ্জিল শিক্ষা দিয়েছিলাম।" [সূরা মায়িদা : আয়াত ১১০]

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللّٰهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ

"স্মরণ করো, মারইয়াম-তনয় ইসা বলেছিলো, 'হে বনি ইসরাইল, আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর রাসুল এবং আমার পূর্ব থেকে তোমাদের কাছে যে-তাওরাত রয়েছে আমি তার সমর্থক এবং আমার পরে আহমদ[৫৮] নামে যে-রাসুল আসবে আমি তার সুসংবাদদাতা।'" [সূরা সাফ্ফ : আয়াত ৬]

প্রকাশ্য মুজিযাসমূহ

'কাসাসুল কুরআন' প্রথম খণ্ডে মুজিযার আলোচনায় বলা হয়েছে যে, সত্য ও সততাকে বিশ্বাস করা ও মেনে নেয়ার ক্ষেত্রে মানবস্বভাব চিরকালই দুটি পন্থায় অভ্যস্ত : ১. সত্যের দাবিদারের সত্যতা ও সততা প্রমাণের শক্তিতে ও দলিলের আলোর মাধ্যমে প্রমাণিত ও স্পষ্ট হয়ে

---

[৫৭] যাবতীয় বিষয়বস্তুকে সঠিক জ্ঞান দ্বারা জানাকে হিকমত বলে।
[৫৮] হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অপর নাম আহমদ।

ওঠে; ২. দলিল-প্রমাণের সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ওই ব্যক্তির সত্যতার সমর্থনে সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়মের বাইরে কার্যকারণ, উপায় ও কোনো জ্ঞান লাভ ছাড়া সত্যের দাবিদারের হাতে অস্বাভাবিক ও বিস্ময়কর ব্যাপারসমূহ এইভাবে প্রকাশ পায় যে, পৃথিবীর সাধারণ ও বিশিষ্ট সবধরনের লোকই তার সঙ্গে মোকাবিলা করতে অক্ষম হয়ে পড়ে এবং তাদের জন্য কার্যকারণ ছাড়া অনুরূপ ব্যাপার করে দেখানো সম্পূর্ণ অসম্ভব হয়। প্রথম পন্থার সঙ্গে দ্বিতীয় পন্থা মিলিত হয়ে মানুষের বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তির মধ্যে এবং তাদের মনস্তাত্ত্বিক অবস্থায় একটি বিপ্লব সৃষ্টি করে। ফলে তাদের অস্তিত্ব এ-বিষয়টি মেনে নিতে বাধ্য হয় যে, সত্যের প্রতি আহ্বানকারী (নবী ও রাসুল)-এর অস্বাভাবিক কাজ প্রকৃতপক্ষে তাঁর নিজের কাজ নয়; বরং তাঁর সঙ্গে আল্লাহ তাআলার শক্তি সক্রিয় রয়েছে এবং সন্দেহাতীতভাবে এটা তাঁর সত্যবাদী হওয়ার অতিরিক্ত প্রমাণ। যেমন কুরআনুল কারিমে বলা হয়েছে—

وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ

'(হে মুহাম্মদ[৫৯], বদরের যুদ্ধে কাফেরদের উদ্দেশে) তুমি নিক্ষেপ করো নি যখন তুমি নিক্ষেপ করেছো (সেই এক মুষ্টি ধুলি); বরং আল্লাহ নিক্ষেপ করেছেন।'[৬০]

এই আয়াতে অলৌকিক ও অস্বাভাবিক বিষয়কে প্রকাশ করাই উদ্দেশ্য। কিন্তু এই দুটি পন্থার মধ্যে জ্ঞানী ও বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ—যাঁরা উচ্চ বোধ ও বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন তাঁদের জন্য প্রথম পন্থাটিই কার্যকরী ও প্রভাবক প্রমাণিত হয়ে থাকে। আর দ্বিতীয় পন্থাটি প্রথম পন্থাটির সহায়ক ও শক্তিবর্ধকরূপে গৃহীত হয় এবং সত্যের প্রতি আহ্বানকারী (নবী ও রাসুল) নবুওত ও রিসালাতের দাবির সত্যতার পক্ষে তাকে অতিরিক্ত কার্যকরী প্রমাণরূপে বিশ্বাস করে তার ওপর ঈমান আনেন। আর ওই জ্ঞানী ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ বাদে যারা শক্তিশালী ও ক্ষমতাবান তাদের এবং তাদের প্রভাবে প্রভাবিত সাধারণ মানুষের অন্তরসমূহ (সত্যের দাবিদারকে) সত্যায়নের দ্বিতীয় পন্থা (অর্থাৎ মুজিযা) দ্বারা অধিক প্রভাবিত হয়ে থাকে। তারা নবী ও রাসুলগণের অলৌকিক কর্মকাণ্ডকে

---

[৫৯] সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

[৬০] সুরা আনফাল : আয়াত ১৭; প্রথম খণ্ডে এর বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে।

বিশ্বজগতের ক্ষমতা ও শক্তির বলয় থেকে উর্ধ্বস্থ সত্তার ইচ্ছা ও কর্মক্ষমতা বলে বিশ্বাস করতে বাধ্য হয় এবং অলৌকিক কার্যাবলিকে আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন বলে বিশ্বাস করে সত্য ও সততার দাওয়াতকে বিনাদ্বিধায় মেনে নেয়।

কুরআনুল কারিম অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রথম পন্থার প্রমাণকে 'হুজ্জতুল্লাহ', 'বুরহান' ও 'হেকমত' বলে ব্যক্ত করেছে। সুরা আন'আমে আল্লাহ তাআলার সত্তা, তাঁর একত্ব, দীন ও আখেরাতের মৌলিক বিশ্বাসসমূহ প্রমাণ, দৃষ্টান্ত ও উপমার মাধ্যমে বুঝিয়ে দেয়ার পর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে—

قُلْ فَلِلّٰهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ

"আপনি বলে দিন, আল্লাহর জন্যই রয়েছে পূর্ণ প্রমাণ (পূর্ণ ও স্পষ্ট দলিল)।"[৬১]

সুরা আন'আমেরই আরেক স্থানে হযরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম-এর আলোচনা-প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ (سورة الأنعام)

"আর ইহা আমার যুক্তি-প্রমাণ যা ইবরাহিমকে দিয়েছিলাম তার সম্প্রদায়ের মোকাবিলায়।"[৬২]

আর সুরা নিসায় বলা হয়েছে—

رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (سورة النساء)

"সুসংবাদ প্রদানকারী এবং ভীতিপ্রদর্শনকারী রাসুল প্রেরণ করেছি, যাতে রাসুল আসার পর আল্লাহর বিরুদ্ধে মানুষের কোনো অভিযোগ না থাকে (যে, আমাদের কাছে দলিল-প্রমানসহ পথপ্রদর্শনকারী আসে নি। সুতরাং আমরা সত্যধর্মের পরিচয় লাভ করা থেকে বঞ্চিত ছিলাম)। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" [সুরা নিসা : আয়াত ১৬৫]

সুরা নিসার আরেক আয়াতে বলা হয়েছে—

---

[৬১] সুরা আনআম : আয়াত ১৪৯।
[৬২] সুরা আন'আম : আয়াত ৮৩।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا (سورة النساء)

"(হে মানবজাতি,) তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে প্রমাণ (কুরআন) এসে পড়েছে, আর আমি তোমাদের প্রতি স্পষ্ট ও প্রকাশ্য জ্যোতি প্রেরণ করেছি।" [সুরা নিসা : আয়াত ৭৪]

সুরা ইউসুফে আছে—

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ

"সেই রমণী তো তার প্রতি আসক্ত হয়েছিলো এবং সেও তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়তো যদি না সে তার প্রতিপালকের নিদর্শন[৬৩] প্রত্যক্ষ করতো (যদি আল্লাহপাকের প্রমাণ দেখতে না পেতেন)।" [সুরা ইউসুফ : আয়াত ২৪]

সুরা আন-নাহলে বলা হয়েছে—

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

"তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান করো হেকমত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সঙ্গে তর্ক করো উত্তম পন্থায়।" [সুরা আন-নাহল : আয়াত ১২৫]

সুরা নিসায় বলা হয়েছে—

وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

"আর আল্লাহ তোমার ওপর নাযিল করেছেন কিতাব ও হিকতম।" [সুরা নিসা : আয়াত ১১৩]

একইভাবে 'হিকমত'-এর উল্লেখ সুরা বাকারা, সুরা আলে ইমরান, সুরা মায়িদা, সুরা লুকমান, সুরা সোয়ায়, সুরা যুখরুফ, সুরা আহযাব ও সুরা কামারে অধিক হারে বিদ্যমান রয়েছে।

আর দ্বিতীয় পন্থার দলিল-প্রমাণকে অধিকাংশ সময় أيات الله বা أية الله এবং কিছু জায়গায় أيات بينات বা بينات বলা হয়েছে।

হযরত সালেহ আলাইহিস সালাম-এর উটনী সম্পর্কে বলা হয়েছে—

قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً

---

[৬৩] -এর আভিধানিক অর্থ দলিল। এখানে 'নিদর্শন' অথবা প্রতিপালক কর্তৃক প্রদত্ত বিবেকের নির্দেশ।

"তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে একটি স্পষ্ট নিদর্শন এসেছে। আল্লাহর উষ্ট্রী তোমাদের জন্যে একটি (চরম মীমাংসাকারী) নিদর্শন।" [সুরা আ'রাফ : আয়াত ৭৩]

হযরত ইসা মাসিহ আলাইহিস সালাম ও তাঁর জননী হযরত মারইয়াম আলাইহিস সালাম সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ

"এবং তাকে (মারইয়ামকে) ও তার পুত্রকে (ইসা মাসিহকে) করেছিলাম বিশ্ববাসীর জন্য এক নিদর্শন (মুজিযা)।" [সুরা আম্বিয়া : আয়াত ৯১]

হযরত মুসা আলাইহিস সালাম-এর ঘটনায় আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ

"আমি মুসাকে নয়টি স্পষ্ট নিদর্শন (মুজিযা) দিয়েছিলাম।" [সুরা বনি ইসরাইল : আয়াত ১০১]

আর হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-কে যেসব মুজিযা দেয়া হয়েছে তার সম্পর্কে বলা হয়েছে—

وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ

"আমি মারইয়াম-তনয় ইসাকে দিয়েছিলাম নিদর্শনসমূহ (মুজিযাসমূহ)।" [সুরা বাকারা : আয়াত ৮৮]

إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ

"(স্মরণ করো, হে ইসা,) তুমি যখন তাদের কাছে স্পষ্ট নিদর্শন এনেছিলে তখন তাদের মধ্যে যারা কুফরি করেছিলো তারা বলছিলো, 'এটা তো স্পষ্ট জাদু।'" [সুরা মায়িদা : আয়াত ১১০]

আমরা এখানে 'অধিকাংশ' ও 'বেশির ভাগ' শব্দগুলো ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যবহার করেছি। কারণ কুরআনুল কারিমের বর্ণনাশৈলী সম্পর্কে যাঁরা সচেতন তাঁরা এ-ব্যাপারে অজ্ঞ নন যে, কুরআনুল কারিম এই শব্দগুলোকে ব্যাপকার্থে ব্যবহার করেছে। অর্থাৎ, 'মুজিযা' নিজেই এক বিশেষ প্রকারের 'প্রমাণ', আর কুরআন ও কুরআনের আয়াতসমূহ সম্পূর্ণরূপে যেমন প্রমাণ তেমনি মুজিযাও, এ-কারণে 'মুজিযা'কে বুরহান বা প্রমাণ বলা এবং আল্লাহর কিতাবের বাক্যগুলোকে আয়াত (প্রমাণ) বা

আয়াতুল্লাহ (আল্লাহর প্রমাণ) বলা রূপকার্থক নয়; বরং এটাই প্রকৃত অর্থ। যেমন, হযরত মুসা আলাইহিস সালাম-এর দুটি মুজিযা লাঠি ও শুভ্রোজ্জ্বল হাত সম্পর্কে সুরা কাসাসে বলা হয়েছে—

فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ

"এই দুটি তোমার প্রতিপালকের প্রদত্ত প্রমাণ, ফেরআউন ও তার পারিষদবর্গের জন্য (তাদের মোকাবিলায়)।" [সুরা কাসাস : আয়াত ৩২]

আর আল্লাহর কিতাব ও তার বাক্যগুলোর জন্য آيات শব্দের ব্যবহার থেকে কুরআনুল কারিমের কোনো দীর্ঘ সুরাকেও হয়তো খালি পাওয়া যাবে না। পুরো কুরআনুল কারিমে জায়গায় জায়গায় 'আয়াত' শব্দটির ব্যবহার এত বেশি করা হয়েছে যে, তার তালিকা প্রস্তুত করাই একটি স্বতন্ত্র বিষয়বস্তু হতে পারে।

একইভাবে آيات بينات শব্দের ব্যবহার বহুল পরিমাণে করা হয়েছে আল্লাহর কিতাবসমূহ—কুরআন, তাওরাত, যাবুর ও ইঞ্জিলের জন্য; কিন্তু উল্লিখিত স্থানগুলোর মতো কোনো কোনো স্থানে শব্দটিকে মুজিযার অর্থেও ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রণিধানযোগ্য বিষয় এবং মুজিযাসমূহের স্বরূপ

নবী ও রাসুলগণকে প্রেরণের উদ্দেশ্য হলো বিশ্বের মানবজাতির হেদায়েত ও সত্যপথে পরিচালিত করা এবং দীন ও দুনিয়ার কল্যাণের পথ প্রদর্শন। নবী ও রাসুলগণ আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ওহির আলোকে এই কর্তব্য পালন করতেন এবং ইলম, দলিল সত্যের প্রমাণ দ্বারা সত্যতা ও সততার পথ দেখাতেন। তাঁরা এমন দাবি করতেন না যে, স্বভাবগত ও স্বভাববহির্ভূত সব বিষয়েই হস্তক্ষেপ করা ও পরিবর্তন সাধন করাও তাদের কর্তব্যের অন্তর্গত। বরং তাঁরা বার বার এই ঘোষণা করতেন যে, আমি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী এবং আল্লাহর প্রতি আহ্বানকারী হয়ে এসেছি। আমি মানুষ এবং আমি আল্লাহ তাআলার দূত। এর চেয়ে বেশি আর কিছুই নই। সুতরাং, তাঁর দাবির সত্যতার পরীক্ষা ও যাচাইয়ের জন্য তাঁর শিক্ষাদান, তাঁর তারবিয়ত ও তাঁর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা অবশ্যই যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু তাঁর থেকে স্বভাববিরুদ্ধ ও অলৌকিক বিস্ময়কর ও

অভিনব বিষয়াবলির দাবি করা অযৌক্তিক ও অসঙ্গত বলে মনে হয়। ব্যাপারটা এভাবে বুঝা যায় যে, কোনো একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক চিকিৎসাশাস্ত্রে তাঁর দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার দাবি করলেন। এর প্রেক্ষিতে তাঁর কাছে দাবি করা হলো যে, আপনি একটি ঐন্দ্রজালিক শব্দসম্পন্ন উৎকৃষ্ট আলমারি অথবা কাঠ দিয়ে একটি অভিনব পুতুল বানিয়ে দেখান। তো, চিকিৎসক তো এমন দাবি করেন নি যে, তিনি একজন অভিজ্ঞ কর্মকার বা কাঠমিস্ত্রি; বরং তাঁর দাবি হলো শারীরিক ব্যাধিসমূহের চিকিৎসায় তাঁর দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা। একইভাবে আল্লাহ তাআলার নবী ও রাসুল তো এমন দাবি করেন না যে, তিনিও আল্লাহ তাআলার মতো বিশ্বজগতের ওপর সবধরনের হস্তক্ষেপ ও পরিবর্তন সাধনের অধিকারী ও তা করতে সক্ষম; বরং তাঁর দাবি শুধু এতটুকু যে, তিনি সবধরনের আত্মিক ব্যাধির জন্য দক্ষ, অভিজ্ঞ ও পরিপূর্ণ চিকিৎসক।

সুতরাং, নবুওতের দাবি এবং মুজিযা (অর্থাৎ স্বভাববিরুদ্ধ ও অলৌকিক কর্মকাণ্ড)-এর মধ্যে কী সম্পর্ক? এবং এ-কথা বলা কি ঠিক নয় যে, মুজিযা নবুওতের জন্য অত্যাবশ্যক বিষয়সমূহের অন্তর্গত নয়?

নিঃসন্দেহে এই প্রশ্ন অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য। এ-কারণেই ইলমুল কালাম বা ধর্মতত্ত্বে এ-বিষয়টির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কিন্তু আমি 'আয়াতে বায়্যিনাত' শিরোনামের আলোচনায় শুরুর দিকে মানুষের স্বভাব ও প্রাকৃতির ঝোঁকের প্রেক্ষিতে নবুওতের দাবির সত্যতা-সম্পর্কিত প্রমাণাদির যে-প্রকারভেদ উল্লেখ করেছি তা একটি অনস্বীকার্য সত্য এবং মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির বিভিন্ন স্তর নিঃসন্দেহে মানুষের চিন্তশক্তিকে দুটি ভিন্ন ভিন্ন পন্থার দিকে আকৃষ্ট করেছে। এই অবস্থায় যখন একজন নবী বা রাসুল এই দাবি করেন যে, তিনি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এমন একটি পদের জন্য নিযুক্ত যা রিয়াযাত (সাধনা), পরিশ্রম ও নেক আমলের দ্বারা অর্জন করা যায় না; বরং শুধু আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ ও দানের দ্বারা অর্জিত হয়ে থাকে এবং তা হলো 'নবুওত ও রিসালাতের পদ' এবং তার উদ্দেশ্য হলো মানবজগতের সত্যপথপ্রাপ্তি ও হেদায়েত এবং সত্য ও সততার শিক্ষা—তখন কোনো কোনো মানুষের মন ও মস্তিষ্ক এবং চিন্তা ও বিবেক এইদিকে ঝুঁকে পড়ে যে, যদি নবুওতের দাবিকারীর (নবী ও রাসুলের) এই দাবি সত্য হয়ে থাকে, তবে তার অর্থ এই যে, মহান আল্লাহর সঙ্গে তিনি বিশেষ পর্যায়ের নৈকট্য লাভ

করেছেন, যা অন্যান্য মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং, যখন আমরা দেখতে পাই যে, নবীর সংশোধনের আহ্বান ও তাঁর শিক্ষা আমাদের পুরনো সংস্কার ও প্রথা অথবা আমাদের ধর্ম ও মর্তাদর্শের ওইসব বিশ্বাস ও কর্মকাণ্ডের বিরোধী যেগুলোকে আমরা দীর্ঘদিন থেকে সত্য মনে করে আসছি, তখন এই বিশ্বাসবিরুদ্ধ ও বিপরীতমুখী শিক্ষার সত্যতা ও অসত্যতা যাচাই করার জন্য এটাও একটি উপায় যে, সংশোধনের আহ্বানকারী ব্যক্তি কোনো অলৌকিক বা অস্বাভাবিক কাজ করে দেখাক। তখন আমাদের জন্য এটা বুঝে নেয়া খুবই সহজ হবে যে, কার্যকারণ ও উপায় ব্যতীত এই ব্যক্তির হাতে এমন কাজ সম্পন্ন হওয়া নিশ্চিতভাবে এ-কথার স্পষ্ট প্রমাণ যে, মহান আল্লাহর সঙ্গে এই ব্যক্তি বিশেষ সান্নিধ্য অর্জন করেছেন। সুতরাং, সত্য খোদা এই নিদর্শন (মুজিযা) দেখিয়ে তাঁর সত্যতাকে দৃঢ়রূপে প্রমাণ করে দিয়েছেন। তা ছাড়া, শক্তিমান ও ক্ষমতাশালী মানুষ, যাদের চিন্তাশক্তি এমন ছাঁচে ঢালাই হয়ে গেছে যে, তাদের ওপর কোনো সত্য বিষয় ততক্ষণ পর্যন্ত প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয় না যতক্ষণ না কোনো অদৃশ্য শক্তি তাদের অহমিকাসুলভ শক্তিকে ঠুকরে ঠুকরে জাগরিত না করে। তার এর অপেক্ষায় থাকে যে, নবুওত ও রিসালাতের দাবিদার ব্যক্তি তার সত্যতাকে দলিল ও প্রমাণের সঙ্গে সঙ্গে এমন কোনো অলৌকিক কর্ম দ্বারা অনস্বীকার্য বানিয়ে দিক, যে-কর্ম অন্যকোনো মানুষ দ্বারা হয়তো সম্ভবই নয় অথবা কার্যকারণ ও উপকরণের ব্যবহার ব্যতীত অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না। যাতে বিশ্বাস করা যায় যে, নিঃসন্দেহে এই ব্যক্তির শিক্ষা এবং দাওয়াত ও তাবলিগ মহান আল্লাহর সাহায্যেই হচ্ছে। এ-কারণেই ইলমুল কালামের আলেমগণ (ধর্মতত্ত্বজ্ঞানী) নবুওতের দাবি ও মুজিযার মধ্যে যে-সম্পর্ক তার আলোচনা করে একটি উপমা বর্ণনা করেছেন : এক ব্যক্তি যখন এমন দাবি করে যে, যুগের বাদশাহ তাকে তাঁর প্রতিনিধি নিযুক্ত করে পাঠিয়েছেন। তখন সেই দেশের অধিবাসীরা দাবি করে যে, প্রতিনিধিত্বের দাবিদার ব্যক্তি তার দাবির সত্যতা প্রমাণের জন্য সনদ ও নিদর্শন পেশ করুক। তখন প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তি একদিকে যদি সনদ প্রদর্শন করে, তবে অন্যদিকে এমন নিদর্শন প্রদর্শন করে যার সম্পর্কে বিশ্বাস করা যেতে পারে যে, বাদশাহর প্রদত্ত এই নিদর্শন তাঁর দান এবং এই পদের সত্যায়ন ছাড়া কোনোভাবেই লাভ

করা যেতে পারে না। যেমন, বাদশাহর হুকুমের মোহরাঙ্কিত আংটি বা বিশেষ দান, যা শুধু এই পদে নিযুক্ত ব্যক্তিকেই প্রদান করা হয়ে থাকে। বাহ্যিকভাবে প্রতিনিধিত্বের দাবি এবং আংটি বা বিশেষ দানের মধ্যে কোনো সামঞ্জস্য নেই; কিন্তু তারপরও এর দ্বারা প্রতিনিধিত্বের দাবির সত্যায়ন হচ্ছে। সুতরাং তা (সত্যায়ন) প্রতিনিধিত্বের দাবি এবং আংটি বা দানের মধ্যে বিশেষ সম্পর্ক তৈরি করে দিয়েছে।

কিন্তু সত্যায়নের এই পন্থা সত্যতা ও সততা মানদণ্ড হওয়ার ব্যাপারে দ্বিতীয় স্তরের মর্যাদার অধিকারী এবং প্রকৃতপক্ষে মানদণ্ডের মর্যাদা শুধু প্রথম প্রকারের প্রমাণ—'হুজ্জাত ও বুরহানে হক'-এরই রয়েছে। এ-কারণে মুজিযা সংঘটিত হওয়া ও প্রকাশ পাওয়ার বিষয়টি প্রথম পন্থাটির ঘটা ও প্রকাশ পাওয়া থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কারণ, নবুওত ও রিসালাতের প্রত্যেক দাবিদারের জন্য একান্ত আবশ্যক হলো তাঁর দাবিকে দলিল-প্রমাণের আলোকে এবং ইলম ও বিশ্বাসের শক্তিতে প্রমাণ করা এবং তাঁর শিক্ষা ও তরবিয়ত এবং ব্যক্তিগত জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে দাবি ও দলিল-প্রমাণের সামঞ্জস্যকে সুস্পষ্ট করা। তিনি মানবমস্তিষ্কের বুদ্ধি-বিবেচনাকে পরিচালনার দায়িত্ব এমনভাবে আঞ্জাম দেন যে, সবধরনের ধারণা ও কল্পনা এবং ভ্রান্ত ও নষ্ট চিন্তার মোকাবিলায় দৃঢ় বিশ্বাস দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাঁর এই কর্তব্য পালনের জন্য কোনো পক্ষ থেকে তলব বা তাকাদার শর্ত নেই এবং তদন্ত বা অনুসন্ধানও জরুরি নয়। আল্লাহ তাআলা নবী ও রাসুলকে যে-কাজের জন্য মনোনীত ও আদিষ্ট করেছেন তা তাঁর জন্য সরাসরি কর্তব্য; যদি তিনি এই কর্তব্যে মুহূর্তের জন্যও ত্রুটি করেন তবে যেনো তিনি গোটা কর্তব্যের গোটা ইবারতটিকে নিজের হাতে ধসিয়ে দিলেন। এই মর্মে কুরআনুল কারিমে বলা হয়েছে—

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ

"হে রাসুল, তোমার প্রতিপালকের কাছ থেকে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা প্রচার করো, যদি না করো তবে তো তুমি তাঁর বার্তা প্রচার করলে না।"[৬৪] [সুরা মায়িদা : আয়াত ৬৭]

[৬৪] কারো কাছে অপ্রীতিকর হলেও তা প্রচারে তিনি আদিষ্ট হয়েছেন।

পক্ষান্তরে মুজিযার জন্য এটা জরুরি নয় যে, অবশ্যই তিনি মুজিযা বা অলৌকিক নিদর্শন দেখাবেন অথবা বিরোধীদের দাবি অনুযায়ী তৎক্ষণাৎ তা কাজে পরিণত করবেন। বরং মুজিযা দলিল ও প্রমাণের ওই প্রকার যা অধিকাংশ সময় ঘটে থাকে বিরোধীদের দাবির প্রেক্ষিতে এবং নবীর মাধ্যমে সেই মুজিযা সংঘটিত হওয়া শুধু 'আলিমুল গায়ব' (আল্লাহ তাআলা)-এর প্রজ্ঞা ও কল্যাণকামিতার ওপর নির্ভর করে। আর তিনি খুব ভালোভাবেই জানেন যে, মুজিযা সম্পর্কে কার দাবি সত্যের অন্বেষণের প্রেক্ষিতে হয়েছে এবং কার দাবি অবাধ্যতা ও আরো অধিক অবিশ্বাসের কারণে হয়েছে। পুণ্যাত্মাদের ক্ষেত্রে এই প্রতিক্রিয়া হবে যে, তাঁরা মুজিযা দেখেই বলে উঠবেন—

آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى

"আমরা হারুন ও মুসার প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনলাম।"[৬৫]

আর খারাপ ও দুষ্ট লোকেরা প্রভাবিত হয় এমনভাবে যে, তারা বলে ওঠে—

إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ

'এটা তো স্পষ্ট জাদু।'[৬৬]

কুরআনুল কারিম একদিকে অকাট্য দলিল দ্বারা ব্যক্ত করেছে যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর নবী ও রাসুলগণকে দলিল ও প্রমাণের সঙ্গে আরো শক্তিশালী ও দৃঢ় করার জন্য মুজিযাসমূহ দান করেছেন আর অপরদিকে আর অন্যদিকে এটাও স্পষ্টভাবে নবীদের মুখে বলিয়ে দিয়েছেন যে, (নবী ও রাসুলগণ বলেছেন,) 'আমি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে 'প্রকাশ্য ভীতিপ্রদর্শনকারী', 'সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী' এবং 'নবী ও রাসুল'। আমি কখনো এমন দাবি করি নি যে, আমি আল্লাহর সৃষ্টিজগতে হস্তক্ষেপ ও পরিবর্তন-পরিবর্ধন ঘটাতে এবং অলৌকিক ক্রিয়াকর্ম করতে সক্ষম। হ্যাঁ, মহান আল্লাহ ইচ্ছা করলে এমন কাজ করতে পারেন এবং

---

[৬৫] সুরা তোয়া-হা : আয়াত ৭০।

[৬৬] সুরা মায়িদা : আয়াত ১১০।

এরূপ করেছেনও। কিন্তু তিনি তা তখনই করে থাকেন যখন তাঁর প্রজ্ঞা ও কল্যাণকামিতা তা দাবি করে।

এই প্রেক্ষিতে তিনি হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম ও সুলাইমান আলাইহিস সালাম-কে জীবজন্তুর কথা বোঝার এবং বাতাস, পাখি ও জিনজাতিকে বশীভূত করার মুজিযা দান করেছিলেন। মুসা আলাইহিস সালাম-কে নয়টি প্রকাশ্য মুজিযা দান করেছিলেন। নয়টির মধ্যে 'লাঠি' ও 'শুভ্রোজ্জ্বল হাত'—এই দুটি মুজিযাকে কুরআনুল কারিম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলেছে। আর লোহিত সাগরে ফেরআউনের নিমজ্জিত হওয়া এবং মুসা আলাইহিস সালাম-এর সম্প্রদায়ের মুক্তির বিস্ময়কর ও অভিনব ঘটনার একটি স্বতন্ত্র 'মহানিদর্শন'। আল্লাহ তাআলা হযরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম-এর ওপর দাউ দাউ করে জ্বলা আগুন শীতল ও নিরাপদ করে দিয়েছিলেন। হযরত সালেহ আলাইহিস সালাম-এর সম্প্রদায়ের জন্য 'সালেহের উটনী'কে নিদর্শন বানিয়ে দিয়েছিলেন : যখনই উটনীটিকে কেউ কষ্ট দেবে তখনই আল্লাহর আযাব এসে এই সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দেবে। অবশেষে তা-ই ঘটেছিলো। হযরত হুদ আলাইহিস সালাম-এর সম্প্রদায় ও নুহ আলাইহিস সালাম-এর সম্প্রদায় তাঁদের কাছে আল্লাহর তাআলার আযাব দাবি করেছিলো এবং যথেষ্ট বুঝানোর পরও তাদের বাড়াবাড়িতেই গোঁ ধরে ছিলো। তখন হযরত হুদ আলাইহিস সালাম ও হযরত নুহ আলাইহিস সালাম তাদেরকে আল্লাহর যে-আযাবের ভীতি প্রদর্শন করেছিলেন, তা যথার্থ সময়ে তাদের ওপর সংঘটিত হয়েছিলো। অথচ এসব ক্ষেত্রে বাহ্যিকভাবে আযাব নাযিল হওয়ার কার্যকারণ এবং বিপর্যয় ও ধ্বংসের কোনো উপকরণ ছিলো না।

আর হযরত ইসা আলাইহিস সালামকে যে-বিভিন্ন প্রকারের মুজিযা প্রদান করা হয়েছিলো তা-ও কুরআনুল কারিম স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করে দিয়েছে। এ নিয়ে একটু পরে আমরা আলোচনা করবো।

আর সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 'ইলমি মুজিযা' কুরআনুল কারিম দান করেছেন, যার সঙ্গে মোকাবিলা বা চ্যালেঞ্জ করতে কেউই সক্ষম হয় নি। তা ছাড়া বদরের যুদ্ধে ফেরেশতাবাহিনীর অবতীর্ণ হওয়া এবং তাদের মাধ্যমে মুসলমানদের

শক্তিবর্ধন ও সহায়তাও ছিলো মুজিযা। এবং وما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللهَ رَمَى
[৬৭]-এর ঘোষণা যে-বিখ্যাত মুজিযার কথা প্রকাশ করেছে তা এই যে, বদরের ময়দানে এক মুষ্টি কঙ্কর এক হাজার কাফের সৈন্যের চক্ষুকে অকর্মণ্য করে দিয়েছিলো। আর আল্লাহ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 'চন্দ্র দিখণ্ডিত করা'র মুজিযাও দান করেছিলেন।

আলোচ্য বিষয়টির এটি একটি দিক আর অন্য একটি দিক এই যে, যখন খাতিমুল আম্বিয়া মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সত্যের দাওয়াত, হেদায়েত ও তাবলিগের উজ্জ্বল দলিল ও প্রমাণসমূহের জবাব দিতে কাফেররা সক্ষম হলো না, তখন বিদ্রোহ ও বিরোধিতার উদ্দেশ্যে তাঁর কাছে অলৌকিক ও বিস্ময়কর কার্যাবলি দাবি করতে লাগলো। তখন আল্লাহ তাআলা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানালেন যে, তাদের উদ্দেশ্য সত্য ও সততার অন্বেষণ নয়; বরং তারা যা বলছে তা অবাধ্যতা, শত্রুতা ও বিদ্বেষের কারণেই বলছে। সুতরাং তাদের বিরুদ্ধে জবাব এটা নয় যে, আল্লাহ তাআলার নিদর্শনসমূহকে 'ভানুমতির তামাশা' বা 'মাদারির ক্রীড়া' বানিয়ে দেয়া হয়। বরং প্রকৃত জবাব এই যে, আপনি তাদেরকে বলে দিন, আমি এরূপ ক্ষমতার অধিকারী বলে দাবি করছি না। আমি তো ভালোকাজ ও মন্দকাজের মধ্যে পার্থক্য বুঝিয়ে দেয়ার জন্য, আল্লাহর বান্দাদেরকে আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্কিত করার জন্য এবং ভালোকাজ ও মন্দকাজের পরিণতি ও পরিণাম স্পষ্টরূপে বলে দেয়ার জন্য 'প্রকাশ্য সতর্ককারী' এবং 'নবী ও রাসুল'।

এ-বিষয়টিকে কুরআনুল কারিম ব্যক্ত করেছে এভাবে—

وقالوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا () أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نخيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا () أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا () أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ أَوْ

[৬৭] '(হে মুহাম্মদ,) তুমি নিক্ষেপ করো নি যখন তুমি নিক্ষেপ করেছো (সেই এক মুষ্টি ধূলি); বরং আল্লাহ নিক্ষেপ করেছেন।' [সুরা আনফাল : আয়াত ১৭]

تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا () وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا (سورة الإسراء)

“এবং তারা (মুশরিকরা) বলে, ‘আমরা কখনোই তোমাতে ঈমান আনবো না, যতক্ষণ না তুমি আমাদের জন্য ভূমি থেকে এক প্রস্রবণ উৎসারিত করবে, অথবা তোমার খেজুরের ও আঙ্গুরের এক বাগান হবে যার ফাঁকে ফাঁকে তুমি অজস্র ধারায় প্রবাহিত করে দেবে নদী-নালা। অথবা তুমি যেমন বলে থাকো, তদনুযায়ী আকাশকে খণ্ডবিখণ্ড করে আমাদের ওপর ফেলবে, অথবা আল্লাহ ও ফেরেশতাগণকে আমাদের সামনে উপস্থিত করবে। অথবা তোমার একটি স্বর্ণনির্মিত গৃহ হবে, অথবা তুমি আকাশে আরোহণ করবে, কিন্তু তোমার আকাশ-আরোহণে আমরা কখনো ঈমান আনবো না, যতক্ষণ না তুমি আমাদের প্রতি এক কিতাব অবতীর্ণ করবে, যা আমরা পাঠ করবো।’ (হে মুহাম্মদ,) বলো, ‘পবিত্র মহান আমার প্রতিপালক! আমি তো হচ্ছি কেবল একজন মানুষ, একজন রাসুল।’ যখন তাদের কাছে আসে পথনির্দেশ তখন লোকদেরকে ঈমান আনা থেকে বিরত রাখে তাদের এই উক্তি, ‘আল্লাহ কি মানুষকে রাসুল করে পাঠিয়েছেন?’” [সুরা আল-ইসরা : আয়াত ৯০-৯৪]

এ-ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা আরো বলেছেন—

وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ () لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ (سورة الحجر)

“যদি তাদের জন্য আকাশের দরজা খুলে দিই এবং তারা সারাদিন তাতে আরোহণ করতে থাকে, তবুও তারা বলবে, ‘আমাদের দৃষ্টি সম্মোহিত করা হয়েছে; না, বরং আমরা এক যাদুগ্রস্ত সম্প্রদায়।” [সুরা হিজর : আয়াত ১৪-১৫]

আল্লাহ তাআলা অন্য সুরায় বলেছেন—

وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا

“তারা আমার প্রত্যেকটি নিদর্শন দেখলেও বিশ্বাস করবে না।”[৬৮]

---

[৬৮] সুরা আন'আম : আয়াত ২৫।

উল্লিখিত বিবরণ থেকে এটাও স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, ইলমুল কালামের আলেমগণের (ধর্মতত্ত্বজ্ঞানী) মধ্যে যাঁদের এই মত প্রকাশ করা হয়েছে যে, 'মুজিযা নবুওতের প্রমাণ নয়' তাঁদের কী উদ্দেশ্য। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা নবুওতের দাবির সত্যতা-সম্পর্কিত উল্লিখিত দুই প্রকার দলিলের মধ্যে পার্থক্য প্রকাশ করতে চাচ্ছেন এবং বলতে চাচ্ছেন যে, যে-সত্তা নবুওত ও রিসালাতের দাবি করছেন তাঁদের জন্য আবশ্যক কর্তব্য হলো, তাঁদের দাবির সত্যায়নের জন্য দলিল-প্রমাণ পেশ করা এবং প্রমাণাদির আলোকে তাঁদের সত্যতাকে দৃঢ় করা; আর আল্লাহ তাআলার ওহির যে-শিক্ষা তিনি বিশ্বলোকের হেদায়েতের জন্য পেশ করছেন, তার স্বরূপকে দলিল-প্রমাণের আলোকে স্পষ্ট করা। সুতরাং, এইভাবে নবুওত ও রিসালাত এবং দলিল ও প্রমাণ সত্যতার ক্ষেত্রে একে অন্যের জন্য আবশ্যক। পক্ষান্তরে নবুওত ও রিসালাতের সঙ্গে মুজিযা ও আল্লাহ তাআলার নিদর্শনাবলির সম্পর্ক এমন নয়; বরং তার বিষয়টা এমন যে, যদি বিরোধীদের দাবির প্রেক্ষিতে বা আল্লাহ তাআলার প্রজ্ঞা ও কল্যাণকামিতার চাহিদা অনুযায়ী নবী ও রাসুলগণ নিজ থেকেই তাঁদের সত্যতার সমর্থনে কোনো মুজিযা প্রকাশ করেন, তবে নিঃসন্দেহে তা ওই ব্যক্তির নবী ও রাসুল হওয়ার অনস্বীকার্য প্রমাণ। এই প্রমাণ বা নিদর্শনকে অস্বীকার করা প্রকৃতপক্ষে সেই নবী বা রাসুলের সত্যতাকে অস্বীকার করার নামান্তর। কেননা, এমতাবস্থায় এই অস্বীকার মূলত বাস্তবতা ও ঘটনার অস্বীকার। আর বাস্তবকে অস্বীকার করা সত্য নয়, বরং বাতিল। যা নবুওত ও রিসালাতের উদ্দেশ্যের সঙ্গে কিছুতেই একত্র হতে পারে না। অবশ্য আল্লাহ তাআলার হেকমতের চাহিদা যদি এই হয় যে, সত্যের শিক্ষার আলো, আল্লাহর ওহির পক্ষে দলিল ও প্রমাণে বিশ্বাস এবং ধর্মের মূলনীতিসমূহের পক্ষে দলিল ও প্রমাণ উপস্থিত রেখে বিরোধীদের পৌনঃপুনিক মুজিযা ও অলৌকিক কার্যাবলির দাবির পরোয়া না করা হয় এবং নবী ও রাসুলগণ আল্লাহ তাআলার ওহির আলোকে দলিল ও প্রমাণের মাধ্যমে সত্যের শিক্ষা চালু রাখেন এবং বিরোধীদের দাবির জবাবে স্পষ্ট বলে দেন, 'আমি অলৌকিক ও প্রকৃতিবিরুদ্ধ কর্মকাণ্ডে সক্ষম বলে কখনো দাবি করি নি, তবে এমতাবস্থায় বান্দাদের ওপর আল্লাহ তাআলার প্রমাণ পূর্ণ হয়ে যায়। তখন কোনো উম্মত বা কওমের এই অজুহাত পেশ করার অধিকার থাকে না যে, তারা সত্যের

শিক্ষার দলিল-প্রমাণসমূহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং তা অস্বীকার করেছে এ-কারণে যে, কেনো তাদের দাবি অনুযায়ী বিস্ময়কর ও অস্বাভাবিক কর্ম সংঘটিত করা হলো না।

কুরআনুল কারিম প্রাচীন জাতি ও সম্প্রদায়ের ইতিহাস-স্মরণে নবী ও রাসুলের ঘটনাবলি ও অবস্থাসমূহ বর্ণনা করে অকাট্য দলিল দ্বারা স্পষ্টভাবে ও পরিষ্কাররূপে প্রমাণ করেছে যে, 'আমি তাঁদের সত্যতার নিদর্শনস্বরূপ তাঁদের মুজিযাসমূহ দান করেছি এবং বিরোধীদের সামনে তা প্রকাশ করেছি।' সুতরাং, আমাদের কর্তব্য এই যে, বিনাদ্বিধায় আমরা তাদেরকে গ্রহণ করবো, তাঁদের সত্যতার প্রতিপাদন করবো এবং অলৌকিকতা-পূজার দোষারোপকে ভয় করে এ-ব্যাপারে আলিমুল গায়ব (আল্লাহ তাআলা)-এর সত্যতা প্রতিপাদনে বিরত থাকবো না; বাতিল ও অপব্যাখ্যা দ্বারা আড়াল সৃষ্টি করে তাঁদেরকে অস্বীকার করার জন্য উদ্যত হবো না। কারণ, এমন কাজ করলে আমরা নিচের আয়াতটির উদ্দেশ্যে পরিণত হবো—

وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا

"এবং তারা বলে, 'আমরা কতককে বিশ্বাস করি এবং কতককে অবিশ্বাস করি, আর তারা মধ্যবর্তী কোনো পথ অবলম্বন করতে চায়।" [সুরা নিসা : আয়াত ১৫০]

জানা কথা যে, এই পথ ও পন্থা মুমিন ও মুসলমানের পথ ও পন্থা নয়। বরং কাফের ও মুশরিকদের পথ। মুমিন ও মুসলমানদের পথ তো সরল ও সত্য পথ এবং তা এই—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (سورة البقرة)

"হে মুমিনগণ, তোমরা সর্বাত্মকভাবে ইসলামে প্রবেশ করো (আকিদা ও আমলের সমস্ত বিষয়ে মুসলমান হয়ে যাও; মুসলিম হওয়ার জন্য কেবল এতটুকু যথেষ্ট নয় যে, কেবল মুখে নিজেকে মুসলিম বলে স্বীকার করো) এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।" [সুরা বাকারা : আয়াত ২০৮]

মোটকথা, আল্লাহ তাআলার এই নীতি প্রচলিত আছে যে, যখন কোনো কওমের হেদায়েতের জন্য বা সমগ্র বিশ্বের মানবজাতির কল্যাণের জন্য

নবী ও রাসুল প্রেরিত হন, তখন তাঁকে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে শক্তিশালী দলিল-প্রমাণ ও মুজিযা—উভয়টি প্রদান করা হয়। তিনি একদিকে আল্লাহ তাআলার ওহি দ্বারা মানবজাতির পার্থিব জীবন ও পরকালীন জীবন-সম্পর্কিত আদেশসমূহ ও নিষেধসমূহ এবং উৎকৃষ্ট ও কল্যাণকর বিধান পেশ করে থাকেন আর অপরদিকে আল্লাহ তাআলার কল্যাণকামিতা ও প্রজ্ঞার ভিত্তিতে 'আল্লাহ-প্রদত্ত নিশর্দনাবলি' প্রকাশ করে থাকেন। এভাবে তিনি নিজের সত্যতা এবং তিনি যে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত তার প্রমাণ দিয়ে থাকেন। তা ছাড়া প্রত্যেক নবীকে ওই প্রকারেরই মুজিযা ও নিদর্শন প্রদান করা হয় যা ওই যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষ এবং দেশ ও জাতির বিশেষ বৈশিষ্ট্যাবলির অবস্থানুরূপ হওয়া সত্ত্বেও বিরোধীদেরকে অক্ষম ও অপারগ করে দেয় এবং তাদের কেউই ওই নিদর্শন বা মুজিযার মোকাবিলা করতে সক্ষম হয় না। আর যদি বিদ্বেষ ও গোঁড়ামি তাদের মধ্যস্থলে প্রতিবন্ধক না হয়, তবে তাদের অর্জিত উন্নতি এবং বৈশিষ্ট্যাবলির স্বরূপ সম্পর্কে অবহিত থাকার কারণে এ-কথা স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে, যে-মুজিযা ও নিদর্শনসমূহ সামনে রয়েছে তা মানবশক্তির বহু উর্ধ্বের ও মানুষের ক্ষমতার বাইরের বিষয় এবং আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকেই তা হয়েছে।

যেমন, হযরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম-এর যুগে ইলমুন নুজুম (জ্যোতির্বিদ্যা) এবং ইলমুল কিমিয়া (রসায়নশাস্ত্র)-এর বেশ শক্তি ছিলো। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সম্প্রদায় নক্ষত্ররাজির প্রভাবকে তাদের সত্তগত প্রভাব মনে করতো এবং নক্ষত্রদেরকে প্রকৃত প্রভাবক বলে বিশ্বাস করতো। এর ফলে তারা এক আল্লাহর পরিবর্তে নক্ষত্ররাজির পূজা করতো এবং তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা ছিলো সূর্য। কেননা, সূর্যে আলো ও উত্তাপ দুটিই বিদ্যমান। তাদের দৃষ্টিতে আলো ও উত্তাপই বিশ্বজগতের স্থায়িত্ব ও কল্যাণের সর্বমূল ছিলো। এ-কারণেই তারা পৃথিবীর বুকে আগুনকে তার বিকাশস্থল মেনে তারও পূজা করতো। তা ছাড়া তাদের বস্তুরাশির বৈশিষ্ট্য, ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান ছিলো। বর্তমান যুগের গবেষণার প্রেক্ষিতে তারা রসায়নশাস্ত্রের পন্থা ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিশেষভাবে অবগত ছিলো।

এইজন্য আল্লাহ তাআলা ইবরাহিম আলাইহিস সালাম-কে তাঁর সম্প্রদায়ের পথপ্রদর্শন এবং আল্লাহর ইবাদতের শিক্ষা ও দীক্ষার জন্য

একদিকে উজ্জ্বল দলিল ও প্রমাণ প্রদান করলেন, যার দ্বারা তিনি সম্প্রদায়ের ভ্রান্ত বিশ্বাসগুলোকে মিথ্যা সাব্যস্ত করা আর সত্যকে সত্য বলে প্রতিপন্ন করার কর্তব্য পালন করলেন এবং জড়বস্তুর পূজার কারণে সত্যের চেহারায় অন্ধকারের যে-পর্দা পড়েছিলো তাকে ছিন্নভিন্ন করে করে সত্যের চেহারাকে উন্মুক্ত করে দিতে সক্ষম হলেন। যেমন পবিত্র কুরআন বলছে—

وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (سورة الأنعام)

আর ইহা আমার যুক্তি-প্রমাণ যা ইবরাহিমকে দিয়েছিলাম তার সম্প্রদায়ের মোকাবিলায়; যাকে ইচ্ছা মর্যাদায় আমি উন্নীত করি। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক প্রজ্ঞাময়; সর্বজ্ঞ।' [সুরা আন'আম : আয়াত ৮৩]

আর অপরদিকে, যখন নক্ষত্রপূজারী ও মূর্তিপূজারী বাদশাহ থেকে শুরু করে সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষও তাঁর দলিল-প্রমাণে নিরুত্তর হয়ে তাদের বস্তুবাদী শক্তির মদে মত্ত হয়ে তাঁকে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করলো, তখন ইবরাহিম আলাইহিস সালাম যে-মহান আল্লাহর দীনের দাওয়াত ও সরল পথ দেখানোর দায়িত্ব পালন করছিলেন তিনি يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ "হে আগুন, তুমি ইবরাহিমের জন্য শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও"[৬৯] বলে তাঁর কুদরতের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন (মুজিযা) দান করলেন, যা বাতিলের/মিথ্যার ভয়ঙ্কর প্রাসাদে কম্পন সৃষ্টি করে দিলো। আর গোটা সম্প্রদায় আল্লাহর মুজিযার মোকাবিলায় অক্ষম, অস্থির, উদ্বিগ্ন, অপদস্থ ও ক্ষতিগ্রস্থ হয়েই থাকলো। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ (سورة الأنبياء)

"ওরা তার ক্ষতি সাধনের ইচ্ছা (চক্রান্ত) করেছিলো। কিন্তু আমি ওদেরকে করে দিলাম সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত।" (তারা সফলকাম হলো না।) [সুরা আম্বিয়া : আয়াত ৭০]

---

[৬৯] সুরা আম্বিয়া : আয়াত ৬৯।

আর হযরত মুসা আলাইহিস সালাম-এর যুগে যাদুবিদ্যা মিসরীয় জ্ঞান ও শাস্ত্রের ময়দানে উচ্চ মর্যাদা ও বিশিষ্টতার অধিকারী ছিলো। মিসরীয়রা যাদুবিদ্যায় অভিজ্ঞ ছিলো। ফলে হযরত মুসা আলাইহিস সালামকে হেদায়েতের বিধান তাওরাত প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে 'শুভ্রোজ্জ্বল হাত' ও 'লাঠি'র মতো মুজিযাও প্রদান করা হয়েছিলো। মুসা আলাইহিস সালাম যখন মিসরের যাদুকরদের মোকাবিলায় মুজিযাগুলো প্রদর্শন করলেন, যাদুকরের সবাই সমস্বরে বলে উঠলো, নিঃসন্দেহে এটা যাদু নয়। এটা যাদু থেকে ভিন্ন এবং মানবক্ষমতার উর্ধ্বের প্রদর্শনী, যা আল্লাহ তাআলার সত্য নবীদের সাহায্যার্থে তাঁদের হাতে প্রকাশ করিয়েছেন। কারণ, যাদুর স্বরূপ সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণ অবগত আছি। এই বলে যাদুকরেরা ফেরআউন ও তার সম্প্রদায়ের সামনে নির্ভয়ে ঘোষণা করে দিলো, তারা আজ থেকে মুসা আলাইহিস সালাম ও হারুন আলাইহিস সালাম-এর এক খোদার পূজারী—

وأُلْقِي السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ () قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ () رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ

'এবং জাদুকরেরা সিজদায় নিক্ষিপ্ত হলো। তারা বললো, "আমরা ঈমান আনলাম জগৎসমূহের প্রতিপালকের প্রতি—যিনি মুসা ও হারুনেরও প্রতিপালক।"' [সুরা আ'রাফ : আয়াত ১২০-১২২]

আর ফেরআউনের সভাসদরা তাদের দুশ্চরিত্রতার ও দুর্ভাগ্যের কারণে মুসা আলাইহিস সালাম-কে যাদুকরই বলতে থাকলো।

قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ

"ফেরআউন তার পারিষদবর্গকে বললো, 'এ তো এক সুদক্ষ যাদুকর!'" [সুরা শুআরা : আয়াত ৩৩]

فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ

'মুসা যখন তাদের কাছে আমার স্পষ্ট নিদর্শনগুলো নিয়ে এলো, তারা বললো, "এ তো অলীক ইন্দ্রজাল মাত্র! আমাদের পূর্বপুরুষদের কালে কখনো এমন কথা শুনি নি।" মুসা বললো, "আমাদের প্রতিপালক সম্যক অবগত, কে তার তাঁর কাছ থেকে পথনির্দেশ এনেছে এবং আখেরাতে কার পরিণাম শুভ হবে। জালিমরা কখনো সফলকাম হবে না।"' [সুরা কাসাস : আয়াত ৩৬]

একইভাবে হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর যুগে চিকিৎসাশাস্ত্র ও পদার্থবিদ্যার খুব বেশি চর্চা ছিলো। গ্রিক চিকিৎসক ও দার্শনিকদের চিকিৎসাবিদ্যা ও দর্শন আশপাশের দেশ ও শহরগুলোর জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গের ওপর বেশ প্রভাব বিস্তার করেছিলো। গ্রিক অঞ্চলগুলোতে বহু শতাব্দী ধরে বড় বড় চিকিৎসক ও দার্শনিক তাঁদের দর্শন, জ্ঞান ও চিকিৎসাবিদ্যার পূর্ণতার প্রকাশ ঘটাচ্ছিলেন। কিন্তু এক আল্লাহর একত্ব ও সত্যধর্মের শিক্ষা থেকে সাধারণ ও বিশিষ্ট—সবধরনের মানুষই বঞ্চিত ছিলো। যে-বনি ইসরাইল নবীদের বংশধর হওয়ার কারণে গর্ব করে বেড়াতো তারাও গোমরাহি ও পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত ছিলো। বিগত পৃষ্ঠাগুলোতে তার ওপর আলোকপাত করা হয়েছে।

এমতাবস্থায় সুন্নাতুল্লাহ বা আল্লাহর রীতি হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-কে তাদের হেদায়েত ও সত্যপথ প্রদর্শনের জন্য মনোনীত করলো। ফলে একদিকে তাঁকে দলিল-প্রমাণ (ইঞ্জিল) ও হেকমত প্রদান করা হলো, অপরদিকে যুগের বিশেষ অবস্থাবলির প্রেক্ষিতে কতগুলো মুজিযাও দান করা হলো। মুজিযাগুলো ওইযুগের জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গ ও তাদের অনুসারীদের ওপর এমনভাবে প্রভাব বিস্তার করে যাতে সত্যান্বেষীদের মনে এ-কথা স্বীকার করে নিতে কোনো দ্বিধা না থাকে যে, নিঃসন্দেহে এসকল কাজ অর্জিত বিদ্যাসমূহ থেকে ভিন্ন এবং সেগুলো শুধু সত্য নবীর সাহায্যার্থে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে প্রকাশ পেয়েছে। আর অবাধ্যাচারী ও গোঁড়া লোকদের কাছে এটা ছাড়া আর কোনো পন্থা ছিলো না যে, তারা ওইসব মুজিযাকে প্রকাশ্য যাদু বলে তাদের হিংসা ও শত্রুতার আগুনকে আরো বেশি প্রজ্জ্বলিত করে নিয়েছিলো।

হযরত ইসা আলাইহিস সালাম তাঁর সম্প্রদায়ের সামনে যেসকল মুজিযা প্রদর্শন করেছিলেন, তার মধ্য থেকে পবিত্র কুরআন চারটি মুজিযাকে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেছে : ১. তিনি আল্লাহর অনুগ্রহে মৃতকে জীবিত করতেন; ২. জন্মান্ধ ব্যক্তিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দিতেন এবং দুরারোগ্য কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্তকে সুস্থ করে তুলতেন; ৩. তিনি মাটি দ্বারা পাখির আকৃতি বানিয়ে তাতে ফুঁ দিতেন এবং আল্লাহর আদেশে তাতে প্রাণ আসতো; ৪. তিনি এটাও বলে দিতেন যে, কে কী খেয়েছে, কী ব্যয় করেছে এবং ঘরে কী সঞ্চয় করে রেখেছে।

তখনকার সম্প্রদায়গুলোতে এমন এমন চিকিৎসক ছিলেন যাঁদের চিকিৎসায়, সেবায় ও প্রচেষ্টায় নিরাশ রোগীরাও আরোগ্য লাভ করতো। তাদের মধ্যে পদার্থবিদ্যায় দক্ষ ব্যক্তিত্বও কম ছিলেন না, যাঁরা জীব ও জড়বস্তুর স্বরূপ এবং পৃথিবী ও আকাশের বস্তুরাশির প্রকৃতি সম্পর্কে ব্যাপক অবগতি ও অভিজ্ঞতার অধিকারী ছিলেন বলে মনে হতো। বস্তুরাশির স্বরূপ ও প্রকৃতির ক্ষেত্রে সূক্ষ্মদর্শিতা ও অভিজ্ঞতা ছিলো জ্ঞানী ব্যক্তিদের শত গৌরবের বিষয়। যখন তাদের সামনে হযরত ইসা আলাইহিস সালাম কোনোও উপকরণের ব্যবহার ছাড়া ওইসব বিষয়ের প্রদর্শন করলেন, তখন তাঁদের উপরেও হেদায়েত ও গোমরাহির কুদরতি বিভাজন অনুযায়ী এই প্রভাব পড়লো যে, যাদের অন্তরে সত্যের অন্বেষণ তরঙ্গিত ছিলো তারা স্বীকার করলো যে, নিঃসন্দেহে এসব বিষয়ের প্রদর্শনী মানবক্ষমতার বহির্ভূত এবং সত্য নবীর সাহায্য ও সত্যায়নের জন্য মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়েছে। আর যাদের অন্তরে শত্রুতা ছিলো, হিংসা ও বিদ্বেষ ছিলো তাদের বাড়াবাড়ি ও গোঁড়ামি তাদেরকে ওই কথাই বলতে বাধ্য করলো যা তাদের পূর্ববর্তী লোকেরা তাদের সময়ের নবী ও রাসুলগণের সম্পর্কে বলতো—'এটা তো প্রকাশ্য যাদু ছাড়া কিছু নয়।'

চতুর্থ মুজিযা সম্পর্কে কোনো কোনো মুফাস্‌সির বলেন, তা প্রকাশ করার কারণ এই ছিলো যে, বিরোধী যখন তাঁর হেদায়েত ও সৎপথে আসার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতো এবং তাঁর প্রদর্শিত মুজিযা ও নিদর্শনসমূহকে যাদু নামে অভিহিত করতো, সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রূপাত্মকভাবে এটাও বলতো যে, তুমি যদি সত্যি সত্যিই আল্লাহর এত প্রিয় বান্দা হয়ে থাকো, তবে বলো, আজ আমরা কী খেয়েছি এবং আমাদের ঘরে কী সঞ্চয় করেছি? তখন হযরত ইসা আলাইহিস সালাম তাদের বিদ্রূপকে সঠিক অর্থে গ্রহণ করে আল্লাহর ওহির সাহায্যে তাদের জিজ্ঞাসার সঠিক জবাব দিতেন।[৭০]

কিন্তু কুরআনে হাকিম এই মুজিযাকে যে-ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছে তা গভীরভাবে অধ্যয়ন করলে বুঝা যায় যে, এ-মুজিযাটি প্রদর্শনের কারণ মুফাস্‌সিরগণের বর্ণিত কারণের চেয়ে আরো সূক্ষ্ম ও ব্যাপক। তা এই

[৭০] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮২।

যে, হযরত ইসা আলাইহিস সালাম হেদায়েত ও দাওয়াতের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে অধিকাংশ সময় ও বেশির ভাগ মানুষের ক্ষেত্রে দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়া, ধন-সম্পদের লোভ ও বিলাসময় জীবনযাপনের আগ্রহ থেকে বিরত রাখার জন্য বিভিন্ন বর্ণনাপদ্ধতি ও অভিব্যক্তির মাধ্যমে তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতেন। তখন কতিপয় পুণ্যাত্মা যেমন সত্যের সামনে সম্পূর্ণরূপে মাথা নত করতেন, তেমনি তাঁদের বিপরীতে দুষ্ট প্রকৃতির লোকেরা ইসা আলাইহিস সালাম-এর হিতোপদেশকে অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করা এবং তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া সত্ত্বেও আদেশ পালনকারী লোকদের চেয়েও অধিক তাঁকে এই বলে আশ্বাস দিতো যে, আমরা তো সবসময় আপনার উপদেশ ও হেদায়েত পালনে তৎপর রয়েছি। ফলে আল্লাহর কুদরত এই সিদ্ধান্ত নিলো যে, এই মুনাফিকদের মুনাফেকির অনিষ্ট দূর করার জন্য হযরত ইসা আলাইহিস সালামকে এমন 'নিদর্শন' প্রদান করা হোক যার দ্বারা হক ও বাতিলের পার্থক্য প্রকাশ পায়। আর আল্লাহর হক ও বান্দার হক নষ্ট করে ধনভাণ্ডার গড়ে তোলার যে-প্রচেষ্টা চলছে তার গোমর ফাঁক হয়ে যায়।

আল্লাহর প্রদত্ত এই চারটি মুজিযা ছাড়া স্বয়ং হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর পিতা ব্যতীত জন্মগ্রহণও আল্লাহ-প্রদত্ত একটি মহান মুজিযা ছিলো। তার বিবরণ আপনারা কিছুক্ষণ আগে শুনেছেন।

হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর হাতে যেসব মুজিযা প্রকাশিত হয়েছে বা তাঁর জন্মগ্রহণ যে-অস্বভাবিক ও অলৌকিক উপায়ে হয়েছে, হিংসাবশত ইহুদিরা তা অস্বীকার করেছে। তা তো তারা করবেই। কিন্তু কোনো কোনো বস্তুবাদী (এবং একইসঙ্গে) ইসলামের দাবিদারও এসব মুজিযাকে অস্বীকার করার পথ সৃষ্টির জন্য নিষ্ফল প্রচেষ্টা ব্যয় করেছে। তাদের মধ্যে কিছু লোক আছে যারা ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য মুজিযাকে অস্বীকার করে নি: বরং ইউরোপের আধুনিক বস্তুবাদী ও নাস্তিক বুদ্ধিজীবী ও চিন্তাবিদদের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে এই পথে হেঁটেছে। তারা তা করেছে যাতে তাদের ধর্মাদর্শের ওপর অলৌকিকতা-পূজার অপবাদ না আসতে পারে। তাদের মধ্যে স্যার সৈয়দ আহমদ ও মৌলবি চেরাগ আলির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আর কিছু ইহুদি-স্বভাবের লোক আছে যারা তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি ও অসৎ উদ্দেশ্য সাধনের

জন্য হিংসা ও বিদ্বেষে ফুলে উঠে হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর এসব মুজিযাকে কেবল অস্বীকারই করে নি; বরং অপব্যাখ্যার আড়াতে এসব মুজিযাকে নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপও করেছে। তাদের মিথ্যা নবুওতের দাবিদার মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানি এবং মিস্টার মোহাম্মদ আলী লাহোরি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কাদিয়ানি ও লাহোরি তো এই জুলুম করেছে যে, তারা হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর মুজিযা— أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ "আমি তোমাদের জন্য কাদা দিয়ে একটি পাখির মতো আকৃতি গঠন করবো; তারপর তাতে আমি ফুঁ দেবো; ফলে আল্লাহর হুকুমে তা পাখি হয়ে যাবে।"[৭১]—সম্পর্কে বলেছে যে, ইসা মাসিহ আলাইহিস সালাম-এর এই কাজটি একটি বিশেষ পুকুরের মাটির বৈশিষ্ট্য ছিলো। (অন্য জায়গার মাটি দ্বারা এই কাজ হতো না।) সুতরাং, এটা কোনো মুজিযাই নয়। ওই পুকুরের মাটির এই বৈশিষ্ট্য ছিলো যে, তার দ্বারা কোনো পাখির আকৃতি বানানো হলে এবং মুখ থেকে লেজ পর্যন্ত ছিদ্র রেখে দিলে তাতে বাতাস প্রবেশের ফলে আওয়াজের উৎপত্তি হতো এবং তা নড়া-চড়া করতে থাকতো। যেনো, নাউযুবিল্লাহ, এই দুর্ভাগাদের মতে হযরত মাসিহ আলাইহিস সালাম-এর পক্ষ থেকে তাঁর বিরোধীদের মোকাবিলায় এটা কোনো সত্যতা প্রতিপন্নকারী মুজিযা ছিলো না; বরং মাদারি খেলা বা যাদুকরের ভেলকিভাজি ছিলো।

একইভাবে তারা 'মৃতকে জীবিত করা'র মুজিযাকেও অস্বীকার করে তারা এই দাবি করেছে যে, পবিত্র কুরআন এই সিদ্ধান্ত শুনিয়ে দিয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা মৃত্যুর পরে কাউকেও এই পৃথিবীতে কিয়ামতের আগে জীবিত করবেন না। কিন্তু মজার ব্যাপার এই যে, যদি পুরো কুরআন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করে যান, তবে কোনো একটি আয়াতেও তাদের বর্ণিত এই 'সিদ্ধান্ত' দেখতে পাবেন না। বরং তাদের এই দাবির বিপরীতে অনেক জায়গায় এ-কথার প্রমাণ পাবেন যে, আল্লাহ তাআলা

---

[৭১] সুরা আলে ইমরান : আয়াত ৪৯।

এই দুনিয়াতেই মৃত্যুর পর পুনরায় নতুন জীবন দান করেছেন। যেমন, সুরা বাকারায় গাভি জবাইয়ের ঘটনায় আল্লাহ বলেছেন—

فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (سورة البقرة)

আমি বললাম, "এর (জবাইকৃত গরুর) কোনো অংশ দ্বারা ওকে (মৃত ব্যক্তিকে) আঘাত করো।" (তাতেই নিহত ব্যক্তি জীবিত হয়ে তার হত্যাকারীর নাম বলে দেবে।) এইভাবে আল্লাহ মৃতকে জীবিত করেন এবং তাঁর নিদর্শন তোমাদেরকে দেখিয়ে থাকেন, যাতে তোমরা অনুধাবন করতে পারো।' [সুরা বাকারা : আয়াত ৭৩][৭২]

সুরা বাকারারই অন্য একটি আয়াতে আল্লাহ বলেছেন—

أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ

"অথবা তুমি কি সেই ব্যক্তিকে[৭৩] দেখো নি, যে এমন নগরে উপনীত হয়েছিলো যা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিলো। সে বললো, 'মৃত্যুর পর কীরূপে আল্লাহ একে জীবিত করবেন?' তারপর আল্লাহ তাকে একশো বছর মৃত রাখলেন। পরে তাকে পুনরুজ্জীবিত করলেন। আল্লাহ বললেন, 'তুমি কতকাল অবস্থান করলে?' সে বললো, 'একদিন অথবা একদিনেরও কিছু অবস্থান করেছি।' তিনি বললেন, 'না, বরং তুমি একশো বছর অবস্থান করেছো।'" [সুরা বাকারা : আয়াত ২৫৯]

এই সুরারই আরেক জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে—

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (سورة البقرة)

---

[৭২] হযরত মুসা আলাইহিস সালাম-এর কাহিনিতে এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে।

[৭৩] অনেকের মতে ইনি ছিলেন ইসরাইলি নবী হযরত উযাইর আলাইহিস সালাম।

'(স্মরণ করুন) যখন ইবরাহিম বললো, "হে আমার প্রতিপালক, কীভাবে তুমি মৃতকে জীবিত করো আমাকে দেখাও।" তিনি বললেন, "তবে কি তুমি (এই বিষয়ে) বিশ্বাস করো না (ঈমান রাখো না)?" সে বললো, "কেনো করবো না, তবে এটা কেবল আমার চিত্তের প্রশান্তির জন্য (আমি কেবল আত্মার তৃপ্তি চাই)।" তিনি বললেন, "তবে চারটি পাখি নাও এবং তাদেরকে তোমার বশীভূত করে নাও। তারপর তাদের এক-এক অংশ এক-এক পাহাড়ে রেখে দাও। এরপর তাদেরকে ডাক দাও, তারা দ্রুতগতিতে (দৌড়ে) তোমার কাছে আসবে। জেনে রাখো যে, নিশ্চয় আল্লাহ প্রবল পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"' [সুরা বাকারা : আয়াত ২৬০][৭৪]

এসব ঘটনায় 'মৃতকে জীবিত করা'র পরিষ্কার ও স্পষ্ট অর্থ প্রমাণিত হয়েছে। যাঁরা এসব ক্ষেত্রে মৃতকে জীবন দান করার বিষয়টিকে রূপক বা আলঙ্কারিক অর্থে গ্রহণ করেছেন তাঁদেরকে একের পর এক অপব্যাখ্যার আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছে। কিন্তু তাঁদের অপব্যাখ্যাসমূহ থেকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় যে, তাঁরা 'মৃতকে জীবিত করা'র এই অপব্যাখ্যা এইজন্য করছেন না যে, কুরআনের কাছে দুনিয়াতে এমন ঘটনা ঘটা নিষিদ্ধ; বরং (তাঁদের অপব্যাখ্যার কারণ হিসেবে) তাঁরা বলেন, উল্লিখিত আয়াতগুলোর পূর্বাপর সম্পর্কের প্রতি লক্ষ করলে এই অর্থই (দুনিয়াতে মৃতকে জীবিত করা) অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল হয়।

মোটকথা, এই দাবি—পৃথিবীতে মৃতকে পুনর্জীবন দান কুরআন কর্তৃক নিষিদ্ধ—একেবারেই মির্যা কাদিয়ানি ও মিস্টার লাহোরির মস্তিষ্কপ্রসূত নতুন আবিষ্কার। এই দাবি সম্পূর্ণরূপে বাতিল ও প্রমাণহীন। তার পেছনে কোনো দলিল নেই। তবে আল্লাহ তাআলার স্বাভাবিক প্রাকৃতিক নিয়মাবলির অধীন এমন ঘটনা ঘটে না। যদি সবসময় এমন ঘটনা ঘটতেই থাকতো, তবে তা কখনো মুজিযা (অলৌকিক ঘটনা) বলে বিবেচিত হতো না। আর মহান আল্লাহর যে বিশেষ বিধান, যা কখনো কখনো নবী ও রাসুলগণের সত্যতা প্রমাণের জন্য বিরোধীদের মোকাবিলায় চ্যালেঞ্জ হিসেবে ঘটে আসছে, তার কোনো বিশেষত্ব থাকতো না।

---

[৭৪] হযরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম-এর কাহিনিতে বিস্তারিত দেখুন।

একইভাবে হযরত ইসা মাসিহ আলাইহিস সালাম-এর পিতাবিহীন জন্মগ্রহণের বিষয়টিকেও অস্বীকার করা হয়েছে এবং মির্যা কাদিয়ানি ও মিস্টার লাহোরি এর বিরুদ্ধে বিনা প্রমাণে আবোলতাবোল প্রলাপ বকেছে। কিন্তু এই বিষয়টির পক্ষে ও বিরুদ্ধ মতগুলোর প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে একজন নিরপেক্ষ ন্যায়বিচারক যখন হযরত ইসা মাসিহ আলাইহিস সালাম-এর জন্ম-সম্পর্কিত সবগুলো আয়াত পাঠ করবেন, তখন তাঁর কাছে এটা স্বভাবতই স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, কুরআন ইসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে ইহুদিদের খর্বকরণ আর নাসারাদের বাড়াবাড়ি—উভয়টির বিরুদ্ধে তাঁর নিজস্ব দায়িত্ব পালন করতে চায়, যার জন্য কুরআনের সত্য-আহ্বানের প্রকাশ ঘটেছে। ইহুদি ও নাসারারা এ-ব্যাপারে দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ও বিপরীত পথে চলে গেছে : ইহুদিরা বলে, হযরত ইসা আলাইহিস সালাম ছিলেন, মিথ্যাবাদী, প্রতারক ও ভেলকিবাজ; আর নাসারারা বলে, ইসা আলাইহিস সালাম খোদা বা খোদার পুত্র বা তিন খোদার এক খোদা ছিলেন। এই অবস্থায় পবিত্র কুরআন এসব অলীক ধারণা ও কল্পনার বিরুদ্ধে জ্ঞান ও বিশ্বাসের (ইলম ও ইয়াকিনের) পথ দেখিয়েছে এবং উল্লিখিত দুটি ভ্রান্ত মর্তাদর্শের বিরুদ্ধে এই সিদ্ধান্ত প্রদান করেছে যে, খর্বকরণ ও অতিরঞ্জনের মধ্যস্থলেই আছে সত্যপথ। আর সিরাতে মুসতাকিমের সত্যিকারের পরিচয় এটিই।

পবিত্র কুরআন বলে, জানা কথা যে, হযরত ইসা মাসিহ আলাইহিস সালাম মিথ্যাবাদী ও প্রতারক ছিলেন না। বরং তিনি ছিলেন আল্লাহর সত্য নবী এবং সত্যপথের সত্যিকার আহ্বানকারী। তিনি সত্যের আহ্বানের সত্যতা প্রতিপাদনের জন্য যে-কয়েকটি বিস্ময়কর ব্যাপার প্রদর্শন করেছেন তা আম্বিয়া কেরামের মুজিযাসমূহের তালিকাভুক্ত। তিনি যাদুকর বা ভেলকিবাজদের অন্তর্ভুক্ত নন। এটাও সঠিক যে, পিতা ব্যতীত তাঁর জন্ম হয়েছিলো; কিন্তু এ থেকে কী করে এটা আবশ্যক হয় যে, তিনি খোদা বা খোদার পুত্র হয়ে গিয়েছিলেন? যে-ব্যক্তি জন্মগ্রহণের মুখাপেক্ষী আর জন্মগ্রহণও মাতৃগর্ভের মুখাপেক্ষী আর যে-ব্যক্তি আবশ্যক মানবীয় গুণাবলি—খাওয়া ও পান করা ইত্যাদির মুখাপেক্ষী, তিনি বান্দা বা মানুষ ব্যতীত খোদা বা মাবুদ হতে পারেন কি? না, কখনোই না।

এখানে এই কথাটি ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, নাসারারা হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর ব্যাপারে খোদা হওয়ার যে-আকিদা কায়েম করেছিলো তার সবচেয়ে বড় নির্ভর ছিলো নাজরানের নাসারাদের প্রতিনিধিদল ও নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মধ্যকার কথোপকথনের ঘটনা।

ইহুদি ও নাসারারা হযরত ইসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে যেসব বাতিল ও ভ্রান্ত আকিদা কায়েম করেছিলো, কুরআন সেগুলোকে পরিষ্কার ভাষায় খণ্ডন করে তার সংশোধনী কর্তব্য পালন করেছে। সুতরাং, হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর পিতাবিহীন জন্মগ্রহণ—যার ওপর তাঁর খোদা হওয়ার দাবিটি নির্ভর করছে—যদি মিথ্যা ও অবাস্তব ব্যাপার হতো, তবে এটা কী করে সম্ভব ছিলো যে, কুরআন তা পরিষ্কার ভাষায় খণ্ডন করতো না এবং তার বিপরীতে জায়গায় জায়গায় এই ঘটনাকে ঠিক সেভাবে বর্ণনা করে যেতো যেভাবে ম্যাথুর ইঞ্জিলে বর্ণিত হয়েছে। (যদি পিতাবিহীন জন্ম নেয়ার বিষয়টি মিথ্যা ও অবাস্তবই হয়ে থাকতো, তবে) কুরআনের দায়িত্ব ছিলো সবার আগে তার ওপর আঘাত করা এবং শুধু এতটুকু বলে দেয়া যে, হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর পিতা অমুক ব্যক্তি। এভাবে কুরআন এসব ইমারতকে ধসিয়ে দিতো যার ওপর হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর খোদা হওয়ার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিলো। কিন্তু কুরআন এই পন্থা অবলম্বন করে নি; বরং বলেছে যে, এ-বিষয়টি কোনোভাবেই হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর খোদা হওয়ার প্রমাণ হতে পারে না। কারণ কুরআন বলছে—

إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (سورة آل عمران)

"আল্লাহর কাছে নিশ্চয় ইসার দৃষ্টান্ত আদমের দৃষ্টান্তসদৃশ। তিনি তাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছিলেন; তারপর তাকে বলেছিলেন, 'হও', ফলে সে হয়ে গেলো।" [সুরা আলে ইমরান : আয়াত ৫৯]

সুতরাং, হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর পিতাবিহীন জন্মগ্রহণ যদি তাকে খোদা হওয়ার মর্যাদা দিতে পারে, তবে তো হযরত আদম আলাইহিস সালাম-এর খোদা হওয়ার অধিকার আরো বেশি রয়েছে। কারণ, তিনি তো পিতা ও মাতা উভয়জন ছাড়া জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

যাই হোক। যেসকল অপব্যাখ্যা-পূজারী হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর পিতাবিহীন জন্মগ্রহণ করা-সম্পর্কিত আয়াতসমূহের বাক্যগুলোকে পৃথক পৃথক করে যে-অর্থের সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে তা ভুল। ভুল এ-কারণে যে, যখন এই ঘটনা-সম্পর্কিত আয়াতগুলো একত্র করে পাঠ করা হবে তখন এক মুহূর্তের জন্যও আয়াতগুলোর অর্থে পিতাবিহীন জন্মগ্রহণ করার অর্থ ছাড়া ভিন্ন কোনো অর্থেরই সম্ভাবনা থাকবে না। তবে আরবি ভাষার শব্দরাশির নির্দিষ্ট অর্থ ও ব্যবহারে যদি বিকৃতিকরণের দুঃসাহস করা হয় তবে ভিন্ন কথা।

তা ছাড়া, মাওলানা আবুল কালাম আযাদের বক্তব্য এই যে, যেসব লোক পিতাবিহীন জন্মগ্রহণ করা-সম্পর্কিত আয়াতসমূহে অপব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়েছে, তাদের দলিলের ভিত্তি শুধু এ-বিষয়টির ওপর যে, হযরত মারইয়াম আলাইহিস সালাম-এর বিয়ে হয়েছিলো ইউসুফের সঙ্গে; কিন্তু তিনি স্বামীর বাড়িতে গমন করেন নি। এই অবস্থায় স্বামী-স্ত্রীর সহবাস হযরত মুসা আলাইহিস সালাম-এর শরিয়তের বিরোধী না হলেও যুগের রেওয়াজ ও প্রথার সম্পূর্ণ বিপরীত ছিলো। এ-কারণে হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর জন্মগ্রহণ লোকদের কাছে খুব খারাপ লাগলো। কিন্তু প্রথমত তো এই ঘটনার (বিয়ে হওয়ার) কোনো প্রমাণই নেই। সবকিছু সনদবিহীন কথা। দ্বিতীয়ত, ইহুদিরা হযরত মারইয়াম আলাইহিস সালাম-এর ওপর যে-অপবাদ আরোপ করেছিলো, এনসাইক্লোপিডিয়া অব ব্রিটানিকায় বলা হয়েছে যে, এই সম্পর্ক ছিলো পিসথারট্যালি নামক এক ব্যক্তির সঙ্গে; ইউসুফ নাজ্জারের সঙ্গে ছিলো না। সুতরাং তাদের অপব্যাখ্যার ভিত্তিই সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও প্রমাণবিহীন।[৭৫]

তা ছাড়া এ-বিষয়টির একটি যৌক্তিক দিক আছে : যুক্তি এ-বিষয়টির সম্ভাবনাকে নিষিদ্ধ বা অসম্ভব মনে করে না; বরং এটিকে ঘটন-সম্ভব বলেই মনে করে। বর্তমান বিজ্ঞানজগৎ সম্পর্কে যাঁরা জানেন তাঁরা এই সত্য সম্পর্কে অনবগত নন যে, বর্তমানে বিজ্ঞানের নতুন গবেষণা থিওরিসমূহকে ছাড়িয়ে গিয়ে চাক্ষুষ দর্শন ও অভিজ্ঞতার দ্বারা এটা প্রমাণ করে দিয়েছে যে, অন্যান্য প্রাণির মতো মানুষের জন্মও ডিম্বাণু থেকে হয়ে থাকে। পরিভাষায় এটিকে জীবকোষ (Cell) বলা হয়। জীবকোষ পুরুষ

[৭৫] তরজুমানুল কুরআন, দ্বিতীয় খণ্ড।

ও স্ত্রীলোক উভয়ের মধ্যেই হয়ে থাকে। (পুরুষের জীবকোষকে শুক্রাণু আর স্ত্রীলোকের জীবকোষকে ডিম্বাণু বলে।) গর্ভ সঞ্চার হওয়ার অর্থ এই যে, পুরুষের শুক্রাণু স্ত্রীলোকের ডিম্বাণুর মধ্যে প্রবেশ করে। এই জীবকোষই জীবনের মৌল ও বীজ। আল্লাহর কুদরত একে অত্যন্ত সূক্ষ্ম অবয়ব দান করেছে। এই গবেষণা আমেরিকা ও ইংল্যান্ডের বিজ্ঞানীদের এই দিকে আকৃষ্ট করেছে যে, স্বামী-সহবাস ব্যতীত পুরুষ মানুষের শুক্রাণুকে যন্ত্রের সাহায্যে স্ত্রীলোকের ডিম্বাণুতে প্রবেশ করানোর মাধ্যমে মানবাস্তিত্ব অর্জনে সফল হওয়ার জন্য প্রচেষ্টা ব্যয় করা যাবে না কেনো? বিজ্ঞানীদের এই চিন্তা-ভাবনা এখনো বাস্তব অবস্থা থেকে কতই না দূরে; কিন্তু এর আবশ্যক ফল এই দাঁড়ায় যে, যুক্তি এটাকে সম্ভব বলেই মনে করে যে, মানবজন্ম চোখের দেখা সাধারণ প্রজননপদ্ধতির বাইরে অন্য পদ্ধতিতেও হতে পারে। একে আল্লাহর কুদরতের নিয়মবহির্ভূত বলা যাবে না এইজন্য যে, আমরা আল্লাহর কুদরতের যাবতীয় নিয়ম-কানুন সম্পর্কে অবগত নই। মানুষ জ্ঞান ও বিজ্ঞানে যতই অগ্রসর হতে থাকবে, তার সামনে আল্লাহর কুদরতি কানুনের নতুন নতুন দিক উন্মোচিত হতে থাকবে।

এ-কথা ঠিক যে, অতীতে যা অসম্ভব মনে করা হতো বর্তমানে তাকে সম্ভব বলা হচ্ছে এবং শিগগিরই বা কিছুকাল পরে তা ঘটবে বলে বিশ্বাস করা হচ্ছে। সুতরাং, জানি না, এর পরেও কুদরতের কানুনসমূহকে অবিশ্বাস করার কী অর্থ থাকতে পারে, যেসব কানুন সম্পর্কে আমরা এখনো অনবহিত রয়েছি, কিন্তু নবী ও রাসুলগণের মতো আল্লাহ-প্রদত্ত পবিত্র গুণে গুণান্বিত মহান ব্যক্তিগণ যে-তত্ত্বজ্ঞান সম্পর্কে জ্ঞাত রয়েছেন? তবে কি জ্ঞানগত (ইলমি) দলিল-প্রমাণের এটিও একটি দিক আছে যে, যে-বিষয়টি আমরা জানি না এবং যুক্তি যাকে অসম্ভব বলে প্রমাণ করছে না, তাকে শুধু এ-কারণে অবিশ্বাস বা অস্বীকার করা যে, আমরা তা জানি না? বিশেষ করে যদি এই অবিশ্বাস এমন এক মহান ব্যক্তির বিরুদ্ধে হয় যিনি আল্লাহ তাআলার মাসিহ ও নবী হওয়ার দাবিদার, তবে তো তার ক্ষেত্রে এ-কথা বলাই যেতে পারে।

এখন হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলির কথা কুরআন মাজিদ থেকে শুনুন এবং শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণের উপকরণ

লাভ করুন। কারণ, এসব ঘটনাবলির উল্লেখের দ্বারা এটাই কুরআনের উদ্দেশ্য।

وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ () وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ () وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ () إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (سورة آل عمران)

“এবং তিনি তাকে (ইসাকে) শিক্ষা দেবেন কিতাব, হিকমত, তাওরাত ও ইনজিল। এবং তাকে বনি ইসরাইলের জন্য রাসুল করবেন। (তিনি বলবেন,) ‘আমি তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে নিদর্শন নিয়ে এসেছি। আমি তোমাদের জন্য কাদা দিয়ে একটি পাখির মতো আকৃতি গঠন করবো; তারপর তাতে আমি ফুঁ দেবো; ফলে আল্লাহর হুকুমে তা পাখি হয়ে যাবে। আমি জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্তকে নিরাময় করবো এবং আল্লাহর হুকুমে মৃতকে জীবন্ত করবো। তোমরা তোমাদের গৃহে যা আহার করো ও মওজুদ করো তা তোমাদেরকে বলে দেবো। তোমরা যদি মুমিন হও, তবে এতে (আমার নবী হওয়ার সত্যতার পক্ষে) তোমাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। আর আমি এসেছি আমার সামনে তাওরাতের যা-কিছু রয়েছে তার সমর্থকরূপে এবং তোমাদের জন্য যা নিষিদ্ধ ছিলো (তোমাদের বক্রতার অপরাধে) তার কতকগুলোকে বৈধ করতে। এবং আমি তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট নিদর্শন নিয়ে এসেছি। সুতরাং আল্লাহকে ভয় করো আর আমাকে অনুসরণ করো। নিশ্চয় আল্লাহ আমার প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক, সুতরাং তোমরা তার ইবাদত করবে। এটাই সরল পথ।’” [সুরা আলে ইমরান : আয়াত ৪৮-৫১]

إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ (سورة المائدة)

“স্মরণ করো, আল্লাহ বলবেন, ‘হে মারইয়াম-তনয় ইসা, তোমার প্রতি ও তোমার জননীর প্রতি আমার অনুগ্রহ স্মরণ করো : পবিত্র আত্মা (জিবরাইল আলাইহিস সালাম) দ্বারা আমি তোমাকে শক্তিশালী করেছিলাম এবং তুমি দোলনায় থাকা অবস্থায় ও পরিণত বয়সে মানুষের সঙ্গে কথা বলতে; তোমাকে কিতাব, হিকমত[৭৬], তাওরাত ও ইঞ্জিল শিক্ষা দিয়েছিলাম; তুমি কাদা দিয়ে আমার অনুমতিক্রমে পাখির মতো আকৃতি গঠন করতে এবং তাতে ফুঁ দিতে, ফলে আমার অনুগ্রহে তা পাখি হয়ে যেতো; জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্তকে তুমি আমার অনুগ্রহক্রমে নিরাময় করতে এবং আমার অনুগ্রক্রমে তুমি মৃতকে জীবিত করতে; আমি তোমার থেকে বনি ইসরাইলকে (তাদের পাকড়াও ও হত্যা করার ষড়যন্ত্রকে) নিবৃত্ত রেখেছিলাম; তুমি যখন তাদের কাছে স্পষ্ট নিদর্শন এনেছিলে তখন তাদের মধ্যে যারা কুফরি করেছিলো তারা বলছিলো, ‘এটা তো স্পষ্ট জাদু।’” [সুরা মায়িদা : আয়াত ১১০]

فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ (سورة الصف)

“পরে সে (ইসা আলাইহিস সালাম) যখন যখন স্পষ্ট নিদর্শনসহ তাদের কাছে এলো তখন তারা (বনি ইসরাইল) বলতে লাগলো, ‘এ তো এক স্পষ্ট যাদু।’” [সুরা সাফ : আয়াত ৬]

আম্বিয়া কেরাম (আলাইহিমুস সালাম) যখনই কওমসমূহের সামনে আল্লাহর নিদর্শনসমূহ প্রদর্শন করেছেন তখন অবিশ্বাসকারীরা একটি কথা অবশ্যই বলেছে যে, ‘এ তো প্রকাশ্য যাদু।’ সুতরাং, এই জবাবটি কি একজন সত্যসন্ধানী ও নিরপেক্ষ মানুষকে এই দিকে নির্দেশ করে না যে.

---

[৭৬] যাবতীয় বিষয়বস্তুকে সঠিক জ্ঞান দ্বারা জানাকে হিকমত বলে।

আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম-এর এই জাতীয় নিদর্শন বা মুজিযা প্রদর্শন আল্লাহ তাআলার সাধারণ নিয়মাবলি থেকে ভিন্ন এমন এক ইলমের দ্বারা প্রদর্শিত হচ্ছে যা কেবল আল্লাহ-প্রদত্ত পবিত্র গুণাবলিসম্পন্ন মহাপুরুষদের জন্যই নির্দিষ্ট রয়েছে। তাঁরা ছাড়া মানবজগতের আর কেউ মুজিযার তত্ত্ব উপলব্ধি করতে সক্ষম ছিলো না। এ-কারণেই তারা শত্রুতা ও বিরোধিতাবশত তা অবিশ্বাস করায় বদ্ধপরিকর ছিলো; তা অবিশ্বাস করার জন্য তাকে 'প্রকাশ্য যাদু' বলে দেয়া ছাড়া আর কোনো ভালো পন্থা তাদের কাছে ছিলো না। সুতরাং, এসব বিষয়কে যাদু বলাও সেগুলোর মুজিযা ও আল্লাহর নিদর্শন হওয়ার পক্ষে শক্তিশালী দলিল।

হযরত ইসা আলাইহিস সালাম এবং তাঁর শিক্ষার সারকথা

হযরত ইসা আলাইহিস সালাম বনি ইসরাইলকে দলিল ও প্রমাণ এবং আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মাধ্যমে সত্যধর্মের শিক্ষা দিতে থাকলেন। তাদের ভুলে-যাওয়া শিক্ষাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে মৃত অন্তরসমূহে নবজীবন দান করতে থাকলেন।

আল্লাহ ও আল্লাহর একত্বের ওপর ঈমান, নবী ও রাসুল আলাইহিমুস সালাম-এর সত্যতা প্রদিপাদন, আখেরাতের ব্যাপারে ঈমান, আল্লাহর ফেরেশতাদের ওপর ঈমান, অদৃষ্ট বিধান ও তাকদিরের ওপর ঈমান, আল্লাহর রাসুলগণ ও কিতাবসমূহের ওপর ঈমান, সচ্চরিত্রতা অবলম্বন, খারাপ কাজ বর্জন করা ও তা থেকে দূরে থাকা, আল্লাহ তাআলার ইবাদতে আগ্রহ, দুনিয়ার লোভের প্রতি ঘৃণা, আল্লাহর সৃষ্ট জীবের প্রতি ভালোবাসা—এগুলোই ছিলো শিক্ষা ও দীক্ষা যা তাঁর জীবনের দৈনন্দিন কাজ ও পদীয় দায়িত্ব ছিলো। তিনি তাওরাত, ইঞ্জিল, হেকমতপূর্ণ নসিহত ও উপদেশ দ্বারা বনি ইসরাইলকে এসব বিষয়ের প্রতি আহ্বান জানাতেন। কিন্তু হতভাগা ইহুদিরা তাদের বক্র স্বভাব, বহু শতাব্দীর অবাধ্যতা এবং আল্লাহ তাআলার শিক্ষার বিরোধিতার কারণে কঠিন-আত্মা হয়ে পড়েছিলো এবং আল্লাহর নবী ও রাসুলগণকে হত্যা করা তাদের হৃদয়কে সত্য ও সততা গ্রহণের ক্ষেত্রে কঠোর করে তুলেছিলো। ফলে তাদের একটি ক্ষুদ্র দল ছাড়া ইহুদি গোত্রের প্রায় সবাই তাঁর বিরোধিতা এবং তাঁর সঙ্গে হিংসা ও শত্রুতা করাকেই তাদের প্রতীক ও

তাদের গোত্রীয় জীবনের মানদণ্ড বানিয়ে নিয়েছিলো। এ-কারণে নবীগণের সরল নীতি অনুযায়ী নসিহত ও হেদায়েতের মজলিসসমূহে পার্থিব মানমর্যাদার প্রেক্ষিতে দুর্বল ও অক্ষম এবং নিম্নস্তরের পেশার ও জীবিকার লোকদেরই বেশি দেখা যেতো। দুর্বল লোকদের এই শ্রেণি যদি নিষ্ঠা ও ধার্মিকতার সঙ্গে সত্যের আহ্বানে সাড়া দিতো, তবে বনি ইসরাইলের ওই অবাধ্যাচারী ও গর্বস্ফীত দল তাদের সঙ্গে ও আল্লাহর নবীগণের সঙ্গে পরিহাস করতো এবং তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করতো। তাদের কর্মতৎপরতার বেশির ভাগই ব্যয় করতো নবীগণ ও তাঁদের অনুসারীদের বিরোধিতায়।

উল্লিখিত বক্তব্য কুরআনে তুলে ধরা হয়েছে এভাবে—

وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ () إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ () فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ

(سورة الزخرف)

"ইসা যখন স্পষ্ট নিদর্শনসহ এলো তখন সে বলেছিলো, 'আমি তো তোমাদের কাছে এসেছি প্রজ্ঞাসহ (হেকমতসহ) এবং তোমরা যে কতক বিষয়ে মতভেদ করছো তা স্পষ্ট করে দেয়ার জন্য। সুতরাং, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার অনুসরণ করো। আল্লাহই তো আমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক, অতএব তোমরা তাঁরই ইবাদত করো; এটাই সরল পথ।'" [সুরা যুখরুফ : আয়াত ৬৩-৬৪]

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ (سورة الصف)

"স্মরণ করো, মারইয়াম-তনয় ইসা বলেছিলো, 'হে বনি ইসরাইল, আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর রাসুল এবং আমার পূর্ব থেকে তোমাদের কাছে যে-তাওরাত রয়েছে আমি তার সমর্থক এবং আমার পরে আহমদ নামে যে-রাসুল আসবে আমি তার সুসংবাদদাতা।' পরে সে যখন যখন স্পষ্ট

নিদর্শনসহ তাদের কাছে এলো তখন তারা (বনি ইসরাইল) বলতে লাগলো, 'এ তো এক স্পষ্ট যাদু।'" [সুরা সাফ্ফ : আয়াত ৬]

فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ () رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ (سورة آل عمران)

"যখন ইসা তাদের অবিশ্বাস উপলব্ধি করলো তখন সে বললো, 'আল্লাহর পথে কারা আমার সাহায্যকারী?' হাওয়ারিগণ[৭৭] বললো, 'আমরাই আল্লাহর পথে সাহায্যকারী। আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি। আমরা আত্মসমর্পণকারী, তুমি এর সাক্ষী থেকো। হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি যা অবতীর্ণ করেছো তাতে আমরা ঈমান এনেছি এবং আমরা এই রাসুলের অনুসরণ করেছি। সুতরাং, আমাদেরকে সাক্ষ্যদানকারীদের অন্তর্ভুক্ত করো।'" [সুরা আলে ইমরান : আয়াত ৫২-৫৩]

হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর হাওয়ারি

শত্রুদল ও বিরোধীদের বাধা-বিপত্তি ও কুৎসা রটনা সত্ত্বেও হযরত ইসা আলাইহিস সালাম তাঁর পদীয় দায়িত্ব 'সত্যের প্রতি আহ্বান' তৎপরতার সঙ্গে চালিয়ে যাচ্ছিলেন। বনি ইসরাইলের বসতি ও বাসস্থানগুলোতে দিন-রাত আল্লাহ তাআলার পয়গাম শুনাচ্ছিলেন। স্পষ্ট দলিল ও প্রকাশ্য নিদর্শনের দ্বারা মানুষকে সত্য ও সততা অবলম্বনের আহ্বান জানাচ্ছিলেন। আল্লাহ ও আল্লাহর আদেশের অবাধ্যাচারী ও বিদ্রোহী লোকজনের ভিড়ে কতিপয় পুণ্যাত্মাও বেরিয়ে আসতেন যাঁরা হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর আহ্বানে সাড়া দিতেন এবং প্রকৃত অর্থেই সত্যধর্মকে গ্রহণ করতেন। এই পবিত্র বান্দাদের মধ্যেই ওইসকল পবিত্রাত্মাও ছিলেন যাঁরা হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর সাহচর্যের মর্যাদা লাভ করেছিলেন। তাঁরা কেবল ঈমানই আনেন নি; বরং সত্যধর্মের উন্নতি ও সফলতার জন্য তাঁরা জানমালও কুরবান করে দীনের খেদমতের জন্য নিজেদের উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। অধিকাংশ সময় হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর সঙ্গে থেকে ধর্ম প্রচারে তাঁকে

[৭৭] হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর বিশেষ অনুসারীদের হাওয়ারি বলা হয়।

সাহায্য করতেন। এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই তারা হাওয়ারি (রফিক বা বন্ধু) এবং আনসারুল্লাহ (আল্লাহর দীনের সাহায্যকারী) আখ্যায় আখ্যায়িত ও সম্মানিত হয়েছিলেন। এই বুযর্গ ব্যক্তিগণ আল্লাহ তাআলার পবিত্র জীবনকে তাঁদের আদর্শ বানিয়ে নিয়েছিলেন এবং কঠিন থেকে কঠিন ও সঙ্কটময় থেকে সঙ্কটসময় অবস্থাতেও তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করেন নি। তাঁরা সর্বকালীন সঙ্গী ও সাহায্যকারী প্রমাণিত হয়েছিলেন।

আল্লাহ তাআলা তাদের সম্পর্কে বলেন—

وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ (سورة المائدة)

“আরো স্মরণ করো, আমি যখন হাওয়ারিদেরকে এই আদেশ দিয়েছিলাম যে, ‘তোমরা আল্লাহর প্রতি ও আমার রাসুলের প্রতি ঈমান আনো,’ তারা বলেছিলো, ‘আমরা ঈমান আনলাম এবং তুমি সাক্ষী থেকো যে, আমরা তো মুসলিম।’” [সুরা মায়িদা : আয়াত ১১১]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ فَآمَنَتْ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ (سورة الصف)

“হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর দীনের সাহায্যকারী হও, যেমন মারইয়াম-তনয় ইসা হাওয়ারিগণকে বলেছিলো, ‘আল্লাহর পথে কে আমার সাহায্যকারী হবে?’ হাওয়ারিগণ বলেছিলো, ‘আমরাই আল্লাহর পথে সাহায্যকারী।’ তারপর বনি ইসরাইলের একদল ঈমান আনলো এবং একদল কুফরি করলো। তখন আমি যারা ঈমান এনেছিলো তাদেরকে তাদের শত্রুদের মোকাবিলায় শক্তিশালী করলাম, ফলে তারা বিজয়ী হলো।” [সুরা আস-সাফ্ফ : আয়াত ১৪]

আগের পৃষ্ঠাগুলোতে এ-কথা পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর হাওয়ারিগণের অধিকাংশই দরিদ্র ও মজুর শ্রেণির লোক ছিলেন। কারণ, আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম-এর দাওয়াত ও তাবলিগের সঙ্গে আল্লাহর এই নীতি জারি রয়েছে যে, তাঁদের সত্যের

আহ্বানে সাড়া দিতে ও সত্যধর্মের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করতে প্রথমে দুর্বল ও দরিদ্র শ্রেণির লোকেরাই অগ্রসর হয়ে থাকে। নিম্নস্তরের লোকেরাই জীবন-উৎসর্গের প্রমাণ দিয়ে থাকে। আর যুগের শক্তিমান ও ক্ষমতাশালী লোকেরা গর্ব ও অহঙ্কারের সঙ্গে মোকাবিলা ও বিরোধিতার জন্য সামনে এগিয়ে আসে এবং বিরোধিতামূলক তৎপরতার সঙ্গে আল্লাহর দীনের বিকাশ ও উন্নতির পথে প্রবল বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু আল্লাহ তাআলার কর্মফল প্রদানের নীতি কার্যকর হলে পরিণতি হয় এই যে, সত্যধর্মের জন্য প্রাণ উৎসর্গকারী দুর্বলেরাই সফলতা লাভ করে; আর গর্বস্ফীত ও অহঙ্কারী শক্তিমান বিরোধীরা পৃথিবীতেই ধ্বংসের লাঞ্ছনাকর গহ্বরে পতিত হয়। অথবা অপদস্থ ও লাঞ্ছিত হয়ে মাথা নীচু করা ছাড়া তাদের সামনে আর কোনো উপায় থাকে না।

হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর হাওয়ারি এবং কুরআন ও ইঞ্জিলের তুলনা

কুরআন হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর হাওয়ারিদের ফযিলত ও মর্যাদা বর্ণনা করেছে। সুরা আলে ইমরানের আয়াত আপনাদের সামনে রয়েছে। হযরত মাসিহ আলাইহিস সালাম সত্যর্মের সাহায্যের জন্য আহ্বান জানালে যাঁরা সর্বপ্রথম 'আমরা আল্লাহর (দীনের) সাহায্যকারী' বলে আওয়াজ তুলেছিলেন তাঁরা এই পুণ্যত্মারাই ছিলেন। সুরা সাফ্ফ-এ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যখন মুসলমানদের সম্বোধন করে كُونُوا أَنْصَارَ اللهِ 'তোমরা আল্লাহর (দীনের) সাহায্যকারী হয়ে যাও' বলে উৎসাহ প্রদান করেছেন তখন প্রাচীনকালের উম্মতদের স্মরণ করানোর প্রেক্ষিতে ওইসকল পুণ্যাত্মারই উলেখ করেছেন এবং তাঁদেরই দৃষ্টান্ত ও উদাহরণ পেশ করে সত্যের সাহায্যের জন্য উৎসাহিত করেছেন। আর সুরা মায়েদায় ঈমান ও সত্যের আহ্বানের সামনে নতি স্বীকার ও আনুগত্যের যে-চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে, সেটাও তাঁদের একনিষ্ঠতা, সত্যান্বেষণ ও সত্যের জন্য প্রচেষ্টার জীবন্ত ছবি। এ-সবকিছুই ওই সময়ের অবস্থা যখন পর্যন্ত হযরত ইসা আলাইহিস সালাম তাঁদের মধ্যে জীবিত ছিলেন। কিন্তু তাঁর 'আসমানে উত্তোলিত হওয়া'র পর হাওয়ারিদের পূর্ণ দৃঢ়তা ও

সত্যধর্মের জন্য আত্মোৎসর্গী সেবা সম্পর্কে সুরা সাফ্‌ফ-এর আয়াত فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ 'তখন আমি যারা ঈমান এনেছিলো তাদেরকে তাদের শত্রুদের মোকাবিলায় শক্তিশালী করলাম, ফলে তারা বিজয়ী হলো'-এ যথেষ্ট ইঙ্গিত বিদ্যমান। আর এ-কারণেই হযরত শাহ আবদুল কাদির (নাওওয়ারাল্লাহু মারকাদাহু) আলোচ্য আয়াতের তাফসিরে ঐতিহাসিক প্রমাণ উল্লেখ করেছেন এভাবে—

'হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর পর তাঁর সহচর (হাওয়ারি)-বৃন্দ ব্যাপক প্রচেষ্টা ব্যয় করেছেন। তাতেই তাঁর ধর্ম প্রসার লাভ করেছে। আমাদের হযরত (মুহাম্মদ) সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পরেও তাঁর অনুসারী মুসলমানগণ তার চেয়ে বেশি করেছেন।'

পক্ষান্তরে বাইবেল (ইঞ্জিল) কোনো কোনো স্থানে হাওয়ারিদের ফযিলত ও প্রশংসা বর্ণনায় পঞ্চমুখ হলেও অন্যদিকে তাদের ভীরু ও বিশ্বাসঘাতক সাব্যস্ত করেছে। ইউহান্নার ইঞ্জিলে হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর বিখ্যাত ও নির্ভরযোগ্য হাওয়ারি ইয়াহুদা সম্পর্কে ওই সময়ের অবস্থা 'যখন ইহুদিরা হযরত ইয়াসু আলাইহিস সালামকে গ্রেফতার করতে চাচ্ছিলো' বর্ণিত আছে এভাবে—

"এসব কথা বলে হযরত ইয়াসু আলাইহিস সালাম মনে মনে আতঙ্কগ্রস্ত হলেন এবং এই সাক্ষ্য প্রদান করলেন যে, 'আমি তোমাদের সত্য বলছি, তোমাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি আমাকে ধরিয়ে দেবে।' তিনি এ-কথা কার উদ্দেশে বলছেন এ-বিষয়ে শিষ্যমণ্ডলী সন্দিগ্ধ হয়ে একে অপরের দিকে তাকাতে লাগলেন... এক ব্যক্তি, যাঁকে ইয়াসু আলাইহিস সালাম খুব ভালোবাসতেন... ইয়াসু আলাইহিস সালাম-এর সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর বন্ধু, সে কে? হযরত ইয়াসু আলাইহিস সালাম জবাব দিলেন, 'যাকে আমি খাদ্যের পূর্ণ গ্রাস দান করবো।' তারপর তিনি খাদ্যের পূর্ণ গ্রাস নিলেন এবং তা শামাউন আসকারিউতির পুত্র ইয়াহুদাকে দান করলেন। এই গ্রাসের পর শয়তান তার ভেতরে প্রবেশ করলো।"[৭৮]

---

[৭৮] অধ্যায় ১৩, আয়াত ২১-২৭।

আর ম্যাথুর ইঞ্জিলে (Gospel of Matthew) হাওয়ারি শামাউন পিটার্স, যিনি অন্যান্য ইঞ্জিলের বক্তব্য অনুযায়ী ইয়াসু আলাইহিস সালাম-এর প্রিয় ও নির্ভরযোগ্য ছিলেন, সম্পর্কে বলা হয়েছে—

"শামাউন পিটার্স তাঁকে বললেন, 'হে আল্লাহর বন্ধু, আপনি কোথায় যাচ্ছেন?' ইয়াসু আলাইহিস সালাম জবাব দিলেন, 'আমি যেখানে যাচ্ছি, এখন তুমি আর আমার পেছনে পেছনে আসতে পারবে না। কিন্তু পরে আসবে।' পিটার্স বললেন, 'হে আল্লাহর বন্ধু, এখন আমি কেনো আপনার পেছনে আসতে পারবো না, আমি তো আপনার জন্য আমার জীবনদান করবো।' ইয়াসু আলাইহিস সালাম জবাব দিলেন, 'তুমি কি সত্যিই আমার জন্য জীবনদান করবে?' আমি তোমাকে সত্য সত্য বলছি, মোরগ বাগ দেবে না, যে পর্যন্ত তুমি আমাকে তিনবার অস্বীকার না করবে।'"[৭৯]

আর ম্যাথুর ইঞ্জিলেই হযরত ইয়াসু আলাইহিস সালাম-এর সহচর (হাওয়ারি)-বৃন্দের নির্বুদ্ধিতা এবং ইয়াসু আলাইহিস সালামকে নিঃসঙ্গ ও নিঃসহায় অবস্থায় ফেলে রেখে পলায়ন করার বিষয়টিকে উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে—

"এতে তার সব শিষ্য তাঁকে পরিত্যাগ করে পালিয়ে গেলো।"[৮০]

এই উদ্ধৃতগুলো থেকে এমন তিনটি বিষয় প্রমাণিত হচ্ছে যেগুলোকে যৌক্তিক প্রমাণ ও বর্ণনাগত দলিল মেনে নিতে প্রস্তুত নয়। প্রথম বিষয় এই যে, যে-সকল সহচর (হাওয়ারি) হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর একান্ত নিকটস্থানীয় ও নির্ভরযোগ্য এবং তাঁর প্রিয়ভাজন ছিলেন, পরিণামে তাঁরা কেবল কাপুরুষই নন, বরং মুনাফিক সাব্যস্ত হয়েছেন। কিন্তু যুক্তি ও বর্ণনাগত প্রমাণের মীমাংসা এই যে, যদিও প্রত্যেক নবী ও সংশোধকের দলে একটি ক্ষুদ্র দল সাধারণত মুনাফিক হয়ে থাকে, কিন্তু এক নবী ও সংশোধকের মধ্যে আবহমান কাল থেকে এই পার্থক্য রয়েছে যে, সংশোধক তাঁর দলের মুনাফিকদের সম্পর্কে অবহিত না হতে পারেন, নবী ও রাসুলকে আল্লাহ তাআলা ওহি দ্বারা প্রথম থেকেই খাঁটি সহচর ও মুনাফিক সম্পর্কে অবহিত করে দিয়ে থাকেন। যাতে অবিশ্বাসী কাফেরদের চেয়ে যে-দল দ্বারা সত্যপন্থীদের এবং তাঁর সত্যের আহ্বান

---

[৭৯] মতি, অধ্যায় ২৭, অধ্যায় ৪৬।
[৮০] মতি, অধ্যায়, আয়াত ৪৬।

ও সংশোধনের অধিক ক্ষতি হতে পারে, নবী সেই দল সম্পর্কে অনবহিত ও অসচেতন না থাকেন। সুতরাং, কোনো মুনাফিক কখনোই এবং কোনো অবস্থাতেই নবী ও রাসুলের প্রিয়ভাজন, নির্ভরযোগ্য ও নিকটস্থানীয় হতে পারে না। অবশ্য এটা একটি ভিন্ন বিষয় যে, নবী সত্যধর্মের কল্যাণ নিশ্চিত করতে মুনাফিকদের সঙ্গে এড়িয়ে চলা ও ক্ষমাসুলভ কর্মপন্থা অবলম্বন করা সঙ্গত মনে করেন। যেমন, নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একজন সাহাবি জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি তো মুনাফিকদের মুনাফেকি অবস্থা সম্পর্কে বিশেষভাবে অবগত আছেন, তবে তাদের বিরুদ্ধে তাদের খারাপ কর্মকাণ্ডের শাস্তির ব্যবস্থা কেনো করছেন না, যাতে মুসলিমগণ ওইসব মুনফিকের মুনাফেকি থেকে মুক্ত থাকতে পারে?' রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাবে বলেছিলেন, 'তাদের প্রকাশ্যে ঈমান আনার পর অমুসলিমরা তাদেরকে মুসলিম বলেই মনে করছে। এখন আমি তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করলে তারা এই ধোঁকায় পতিত হবে যে, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর সঙ্গীদের হত্যা করতেও দ্বিধা করে না।'

দ্বিতীয় এই বিষয়টি প্রমাণিত হয় যে, ইয়াহুদার ভেতরে তখনই শয়তান প্রবেশ করেছিলো যখন ইসা আলাইহিস সালাম নিজ হাতে তাঁর মুখে খাদ্যের পূর্ণগ্রাস তুলে দিয়েছিলেন। কিন্তু এ-ব্যাপারটি যুক্তি ও বর্ণনাগত প্রমাণের বিরোধী। কারণ, পবিত্র ও মুত্তাকি লোকদের হাতে যা-কিছু হয়ে থাকে তার প্রতিক্রিয়া তো বরকতময় ও পবিত্রই হয়ে থাকে; তাতে কখনো মন্দ ক্রিয়া বা শয়তানের প্রবেশ ঘটে না। নিঃসন্দেহে এটা সত্য যে, সত্যের মানদণ্ড যখন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন তার দ্বারা খাঁটি ও মেকি উভয় বস্তুর স্বরূপ প্রকাশিত হয়ে পড়ে। কিন্তু কখনো এমন হয় না যে, ওই মানদণ্ডের সংস্পর্শে এলে কোনো খাঁটি বস্তুর মধ্যে মেকিত্ব সৃষ্টি হয়। আর ইঞ্জিলের বর্ণনায় অবস্থা প্রথমটি নয়, দ্বিতীয়টি।

তৃতীয় বিষয় এই যে, হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর যে-সকল হাওয়ারিরি ব্যাপক প্রশংসা ও স্তবে বাইবেল বিভিন্ন স্থানে পঞ্চমুখ তাঁদের মধ্যে একজন, দুইজন বা পাঁচ-দশজন নয়, সবাই বিশ্বাসঘাতকতা ও কাপুরুষতার সঙ্গে ইসা আলাইহিস সালাম থেকে দূরে সরে গেলেন, যখন সত্যধর্মের হেফাজত ও সাহায্যের জন্য সবচেয়ে বেশি তাঁদের প্রয়োজন

ছিলো। আর তাও এমন সময়, যখন আল্লাহ তাআলার নবী শত্রুদের দ্বারা বেষ্টিত ছিলেন।

কিন্তু ইঞ্জিলের এই সাক্ষ্যের বিপরীতে সুরা আলে ইমরানে কুরআন মাজিদের সাক্ষ্য এই যে, সেই সঙ্কটময় সময়ে যখন হযরত ইসা আলাইহিস সালাম তাঁর হাওয়ারিবৃন্দকে সত্যধর্মের ও সহায়তার জন্য আহ্বান করলেন তখন সবাই দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ও প্রাণোৎসর্গের প্রেরণার সঙ্গে জবাব দিলেন, نَحْنُ أَنْصَارُ اللهِ 'আমরাই আল্লাহর (দীনের) সাহায্যকারী'। তারপর তাঁরা হযরত মাসিহ আলাইহিস সালাম-এর সামনে তাঁদের ধর্মবিশ্বাসের দৃঢ়তা ও একনিষ্ঠ ঈমানের সাক্ষ্য প্রদান করে তাঁকে সম্পূর্ণভাবে আশ্বাস্ত করলেন। তারপর সুরা সাফ্ফ-এর কুরআন মাজিদ এটাও প্রকাশ করেছে যে, হাওয়ারিগণ হযরত ইসা আলাইহিস সালামকে যা-কিছু বলেছিলেন তা তাঁর জীবদ্দশায় ও তাঁর (আসমানে উত্তোলিত হওয়ার) পরেও তাঁরা অকপট বিশ্বস্ততার সঙ্গে পাণ করেছিলেন এবং সন্দেহাতীতভাবে সত্যিকারের মুমিন বলে সাব্যস্ত হয়েছিলেন। এ-কারণে আল্লাহ তাআলাও তাঁদের সাহায্য করেছিলেন এবং সত্যের শত্রুদের মোকাবিলায় তাঁদের সাফল্যমণ্ডিত করেছিলেন।

ইঞ্জিল ও কুরআনের এই তুলনামূলক ব্যাখ্যা দেখে একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি এ-কথা না বলে থাকতে পারেন না যে, এ-ব্যাপারে কুরআনের বক্তব্যই সত্য। আর নাসারা আলেমগণ ইঞ্জিলকে বিকৃত করে এ-জাতীয় মনগড়া ঘটনা এইজন্য সংযুক্ত করেছেন, যাতে বহু শতাব্দী পরের স্বরচিত আকিদা—ইসা আলাইহিস সালামকে শূলে চড়ানোর আকিদা—সম্পর্কে এই মনগড়া কাহিনি সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে যে, যখন হযরত মাসিহ আলাইহিস সালামকে শূলে চড়ানো হলো তখন তিনি এই বলতে বলতে প্রাণ দিলেন যে, ايلى ايلى لما سبقتنى 'হে আল্লাহ, হে আল্লাহ, আপনি কেনো আমাকে একাকী ও নিঃসঙ্গ অবস্থায় পরিত্যাগ করলেন?' এবং কোনো একজন সঙ্গীও তাঁকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে গেলো না।

মোটকথা, হওয়ারি সম্পর্কে বাইবেলের এসব বক্তব্য সম্পূর্ণ বিকৃত এবং মনগড়া কাহিনির চেয়ে অধিক কোনো মর্যাদার অধিকারী নয়।

খাদ্যের খাঞ্চা নাযিল হওয়া

একনিষ্ঠ ও উৎসর্গিতপ্রাণ হাওয়ারিদের জামাত খাঁটি ঈমানদার ও দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন; কিন্তু শিক্ষা, সামাজিক লৌকিকতা ও সংস্কারের প্রেক্ষিতে অত্যন্ত সাদাসিধে এবং জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় আসবাব ও সরঞ্জামের বিবেচনায় দরিদ্র ও দুর্বল জামাত ছিলেন। এ-কারণে তাঁরা সরলতার সঙ্গে ও সরল মনে হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর কাছে এই আবেদন করেছিলেন যে, 'যে-মহান আল্লাহর এই অসীম ক্ষমতা রয়েছে—যার একটি নমুনা আপনার পবিত্র অস্তিত্ব এবং ওইসব মুজিযা (নিদর্শন) যেগুলোকে আল্লাহ তাআলা আপনার নবুওত ও রিসালাতের সত্যতা প্রতিপাদনের জন্য আপনার হাতে প্রকাশ করেছেন—সেই মহান আল্লাহর অবশ্যই এই ক্ষমতা থাকবে যে, তিনি আমাদের জন্য অদৃশ্য থেকে একটি খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা নাযিল করবেন। এর ফলে আমরা জীবিকা উপার্জনের চিন্তা থেকে মুক্ত থেকে নিশ্চিন্ত মনে আল্লাহ তাআলার যিকির-আযকার এবং সত্যধর্মের প্রচার- ও প্রসারকার্যে লিপ্ত থাকবো।' হযরত ইসা আলাইহিস সালাম তাঁর সঙ্গীদের আবেদন শুনে উপদেশ দিলেন যে, 'আল্লাহ তাআলার ক্ষমতা অসীম ও অনন্ত; কিন্তু খাঁটি বান্দার জন্য আল্লাহকে এভাবে পরীক্ষা করা সমীচীন নয়। সুতরাং আল্লাহকে ভয় করো এবং এ-ধরনের চিন্তা-ভাবনা ত্যাগ করো।' এ-কথা শুনে হাওয়ারিগণ বললেন, 'আমরা আল্লাহকে পরীক্ষা করবো! তা কখনোই নয়। আমাদের উদ্দেশ্য তা নয়। আমাদের উদ্দেশ্য তো এই যে, জীবিকা অর্জনের প্রচেষ্টা ও শ্রম থেকে অন্তরকে নিশ্চিত করে আল্লাহ তাআলার সেই দানকে জীবনযাপনের একমাত্র ভরসা বানিয়ে নেবো এবং তাতে আপনার সত্যতা প্রতিপাদনে নিশ্চিত সত্যের বিশ্বাস আরো দৃঢ় ও শক্তিশালী হবে। আর আমরা তাঁর প্রভুত্বের পক্ষে মানবজগতের জন্য সত্য সাক্ষী হয়ে থাকবো।'

হযরত ইসা আলাইহিস সালাম যখন তাঁদের পৌনঃপুনিক আবদার ও জেদ দেখলেন, তিনি আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করলে, 'হে আল্লাহ, আপনি এদের যাচ্ঞা পূর্ণ করুন এবং আসমান থেকে আমাদের জন্য খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা নাযিল করুন। তা যেনো আপনার অসন্তুষ্টির প্রকাশক্ষেত্র সাব্যস্ত না হয়; বরং আমাদের পূর্বাপর সবার জন্য আনন্দোৎসবের

স্মারক হয় এবং আপনার কুদরতি নিদর্শন বলে অভিহিত হয়। আর এর দ্বারা আপনার গায়বি রিযিকে আমাদের সফল করুন। কেননা, আপনিই সর্বোত্তম রিযিকদাতা।' এই প্রার্থনার জবাবে আল্লাহ তাআলা ওহি নাযিল করলেন, হে ইসা, তোমার প্রার্থনা গৃহীত হলো। অবশ্যই আমি তা নাযিল করবো। কিন্তু প্রকাশ থাকে যে, এই সুস্পর্শ নিদর্শন নাযিল হওয়ার পর যদি তোমাদের মধ্য থেকে কেউ আল্লাহর আদেশ লঙ্ঘন করে, তবে তাদের এমন ভয়াবহ শাস্তি প্রদান করবো, যা বিশ্বজগতের কোনো মানুষকে প্রদান করা হবে না।

কুরআন মাজিদ খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা নাযিল হওয়ার ঘটনাকে অলৌকিক বর্ণনাশৈলীর সঙ্গে উল্লেখ করেছে—

إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ () قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ () قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ () قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ (سورة المائدة)

"স্মরণ করো, হাওয়ারিগণ বলেছিলো, 'হে মারইয়াম-তনয় ইসা, তোমার প্রতিপালক কি আমাদের জন্য আসমান থেকে খাদ্যে পরিপূর্ণ খাঞ্চা প্রেরণ করতে সক্ষম?' সে বলেছিলো, 'আল্লাহকে ভয় করো, যদি তোমরা মুমিন হও।' তারা বলেছিলো, 'আমরা চাই যে, তা থেকে কিছু খাবো এবং আমাদের চিত্ত প্রশান্তি লাভ করবে। আর আমরা জানতে চাই যে, তুমি আমাদের সত্য বলেছো এবং আমরা তার সাক্ষী থাকতে চাই।' মারইয়াম-তনয় ইসা বললো, 'হে আল্লাহ, আমাদের প্রতিপালক, আমাদের জন্য আসমান থেকে খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা প্রেরণ করো; তা আমাদের ও আমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সবার জন্য হবে আনন্দোৎসব-স্বরূপ এবং তোমার পক্ষ থেকে নিদর্শন। আর আমাদেরকে জীবিকা দান করো; তুমিই তো শ্রেষ্ঠ রিযিকদাতা।' আল্লাহ বললেন, 'নিশ্চয় আমি তোমাদের কাছে তা প্রেরণ করবো; কিন্তু এরপর তোমাদের মধ্যে কেউ কুফরি

করলে তাকে এমন শাস্তি দেবো, যে-শাস্তি বিশ্বজগতের আর কাউকে দেবো না।'" [সুরা মায়িদা : আয়াত ১১২-১১৫]

খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা প্রেরিত হয়েছিলো না-কি হয় নি—এ-ব্যাপারে কুরআন কোনো বিবরণ প্রদান করে নি। কোনো মারফু হাদিসেও এর উল্লেখ পাওয়া যায় না। অবশ্য সাহাবায়ে কেরাম ও তাবিয়িন (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)-এর বক্তব্যসমূহে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়।

মুজাহিদ ও হাসান বসরি (রাহিমাহুমুল্লাহ) বলেন, খাদ্যের খাঞ্চা প্রেরিত হয় নি। কারণ আল্লাহ তাআলা শর্তের সঙ্গে খাঞ্চা প্রেরণ করা মঞ্জুর করেছিলেন। প্রার্থীরা ভাবলেন যে, মানুষের আদিমূলই দুর্বল এবং নানা ধরনের দুর্বলতার প্রতীক। পাছে এমন না হয় যে, কোনো ধরনের পদস্খলন বা কোনো সাধারণ আদেশ লঙ্ঘনের কারণে আমরা যন্ত্রণাদায় মর্মন্তুদ শাস্তির উপযুক্ত হয়ে পড়ি। এই ভেবে তাঁরা তাদের প্রার্থনা ফিরিয়ে নিলেন। তা ছাড়া, যদি খাদ্যে পরিপূর্ণ খাঞ্চা প্রেরিত হতো তবে তা ছিলো আল্লাহর বিশেষ নিদর্শন (মুজিযা) যার জন্য নাসারারা যেমন চাইতো তেমনি গর্ব করতে পারতো এবং তারা একে যতই প্রচার করতো তা অসঙ্গত হতো না। তারপরও তাদের সমাজে খাদ্যের খাঞ্চা সম্পর্কে কোনো উল্লেখই দেখা যায় না।[৮১]

হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) এবং আম্মার বিন ইয়াসির রা. থেকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এই ঘটনা ঘটেছিলো এবং খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা প্রেরিত হয়েছিলো। জমহুর উলামায়ে কেরামের ঝোঁকও এইদিকে। তবে খাঞ্চা প্রেরিত হওয়ার বিবরণে বিভিন্ন বক্তব্য রয়েছে। যেমন, খাঞ্চা কেবল একদিন প্রেরিত হয়েছিলো না-কি চল্লিশ দিন পর্যন্ত প্রেরিত হয়েছিলো? তারপর কি প্রেরিত হওয়া বন্ধ হয়েছিলো? কেনো বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো? না-কি শুধু এটা হয়েছিলো যে আর প্রেরিত হয় নি। না-কি যাদের অবধ্যাচরণের ফলে বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো তাদের ওপর ভীষণ শাস্তি এসেছিলো? যে-সকল বর্ণনাকারী বলেন যে, খাদ্যের খাঞ্চা (মায়িদা) কেবল একদিন নয়, অনবরত চল্লিশ দিন পর্যন্ত প্রেরিত হয়েছিলো, তাঁরা তা বন্ধ হওয়ার কারণ বর্ণনা করেছেন এই যে, খাদ্যের

---

[৮১] তাফসিরে ইবনে কাসির, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১১৬। কিন্তু ইউহান্নার ইঞ্জিলের ষষ্ঠ অধ্যায়ে এই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, এই ঘটনা 'ঈদে ফাসহ'-এর ক্ষেত্রে ঘটেছিলো।

খাঞ্চা প্রেরিত হওয়ার পর তাদের প্রতি নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো যে, খাঞ্চা থেকে কেবল গরিব, মিসকিন ও রুগ্‌ণ ব্যক্তিরাই খাবে; ধনী ও সুস্থ লোকেরা তা থেকে খাবে না। কিছুদিন এই নির্দেশ পালন করার পর লোকেরা ধীরে ধীরে তা লঙ্ঘন করতে শুরু করলো। অথবা এই নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো যে, সবাই খাদ্যের খাঞ্চা থেকে খাবে; কিন্তু পরের দিনের জন্য সঞ্চয় করে রাখবে না। কিছুদিন পর লোকেরা এই আদেশ লঙ্ঘন করতে শুরু করলো। তার ফল দাঁড়ালো এই যে, কেবল খাদ্যের খাঞ্চার প্রেরণই বন্ধ হলো না: বরং যারা নির্দেশ লঙ্ঘন করেছিলো তাদেরকে শূকর ও বানরের আকৃতিতে রূপান্তর করা হলো।[৮২]

যাই হোক। এসব রেওয়ায়েতে ঐক্যপূর্ণ বক্তব্যগুলোর সারমর্ম এই যে, আল্লাহ তাআলা হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম-এর প্রার্থনা মঞ্জুর করার পর আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ দেয়া হলো যে, খাদ্যের খাঞ্চা প্রস্তুত হোক। ফলে মানুষের চোখের সামনেই আল্লাহর ফেরেশতাগণ আকাশের শূন্যমণ্ডল থেকে খাদ্যের খাঞ্চা নিয়ে অবতীর্ণ হলো। একদিকে ফেরেশতাগণ খাঞ্চা নিয়ে ধীরে ধীরে নামছিলেন আর অন্যদিকে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম চূড়ান্ত বিনয় ও নম্রতার সঙ্গে আল্লাহর দরবারে হাত উঠিয়ে দোয়ায় রত ছিলেন। এ-অবস্থায় খাদ্যের খাঞ্চা এসে পৌঁছলো এবং হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম দুই রাকাত শোকরানা নামায আদায় করলেন। তারপর খাঞ্চা উন্মোচন করলেন। তাতে ভাজা মাছ, টাটকা ফল ও রুটি দেখতে পেলেন। খাঞ্চা উন্মোচন করামাত্র তার সুঘ্রাণ ছড়িয়ে পড়লো এবং লোকদেরকে মোহিত করে দিলো। হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম লোকদের নির্দেশ দিয়ে বললেন, তোমরা খাও। কিন্তু লোকেরা তাঁকে অনুরোধ জানালো : আপনি শুরু করুন। তিনি বললেন, এটা আমার জন্য আসে নি; তোমাদের আবদারের ফলে প্রেরিত হয়েছে। এই কথা শুনে লোকেরা ঘাবড়ে গেলো। তারা ভাবলো, না-জানি কী পরিণতি হয়—আল্লাহর রাসুল খাবেন না আর আমরা খাবো!

---

[৮২] খাদ্যে পরিপূর্ণ খাঞ্চা প্রেরণ করার জন্য কেবল হাওয়ারিগণই প্রার্থনা করেছিলেন, কিন্তু তা করেছিলেন সবার পক্ষ থেকে। এ-কারণে এটা জানা কথা যে, যেসব বর্ণনায় অবাধ্যাচরণ ও তার পরিণামে আযাব নাযিল হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলোর ইঙ্গিত হাওয়ারিদের মধ্য থেকে কারো প্রতি মোটেই নয়। কেননা, এমন ইঙ্গিত কুরআনের স্পষ্ট বক্তব্যের বিপরীত।

contents

কতিপয় আলেম বলেন, খাদ্যের খাঞ্চা প্রেরিত হয় নি। শাস্তির হুমকি শুনে আবদারকারীরা ভীত হয়ে পড়ে আর আবদার করে নি; কিন্তু নবীর দোয়া বিফল হয় না। আর (কুরআনে) ঘটনাটির উল্লেখ হেকমতবিহীন নয়। সম্ভবত এই দোয়ার প্রভাব এই যে, হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর উম্মত (নাসারা)-এর মধ্যে সম্পদের সচ্ছলতা সবসময় অব্যাহত থেকেছে। আর তাদের মধ্যে যারা অকৃতজ্ঞ হবে, আখেরাতে সম্ভবত তারা সবচেয়ে বেশি শাস্তির উপযুক্ত হবে। এতে মুসলমানের জন্যও উপদেশ রয়েছে যে, আল্লাহর দরবারে তার প্রার্থিত বিষয় যেনো অস্বাভাবিক উপায়ে না চায়। কেননা, তার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা খুব কঠিন। বাহ্যিক উপকরণে তৃপ্ত থাকলে সেটাই উত্তম। এই ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, আল্লাহর দরবারে সংরক্ষণ পেশ করা হয় না।[৮৫]

এই প্রসঙ্গে হযরত আম্মার বিন ইয়াসির রা. উপদেশ ও শিক্ষাগ্রহণ সম্পর্কে খুব সুন্দর কথা বলেছেন—

হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর কাছে তাঁর সম্প্রদায় খাদ্যে পরিপূর্ণ খাঞ্চা (মায়িদা) নাযিল হওয়ার আবেদন জানালো। তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে জবাব দেয়া হলো, তোমাদের আবেদন এই শর্তের সঙ্গে মঞ্জুর করা যাবে যে, তোমরা বিশ্বাসঘাতকতা করবে না, তা গোপন করে রাখবে না এবং পরের দিনের জন্য সঞ্চয় করেও রাখবে না। অন্যথায় তা বন্ধ করে দেয়া হবে এবং তোমাদেরকে এমন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া হবে যা আর কাউকেও দেয়া হবে না।

হে আরব জাতি, তোমরা তোমাদের অবস্থার প্রতি গভীরভাবে মনোনিবেশ করো যে, তোমরা উট ও বকরির পাল লেজ ধরে সেগুলোকে বনে-জঙ্গলে চরাতে। তারপর আল্লাহ তাআলা আপন করুণায় তোমাদেরই মধ্য থেকে একজন মনোনীত রাসুল প্রেরণ করেন। তাঁর বংশ সম্পর্কে তোমরা বিশেষভাবে অবগত। তিনি তোমাদেরকে এই সংবাদ প্রদান করেছেন যে, অচিরেই তোমরা অনারব জাতিগুলোর ওপর জয়লাভ করবে। তিনি তোমাদেরকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন যে, ধন-সম্পর্দের প্রাচুর্য দেখে কখনো তোমরা রুপা বা সোনার ভাণ্ডার সঞ্চয় করবে না। কিন্তু আমি আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি, বেশি সময় গত না

---

[৮৫] موضح القران, সুরা মায়িদা।

হতেই তোমরা সোনা-রুপার ভাণ্ডার সঞ্চিত করবে এবং এইভাবে তোমরা মহান আল্লাহর মর্মন্তুদ শাস্তির উপযুক্ত হয়ে পড়বে।[৮৬]

জীবিত অবস্থায় আসমানে উঠিয়ে নেয়া

হযরত ইসা আলাইহিস সালাম বিয়ে-শাদি করেন নি এবং বসবাস করার জন্য কোনো গৃহও নির্মাণ করেন নি। তিনি শহর থেকে শহরে, গ্রাম থেকে গ্রামে আল্লাহর সত্যের পয়গাম শুনাতেন। সত্য দীনের দাওয়াত ও তাবলিগের দায়িত্ব পালন করতেন। যেখানেই রাত হয়ে যেতো সেখানেই আরাম ও শান্তির সরঞ্জাম ছাড়াই রাত কাটিয়ে দিতেন। তাঁর পবিত্র সত্তা থেকে আল্লাহর বান্দাগণ দৈহিক ও আত্মিক উভয় প্রকারের আরোগ্য ও প্রশান্তি লাভ করতো। এ-কারণে তিনি যেদিকেই যেতেন সেখানেই দলে দলে মানুষ শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর কাছে সমবেত হতো এবং আবেগজর্জর ভালোবাসার সঙ্গে তাঁর জন্য উৎসর্গিত হয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত থাকতো।

এই সত্যের আহ্বানের সঙ্গে ইহুদিদের বিদ্বেষ ও শত্রুতা ছিলো। তারা ইসা আলাইহিস সালাম-এর ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তাকে চূড়ান্ত হিংসা ও চরম আশঙ্কার চোখে দেখলো। যখন তাদের বিকৃত অন্তরসমূহ কোনো ক্রমেই তা বরদাশ্‌ত করতে পারলো না তখন তাদের সরদাররা, ধর্মগুরুরা, যাজকেরা, পণ্ডিতেরা তাঁর পবিত্র সত্তার বিরুদ্ধে নানা ধরনের চক্রান্ত শুরু করলো। তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলো যে, যুগের বাদশাহকে উত্তেজিত করে এই ব্যক্তিকে শূলে চড়ানো ছাড়া তার বিরুদ্ধে সফলতা অর্জনের আর কোনো পথ দেখা যাচ্ছে না।

পূর্বের কয়েক শতাব্দী থেকে ইহুদিদের অবর্ণনীয় দুরবস্থার ফলে তৎকালে ইয়াহুদিয়া (বা ইয়াহুদা)-র বাদশাহ হিরোদিয়াস (হ্যারড)-র রাজত্ব তার পূর্বপুরুষদের (শাসনাধীন) এলাকাসমূহ থেকে চ্যুত হয়ে কোনো রকমে এক-চতুর্থাংশের ওপর টিকে ছিলো। আর সেটাও ছিলো নামেমাত্র। প্রকৃত রাজত্ব ও কর্তৃত্ব ছিলো তৎকালীন মূর্তিপূজক রোমান সম্রাট কায়সারের অধিকারে ছিলো এবং তারই প্রতিনিধি হিসেবে পন্টিয়াস

পিলাটাস (Pontius Pilatus)[৮৭] নামের এক ব্যক্তি ইয়াহুদার গভর্নর বা বাদশাহ ছিলো।

ইহুদিরা মূর্তিপূজক রোমান সম্রাট কায়সারের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বকে তাদের দুর্ভাগ্য মনে করে তাকে ঘৃণার চোখে দেখতো; কিন্তু হযরত মাসিহ আলাইহিস সালাম-এর বিরুদ্ধে তাদের অন্তরে হিংসার জ্বলন্ত আগুন আর বহু শতাব্দীব্যাপী দাসত্বের ফলে সৃষ্ট হীনমন্যতা তাদেরকে এতটাই অন্ধ করে দিয়েছিলো যে তারা পরিণাম ও পরিণতির পরোয়া না করে পিলাটাসের দরবারে পৌঁছে এবং অভিযোগ করে যে, জাহাঁপনা, এই ব্যক্তি (ইসা আলাইহিস সালাম) কেবল আমাদের জন্যই নয়, বরং আপনার রাজত্বের জন্যও হুমকি হয়ে উঠতে যাচ্ছে। যদি সহসাই তার মূলোৎপাটন না করা হয়, তবে আমাদের ধর্মও মূল অবস্থার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে না এবং আশঙ্কা হচ্ছে যে, অবশেষে আপনার হাত থেকে রাজক্ষমতাও চলে যাবে। কারণ, এই ব্যক্তি বিস্ময়কর ও অভিনব কলা-কৌশল প্রদর্শন করে সাধারণ মানুষকে তার বশীভূত করে নিয়েছে এবং সবসময় এই সুযোগের সন্ধানে রয়েছে যে, জনসাধারণের এই শক্তির সাহায্যে রোমান সম্রাট কায়সার ও আপনাকে পরাজিত করে সে নিজে বনি ইসরাইলের বাদশাহ হবে। এই লোকটি মানুষকে শুধু পার্থিব পথ থেকে ভ্রষ্ট করছে না; বরং সে আমাদের ধর্মকে বিকৃত করে ফেলেছে এবং মানুষকে বিধর্মী বানানোর কাজে তৎপর রয়েছে। সুতরাং এই ফেতনা বন্ধ করা অত্যন্ত জরুরি, যাতে ক্রমবর্ধমান অরাজকতাকে তার অঙ্কুরেই বিনাশ করে ফেলা যায়।

মোটকথা, অনেক আলোচনা ও কথাবার্তার পর পিলাটাস তাদেরকে অনুমতি দিলো, তারা যেনো ইসা আলাইহিস সালামকে গ্রেপ্তার করে এবং রাজদরবারে অপরাধী হিসেবে উপস্থিত করে। বনি ইসরাইলের সরদাররা, ধর্মগুরুরা, কাহিনরা এই ফরমান লাভ করে আনন্দে গদগদ হয়ে ওঠে এবং গর্ব ও অহঙ্কারের সঙ্গে একে অপরকে মোবারকবাদ

---

[৮৭] বিভিন্ন ভাষায় তাঁর নামের ভিন্নতা দেখা যায় : লাতিন—Pontius Pilatus; ইংরেজি— Pontius Pilate; আরবি—بيلاطس البنطي ; ফারসি— پونتيوس پيلاطس। তিনি ইয়াহুদার পঞ্চম শাসনকর্তা ছিলেন। তাঁকে বলা হতো ইয়াহুদার রোমান গভর্নর। তাঁর মৃত্যু ৩৭ খ্রিস্টাব্দে; তাঁর জন্মতারিখ জানা যায় না।

জানাতে থাকে এই বলে যে, অবশেষে আমাদের চক্রান্ত সফল হয়েছে এবং আমাদের তদবিরের তীর ঠিক লক্ষ্যস্থলেই গেঁথেছে। তারা বলতে থাকে, এখন আমাদের দরকার হলো বিশেষ সুযোগের অপেক্ষায় থাকা এবং নির্জন ও একাকী অবস্থায় তাকে এমনভাবে গ্রেপ্তার করা যাতে সাধারণ মানুষের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হতে না পারে।

ইউহান্নার ইঞ্জিলে এই ঘটনা সম্পর্কে এরূপ বলা হয়েছে—

"তারপর নেতৃস্থানীয় কাহিনগণ ও ফ্রিসিগণ সদর আদালতের লোকদেরকে একত্র করে বললো, আমরা করছি কী? এই ব্যক্তি তো অনেক নিদর্শন (মুজিযা) দেখাচ্ছে। আমরা যদি তাকে এভাবেই ছেড়ে দিই তবে সব মানুষই তার ওপর ঈমান আনবে এবং রোমানরা এসে আমাদের দেশ ও জাতি উভয়টিকে অধিকার করে নেবে। আর তাদের মধ্য থেকে কায়েফা নামের এক ব্যক্তি—যে ওই বছরের প্রধান কাহিন ছিলো—তাদেরকে বললো, তোমরা জানো না এবং চিন্তা করো না, গোটা জাতির ধ্বংস না হয়ে এক ব্যক্তির মৃত্যুই কল্যাণকর।"[৮৮]

ইহুদিরা বাদশাহর কাছে যাওয়ার আগে নিজেদের মধ্যে এসব পরামর্শই করেছিলো এবং আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছিলো যে, যদি এই ব্যক্তিকে এভাবেই ছেড়ে রাখা হয় তবে রোমান সম্রাট কায়সার নিজের রাজ্যের জন্য বিপজ্জনক ভেবে ইহুদিদের জন্য অবশিষ্ট থাকা নামেমাত্র রাজত্বেরও বিলুপ্তি ঘটিয়ে দেবে।

আর মার্কের ইঞ্জিলে আছে—

"দুইদিন পরেই ফাসহ ও ঈদুল ফিতর হওয়ার দিন ছিলো। ইহুদি জাতির নেতৃস্থানীয় ধর্মগুরু ও কাহিনেরা সুযোগ সন্ধান করছিলো কীভাবে তাকে (ইসা আলাইহিস সালাম) প্রতারণার জালে ফেলে গ্রেপ্তার করা যায়। কেননা, তারা বলছিলো, পাছে ঈদের সময় সমবেত জনতার মধ্যে বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না হয়ে পড়ে।"[৮৯]

অন্যদিকে হযরত ইসা আলাইহিস সালাম ও তাঁর হাওয়ারিদের পারস্পরিক কথাবার্তা সুরা আলে ইমরান ও সুরা সাফ্ফ-এর বরাতে উদ্ধৃত করা হয়েছে : হযরত ইসা আলাইহিস সালাম যখন ইহুদিদের

---

[৮৮] অধ্যায় ১১, আয়াত ৪৭-৫১।

[৮৯] অধ্যায় ১৩, আয়াত ১-২।

কুফরি, অবিশ্বাস ও শত্রুতামূলক ষড়যন্ত্র অনুভব করলেন, তিনি তাঁর হাওয়ারিদের এক জায়গায় সমবেত করলেন এবং তাঁদের বললেন, বনি ইসরাইলের সরদার ও কাহিনদের শত্রুতামূলক তৎপরতা তোমাদের অজ্ঞাত নয়। এখন সময়ের সঙ্কটময়তা আর কঠিন বিপদ ও পরীক্ষার আসন্নকাল এটাই দাবি করে যে, আমি তোমাদের জিজ্ঞেস করি—তোমাদের মধ্যে কে কে প্রস্তুত রয়েছে যারা কুফর ও অস্বীকারের প্লাবনের সামনে বুক উঁচু করে দাঁড়িয়ে আল্লাহ দীনের সাহায্যকারী হবে? হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর এই বরকতময় কথা শুনে সবাই উত্তেজনা ও উচ্চৈঃস্বরে এবং প্রকৃত ঈমানি প্রেরণার সঙ্গে জবাব দিলেন, আমরা রয়েছি আল্লাহর (দীনের) সাহায্যকারী, এক আল্লাহর ইবাদতকারী, আপনি সাক্ষী থাকুন আমরা মুসলমান, প্রতিজ্ঞা পূর্ণকারী। নিজেদের আনুগত্যের ওপর অটল থাকার জন্য আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করছি যে, হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা আপনার প্রেরিত কিতাবের প্রতি ঈমান এনেছি এবং সত্য অন্তঃকরণের সঙ্গে আপনার নবীর আনুগত্য করছি। হে আমাদের প্রতিপালক, আপনি আমাদেরকে সততা ও সত্যের জন্য প্রাণোৎসর্গকারী মানুষের তালিকায় লিপিবদ্ধ করুন।

হযরত ইসা আলাইহিস সালাম এবং তাঁর দাওয়াত ও তাবলিগের দায়িত্ব ও কর্তব্যের বিরুদ্ধে বনি ইসরাইলের ইহুদিদের বিরোধিতামূলক তৎপরতার অবস্থাবলির উল্লিখিত অংশের বেশির ভাগ এমন যে, কুরআন ও বাইবেলের বর্ণনায় এগুলোর মধ্যে মৌলিকভাবে কোনো বিরোধ নেই। কিন্তু তার পরের পুরো অংশের বর্ণনায় কুরআন ও বাইবেল উভয়ের পথ মৌলিকভাবে ভিন্ন ভিন্ন: তাদের মধ্যে এই পর্যায়ের বিরোধ রয়েছে যে, একটি পথকে কোনোভাবেই অন্য পথটির কাছাকাছি আনা যাবে না। অবশ্য এই জায়গায় এসে ইহুদি ও নাসারা উভয় জাতিই পারস্পরিক একমত হয় এবং উভয় জাতির বর্ণনাসমূহ ঘটনাটি সম্পর্কে একই বিশ্বাস ধারণ করে। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, ইহুদিরা এই ঘটনাকে [হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর হত্যা] তাদের কৃতিত্ব ও গৌরবের বিষয় বলে মনে করে আর নাসারারা একে বনি ইসরাইলের ইহুদিদের একটি অভিশাপযোগ্য প্রচেষ্টা বলে বিশ্বাস করে।

ইহুদি ও নাসারা উভয় জাতির যৌথ বর্ণনা এই যে, ইহুদি সরদাররা ও কাহিনরা জানতে পারলো যে, এখন ইয়াসু আলাইহিস সালাম জনতার

ভিড় থেকে আলাদা হয়ে তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে একটি রুদ্ধ জায়গায় আছেন। তারা ভাবলো এটি একটি সুবর্ণ সুযোগ। এই সুযোগ হাতছাড়া করা যায় না। সঙ্গে সঙ্গে তারা সেখানে পৌঁছে গেলো এবং চারদিক থেকে জায়গাটিকে ঘিরে রেখে হযরত ইয়াসু আলাইহিস সালামকে গ্রেপ্তার করে ফেললো। তারপর তাঁকে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করে করে পিলাটাসের দরবারে নিয়ে গেলো। যাতে সে তাঁকে শূলিতে ঝুলিয়ে দেয়। যদিও পিলাটাস ইসা আলাইহিস সালামকে নির্দোষ ভেবে মুক্ত করে দিতে চাইলো, কিন্তু বনি ইসরাইলের বিক্ষোভে বাধ্য হয়ে সিপাহিদের হাতে তাঁকে সোপর্দ করে দিলো। সিপাহিরা তাঁকে কাঁটার টুপি পরালো, মুখে থুথু দিলো, বেত্রাঘাত করলো এবং যতভাবে পারে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করে অপরাধীর মতো শূলিতে ঝুলিয়ে দিলো। তাঁর হাত দুটিতে পেরেক মেরে দিলো এবং বর্শার ফলা দিয়ে বুক ফেড়ে দিলো। এমন নিঃসহায় অবস্থায় তিনি প্রাণ ত্যাগ করলেন এই কথা বলে, ایلی ایلی لما سبقتنی 'হে আল্লাহ, হে আল্লাহ, আপনি কেনো আমাকে একাকী ও নিঃসঙ্গ অবস্থায় পরিত্যাগ করলেন?'

ম্যাথুর ইঞ্জিলে এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নবর্ণিত শব্দমালায় উল্লেখ করা হয়েছে—

"প্রধান কাহিন তাঁকে বললো, 'আমি তোমাকে চিরঞ্জীব প্রভুর দোহাই দিয়ে বলছি, যদি তুমি খোদার পুত্র মাসিহ হও, তবে আমাদেরকে বলে দাও।' ইয়াসু (আলাইহিস সালাম) তাকে বললেন, 'তুমি নিজেই বলে দিয়েছো। বরং আমি তোমাকে সত্য বলছি যে, এরপর তোমরা আদমের পুত্রকে সবসময় শর্বশক্তিমান (আল্লাহ)-এর ডানপাশে উপবিষ্ট দেখবে এবং আকাশের মেঘমালার ওপর আসতে দেখবে।' এ-কথা শুনে প্রধান কাহিন তাঁর পরনের কাপড় ছিঁড়ে ফেললো এই বলে যে, 'এ তো কুফরি করেছে; এখন আমাদের আর সাক্ষীর প্রয়োজন কী থাকলো? (হে উপস্থিত জনতা,) দেখো, তোমরা এইমাত্র তার কুফরি-উক্তি শুনলে। বলো, তোমাদের কী অভিমত?' তারা জবাব দিলো, 'সে তো মৃত্যুদণ্ডের উপযুক্ত।' এরপর তারা তাঁর মুখে থুথু ছিটিয়ে দিলো, তাঁকে ঘুষি মারলো, কেউ কেউ চড় মারলো। তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার নবওত দ্বারা আমাদের বলো, তোমাকে কে মেরেছে?'....... যখন সকাল

হলো, প্রধান কাহিনেরা ও সম্প্রদায়ের নেতারা মিলে ইয়াসুর বিরুদ্ধে পরামর্শ করলো যে, তাঁকে হত্যা করে ফেলা হোক। তারপর তাঁকে বেঁধে গভর্নর পিলাটাসের হাতে সোপর্দ করে দিলো।...... গভর্নরের রীতি ছিলো এই : ঈদের দিন সে লোকদের (বনি ইসরাইলের) খাতিরে তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী একজন কয়েদিকে মুক্ত করে দিতো। সে-সময় বার্‌রাবা নামের এক বিখ্যাত কয়েদি ছিলো। যখন তারা সমবেত হলো, পিলাটাস তাদের বললো, তোমরা কাকে চাও যে আমি তোমাদের খাতিরে তাকে মুক্ত করে দিই—বার্‌রাবাকে না-কি ইয়াসুকে, যাকে মাসিহ বলা হয়? তারা বললো, আমরা বার্‌রাবার মুক্তি চাই। পিলাটাস তাদের জিজ্ঞেস করলো, তাহলে ইয়াসু নামের কথিত মাসিহকে কী করবো? সবাই বলে উঠলো, তাকে শূলিবিদ্ধ করা হোক। পিলাটাস বললো, কেনো, সে কী অপরাধ করেছে? কিন্তু তারা (এই প্রশ্নের জবাব না দিয়ে) চিৎকার করে বলতে লাগলো, তাকে শূলিবিদ্ধ করা হোক। পিলাটাস দেখলো যে, কিছুতেই কিছু হচ্ছে না; বরং গোলমাল বেড়ে চলছে। তখন সে পানি নিয়ে লোকদের সামনে তার হাত ধৌত করলো এবং বললো, আমি এই ভালো মানুষটির খুন থেকে পবিত্র, তোমরা জানো। লোকেরা সবাই জবাব দিয়ে বললো, তার খুন (-এর ভার) আমাদের ও আমাদের সন্তানদের ঘাড়ে থাকবে। এরপর পিলাটাস তাদের খাতিরে বার্‌রাবাকে মুক্ত করে দিলো এবং ইয়াসুকে বেত্রাঘাত করে তাদের হাতে সোপর্দ করে দিলো যাতে তাঁকে শূলিবিদ্ধ করা হয়। গভর্নরের সিপাহিরা ইয়াসুকে দুর্গের মধ্যে নিয়ে গিয়ে গোটা সেনাদলকে তাঁর চারপাশে সমবেত করলো। তাঁর পোশাক খুলে ফেলে তাঁকে শূলির আলখাল্লা পরালো। কাঁটার মুকুট বানিয়ে তাঁর মাথার ওপর রাখলো। একটি লাঠি তাঁর ডান হাতে দিলো এবং তাঁর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে তিরস্কার করতে লাগলো (এই কথা বলে) যে, হে ইহুদিদের বাদশাহ, সম্মান! এই বলে তাঁর ওপর থুথু নিক্ষেপ করলো এবং তাঁর হাত থেকে ওই লাঠি নিয়ে তাঁর মাথায় আঘাত করতে লাগলো। তাঁকে তিরস্কার করা শেষ করে তাঁর দেহ থেকে ওই আলখাল্লা খুলে ফেললো এবং পুনরায় তাঁর পোশাক তাঁকে পরিয়ে দিলো। তারপর শূলিতে চড়ানোর জন্য নিয়ে গেলো। সেই সময় তাঁর সঙ্গে দুজন ডাকাতকেও শূলিতে চড়ানো হলো; একজনকে তার ডানদিকে, অন্যজনকে তাঁর বামদিকে। পথিকেরা মাথা

নেড়ে নেড়ে তাঁকে তিরস্কার ও অভিসম্পাৎ করতো এবং বলতো, হে মুকাদ্দাসের ধ্বংসকারী এবং তিন দিনে পুনর্নির্মাণকারী, এখন নিজেকে রক্ষা করো; যদি তুমি আল্লাহর পুত্র হয়ে থাকো তবে শূলি থেকে নেমে আসো। একইভাবে প্রধান কাহিনও ধর্মগুরু ও নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মিলে বিদ্রূপের সঙ্গে বলতে লাগলো, সে অন্য লোকদেরকে রক্ষা করেছে, এখন নিজেকে আর রক্ষা করতে পারছে না। দ্বিপ্রহর থেকে শুরু করে তৃতীয় প্রহর পর্যন্ত গোটা দেশ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে থাকলো। তৃতীয় প্রহরের নিকটবর্তী সময়ে ইয়াসু উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করে বললেন, ايلى ايلى لما سبقتنى 'হে প্রভু, হে প্রভু, আপনি কেনো আমাকে একাকী ও নিঃসঙ্গ অবস্থায় পরিত্যাগ করলেন?' ওখানে যারা দাঁড়িয়েছিলো তারা এ-কথা শুনে বললো, সে ইলিয়াকে ডাকছে....... এরপর ইয়াসু উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করলেন এবং প্রাণ ত্যাগ করলেন।"[৯০]

বিবরণে কমবেশি ভিন্নতা থাকলেও এই কল্পিত কাহিনি অবশিষ্ট তিনটি ইঞ্জিলেও বিদ্যমান। চারটি ইঞ্জিলের এই ঐকমত্য, কিন্তু কল্পিত কাহিনিটি পাঠ করার পর মনের ভেতর স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া এই হয় যে, হযরত মাসিহ আলাইহিস সালাম-এর মৃত্যু অত্যন্ত নিঃসহায় ও নিঃস্ব অবস্থায় যন্ত্রণাদায়কভাবে হয়েছিলো। আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের জন্য এটা কোনো অভিনব বা অভূতপূর্ব বিষয় নয়; বরং আল্লাহর কাছে সান্নিধ্যপ্রাপ্ত বুযর্গ ব্যক্তিগণ আবহমানকাল থেকেই এ-জাতীয় কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে আসছেন। কিন্তু এই ঘটনার এই অংশ তার কল্পিত ও মনগড়া হওয়ার ব্যাপারে দিবালোকের মতো সাক্ষ্য প্রদান করছে যে, হযরত ইয়াসু আলাইহিস একজন উচ্চ মর্যাদার নবী, সৎ মানুষের মতো এই অবস্থাকে ধৈর্য ও আল্লাহর সন্তুষ্টির সঙ্গে গ্রহণ তো করেনই নি; বরং চরম নৈরাশ্যগ্রস্ত মানুষের মতো আল্লাহর বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে করতে প্রাণ ত্যাগ করেছেন। ايلى ايلى لما سبقتنى বলে প্রাণ ত্যাগ করা নৈরাশ্য ও অভিযোগ প্রকাশের এমন অবস্থা যাকে কোনোভাবেই হযরত মাসিহ আলাইহিস সালাম-এর শানের উপযুক্ত বলা যেতে পারে না। আর ঘটনার এই অংশটাও কম বিস্ময়কর নয় যে, ইঞ্জিলের বর্ণনা থেকে

[৯০] অধ্যায় ২৬, আয়াত ৫৭-৭৫।

বুঝায় যায় এই ঘটনার পূর্বে ইয়াসু মাসিহ তিন বার আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, হে পিতা, যদি সম্ভব হয় তবে (মৃত্যুর) এই পেয়ালা আমার উপর থেকে সরিয়ে নেয়া হোক। যখন তাঁর এই প্রার্থনা কোনোক্রমেই গৃহীত হলো না তখন নিরাশ হয়ে তাঁকে বলতেই হলো, যদি এই পেয়ালা পান করা ছাড়া আমার ওপর থেকে সরানো সম্ভবই না হয়, তবে আপনার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।"

বিস্ময়কর ব্যাপার হলো এই যে, যখন 'প্রায়শ্চিত্ত' (কাফ্ফারা)-এর বিশ্বাস[৯১] অনুসারে হযরত মাসিহ আলাইহিস সালাম-এর এই কর্মটি ছিলো খোদা ও তাঁর পুত্রের (নাউযুবিল্লাহ) মধ্যে একটি স্থিরীকৃত বিষয়। তবে তাঁর এমন প্রার্থনার অর্থ কী? আর যদি তা অপরিহার্য মানবিক গুণাবলির প্রেক্ষিতে তা হয়ে থাকে তবে খোদার মর্জি জেনে নেয়া এবং সে-ব্যাপারে সন্তুষ্টি প্রকাশ করার পর এমন অধৈর্য ও নিরাশাগ্রস্ত মানুষের মতো প্রাণত্যাগ করার কারণ কী?

ইহুদিদের মনগড়া এই কাহিনিকে নাসারাগণ স্বীকার করে নিয়েছে। ফলে ইহুদিরা গর্ব ও অহঙ্কারের সঙ্গে এ-ব্যাপারে অত্যন্ত উল্লসিত হয়ে উঠেছে এবং বলছে যে, নাসেরি মাসিহ (যিশুখ্রিস্ট) যদি (খোদার) 'প্রতিশ্রুত মাসিহ' হতো তবে খোদা তাআলা তাকে এমন নিঃস্ব ও অসহায় অবস্থায় আমাদের হাতে তুলে দিতেন না। সে মৃত্যু পর্যন্ত খোদার কাছে ফরিয়াদ করতে থাকলো যে, আমাকে বাঁচাও, আমাকে রক্ষা করো। কিন্তু খোদা তার কোনো কথাই শুনলেন না, তাকে সাহায্যও করলেন না। আর আমাদের পূর্বপুরুষেরা তখনো তাকে যথেষ্ট উত্তেজিত করে তুলছিলো এই বলে যে, যদি তুমি সত্য সত্যই খোদার পুত্র ও প্রতিশ্রুত মাসিহ হয়ে থাকো তবে খোদা কেনো তোমাকে আমাদের হাতে এমন লাঞ্ছনা ও অপদস্থতা থেকে রক্ষা করছেন না?

ঘটনা এই যে, নাসারাদের কাছে এই হৃদয়বিদারক অপবাদের কোনো জবাব ছিলো না। আর ঘটনার উল্লিখিত বিবরণ মেনে নেয়ার পর কাফ্ফারা বা প্রায়শ্চিত্তমূলক বিশ্বাসের কোনো মূল্যই অবশিষ্ট থাকে না।

---

[৯১] খ্রিস্টানরা বিশ্বাস করে যে, যিশুখ্রিস্ট শূলিবিদ্ধ হয়ে প্রাণ ত্যাগ করার মধ্য দিয়ে মানবজগতের যাবতীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছেন।

এ-কারণে তারা ঘটনার উল্লিখিত বিবরণের পর আরো এক প্রস্থ বর্ণনা/বিবৃতি যোগ করে নিলো। ইউহান্নার ইঞ্জিলে বলা হয়েছে—

"কিন্তু যখন তারা ইয়াসুর কাছে এসে দেখলো যে তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন তখন তারা তাঁর পা দুটি ভাঙলো না; কিন্তু তাদের মধ্য থেকে জনৈক সিপাহি বর্শার আঘাতে তাঁর পাঁজর ছেদ করে দিলো এবং সঙ্গে সঙ্গে তা থেকে রক্ত ও পানি বের হতে লাগলো .... এসব বিষয়ের পর আরমিলিতার অধিবাসী ইউসুফ—যিনি ইয়াসুর শিষ্য ছিলেন—ইহুদিদের ভয়ে অতি গোপনে পিলাটাসের কাছে অনুমতি চাইলেন যে, 'আমি ইয়াসুর মৃতদেহ নিয়ে যেতে পারি কি?' পিলাটাস অনুমতি দিলেন। ফলে ইউসুফ ইয়াসুর মৃতদেহ নিয়ে গেলেন। নেকদিমাসও এলেন, যিনি ইতোপূর্বে ইয়াসুর কাছে রাতের বেলা গিয়েছিলেন। তিনি প্রায় ৫০ সের মুর ও উদ (সুগন্ধি কাঠ)-এর মিশ্রণ নিয়ে এলেন। এরপর তাঁরা ইয়াসুর মৃতদেহ সুতি কাপড়ে সুগন্ধি দ্রব্যের সঙ্গে কাফন পরালেন, যেভাবে কাফন পরানোর প্রথা ইহুদিদের মধ্যে প্রচলিত আছে। আর যে-জায়গায় তাঁকে শূলিবিদ্ধ করা হয়েছিলো সেখানে একটি বাগান ছিলো। এই বাগানে একটি নতুন কবর ছিলো, যাতে কখনো কোনো মৃতদেহ দাফন করা হয় নি। ইহুদিদের প্রস্তুতি-দিবসের কারণে তাঁরা ইয়াসুর মৃতদেহকে ওই কবরেই রেখে দিলেন। সপ্তাহের প্রথম দিবসে মারইয়াম মাগদালিনি অতি ভোরে—তখনো অন্ধকারই ছিলো—কবরের কাছে এলেন এবং দেখলেন যে, কবরের উপর থেকে পাথর সরানো অবস্থায় রয়েছে। তারপর তিনি শামাউন পিটার্স ও ইয়াসুর অন্যান্য প্রিয় শিষ্যের কাছে দৌড়ে গেলেন এবং তাদেরকে বললেন, 'খোদাওয়ান্দকে কবর থেকে তুলে নিয়ে গেছে এবং আমি জানি না তাঁকে কোথায় রাখা হয়েছে........' কিন্তু মারইয়াম বাইরে কবরের কাছে দাঁড়িয়ে কাঁদছিলেন। কাঁদতে কাঁদতে যখন কবরের দিকে ঝুঁকে ভেতরে তাকালেন, দেখলেন যে, যেখানে ইয়াসুর মৃতদেহ রক্ষিত ছিলো সেখানে সাদা পোশাক পরিহিত দুজন ফেরেশতা—তাঁদের একজন মাথার কাছে উপবিষ্ট, অন্যজন পায়ের কাছে উপবিষ্ট। ফেরেশতারা মারাইয়ামকে বললেন, 'হে নারী, তুমি কেনো কাঁদছো?' তিনি তাদেরকে বললেন, 'কাঁদছি এইজন্য যে, আমার খোদাওয়ান্দকে কবর থেকে উঠিয়ে নিয়ে গেছে এবং আমি জানি না তাঁকে কোথায় রাখা হয়েছে।' এই কথা বলে

بیں تفاوت رہ از کجاست تابہ کجا

"সুতরাং, দেখুন ব্যবধান কতটুকু!"

যাই হোক। প্রকৃত ঘটনা ছিলো অন্যরকম এবং দীর্ঘকাল পরে কাফ্‌ফারার আকিদা বা প্রায়শ্চিত্ত-কেন্দ্রিক বিশ্বাসের অবতারণা খ্রিস্টান জাতিকে ইহুদিদের বানোয়াট কাহিনির বিরুদ্ধে উল্লিখিত রূপকথা সৃষ্টি করতে বাধ্য করলো। এ-কারণে কুরআন মাজিদ হযরত মারইয়াম আলাইহি সালাম ও হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্য ঘটনাবলির মতো এই ঘটনা থেকেও অজ্ঞতা ও অন্ধকারের পর্দা দূরীভূত করে দিয়ে বাস্তব অবস্থার আলোকিত দিকটিকে প্রকাশ করে দেয়া জরুরি মনে করলো। কুরআন তার ওই কর্তব্য পালন করলো যাকে বিশ্বের ধর্মসমূহের ইতিহাসে কুরআনের 'দাওয়াতে তাজদিদ ও ইসলাহ' বলা হয়।

কুরআন বলছে, যে-যুগে বনি ইসরাইল সত্যনবী ও আল্লাহর রাসুল (ইসা বিন মারইয়াম আলাইহিস সালাম)-এর বিরুদ্ধে গোপনীয় চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রে তৎপর ছিলো এবং তাতে গর্ববোধ করতো, সে-যুগে মহান আল্লাহর ফয়সালা ও তাকদিরের বিধান এই সিদ্ধান্ত জারি করে দিলো যে, 'কোনো ক্ষমতা বা বিরুদ্ধ শক্তি ঈসা ইবনে মারইয়ামের (আলাইহিমাস সালাম) কোনো ক্ষতি করতে পারবে না এবং আমার সুদৃঢ় কার্যবিধান তাকে শত্রুদের সবধরনের ষড়যন্ত্র থেকে সুরক্ষিত রাখবে।' তার ফল দাঁড়ালো এই যে, বনি ইসরাইল যখন তাঁর ওপর আঘাত হানলো তখন আল্লাহ তাআলার নবীর বিরুদ্ধে তারা কিছুতেই সক্ষমতা লাভ করতে পারলো না এবং তাঁকে সম্পূর্ণ নিরাপত্তার সঙ্গে আসমানে উঠিয়ে নেয়া হলো। বনি ইসরাইল যখন ওই জায়গায় প্রবেশ করলো, সার্বিক অবস্থা তাদের গোলক ধাঁধায় ফেলে দিলো। তারা অপমান ও অপদস্থতার সঙ্গে তাদের উদ্দেশ্য সাধনে বিফল হলো। এইভাবে আল্লাহ তাআলা ইসা ইবনে মারইয়ামকে সুরক্ষিত রাখার জন্য যে-প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা পূর্ণ করে দেখালেন।

উল্লিখিত সংক্ষিপ্ত বর্ণনার বিস্তারিত বিবরণ এই যে, যখন ইসা আলাইহিস সালাম অনুভব করলেন যে, বনি ইসরাইলের কুফরি ও অবিশ্বাসমূলক

তৎপরতা মারাত্মক পর্যায়ে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তারা তাঁকে লাঞ্ছিত, অপদস্থ, বরং হত্যা করার জন্য চক্রান্ত চালাচ্ছে। তখন তিনি বিশেষভাবে একটি জায়গায় তাঁর হাওয়ারিদের একত্র করলেন এবং তাঁদের সামনে তাঁর অবস্থার চিত্র পেশ করলেন। তাঁদের বললেন, 'পরীক্ষার সময় মাথার ওপর এসে পড়েছে। এখন কঠিন পরীক্ষার সময়। সত্যকে বিলুপ্ত করে দেয়ার জন্য সবধরনের চাক্রান্ত পূর্ণতা লাভ করেছে। এখন আমি তোমাদের মধ্যে আর বেশিদিন থাকবো না। এ-কারণে আমার পরে সত্যধর্মের ওপর সুদৃঢ় থাকা, তার উন্নতি, প্রচার-প্রসার ও সাহায্য-সহযোগিতার ব্যাপারগুলো শুধু তোমাদের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট থাকবে। সুতরাং আমাকে বলো, আল্লাহ তাআলার পথে খাঁটি সাহায্যকারী তোমাদের কে কে আছ?' হাওয়ারিগণ এই সত্যবাণী শুনে বললেন, 'আমরা সবাই আল্লাহর দীনের সাহায্যকারী আছি। আমরা সত্য অন্তর দিয়ে আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি এবং আমাদের ঈমানের সত্যতা ও একনিষ্ঠতার ব্যাপারে আপনাকে সাক্ষী বানাচ্ছি।' এ-কথাগুলো বলার পর মানবিক দুর্বলতার প্রেক্ষিতে তাদের দাবি পেশ করেই ক্ষান্ত হলেন না; বরং আল্লাহর দরবারে হাত তুলে দোয়া করলেন : 'হে আল্লাহ, আমরা যা-কিছু বলছি তার ওপর অটল থাকার জন্য আমাদেরকে তাওফিক দিন এবং আমাদেরকে আপনার দীনের সাহায্যকারীদের তালিকাভুক্ত করে নিন।'

এদিক থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে হযরত ইসা আলাইহিস সালাম তাঁর দাওয়াত ও নসিহতের দায়িত্ব পালন করে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অপেক্ষায় থাকলেন যে, দেখা যাক বিরোধীদের তৎপরতা কী আকার ধারণ করে এবং মহান আল্লাহর কী সিদ্ধান্ত প্রকাশ পায়। আল্লাহ তাআলা এ-ব্যাপারে কুরআনের দ্বারা ইহুদি ও নাসারাদের ভ্রান্ত ধারণা ও কল্পনার বিরুদ্ধে ইলম ও ইয়াকিনের আলো প্রদান করে এটাও বলে দিয়েছেন যে, যে-সময় বিরোধীরা তাদের গোপনীয় চক্রান্তে তৎপর ছিলো, তখন আমিও আমার পূর্ণ ক্ষমতার গোপনীয় কর্মপদ্ধতি দ্বারা এই ফয়সালা করে ফেলেছি যে, ইসা ইবনে মারইয়ামের বিরুদ্ধে সত্যের শত্রুদের ষড়যন্ত্রের কোনো অংশই সফল হতে দেয়া হবে না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলার পূর্ণ ক্ষমতার গোপনীয় কৌশলের বিরুদ্ধে কারো কোনো প্রচেষ্টা কার্যকর হবে না। কারণ তাঁর কৌশলের চেয়ে উত্তম কোনো প্রচেষ্টা হতেই পারে না।

وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ

"আর তারা (ইহুদিরা ইসা আলাইহিস সালাম-এর বিরুদ্ধে) চক্রান্ত করেছিলো আর আল্লাহও (ইহুদিদের গোপনীয় চক্রান্তের বিরুদ্ধে) কৌশল করেছিলেন; আল্লাহ কৌশলীদের শ্রেষ্ঠ (সর্বোত্তম গোপনীয় কৌশলের অধিকারী)।"[৯৩]

আরবি ভাষায় مكر শব্দের অর্থ গোপনীয় প্রচেষ্টা (বা প্রতারণা করা)। অলঙ্কারশাস্ত্রের مشاكلة 'সমরূপ শব্দে প্রত্যুত্তর করা'-এর নিয়ম অনুযায়ী যদি কোনো ব্যক্তি কারো জবাবে বা আত্মপক্ষ সমর্থনে গোপনীয় প্রচেষ্টা ব্যয় করে, তবে তার গোপনীয় প্রচেষ্টা সদাচার ও ধর্মের দৃষ্টিকোণ থেকে যতই উত্তম হোক না কেনো, তাকেও مكر শব্দেই ব্যক্ত করা হয়ে থাকে। যেমন প্রত্যেক ভাষায় 'মন্দের বদলা মন্দ' বলে প্রবাদ প্রচলিত আছে। অথচ প্রতিটি মানুষই এই বিশ্বাস রাখে যে, মন্দ ব্যবহারকারীর প্রত্যুত্তরে সেই পরিমাণ মন্দ ব্যবহারে জবাব দেয়া চরিত্র ও ধর্ম কোনোটির দৃষ্টিতেই 'মন্দ' নয়। তারপরও ব্যক্ত করার সময় দুটিকে একইরূপে প্রকাশ করা হয়। আর এটিকেই অলঙ্কারশাস্ত্রে مشاكلة বলা হয়।

মোটকথা, গোপনীয় প্রচেষ্টা উভয় পক্ষ থেকে হচ্ছিলো : একদিকে ইতর বান্দাদের নিকৃষ্ট চক্রান্ত আর অন্যদিকে সেটা প্রতিহত করার জন্য মহান আল্লাহর গোপনীয় ও উত্তম কৌশল। তা ছাড়া, একদিকে সর্বশক্তিমানের পূর্ণ গোপনীয় কৌশল ছিলো, যাতে কোনো খুঁত বা ত্রুটি থাকার সম্ভাবনা ছিলো না আর অপরদিকে ছিলো ধোঁকা ও প্রতারণার ত্রুটিজর্জর চক্রান্ত, যা হয়ে পড়েছিলো মাকড়সার জাল।

অবশেষে সেই সময় এসে পৌছলো। বনি ইসরাইলের নেতারা, কাহিনেরা, ধর্মগুরুরা হযরত ইসা আলাইহিস সালামকে একটি আবদ্ধ জায়গায় চারদিক থেকে ঘিরে ফেললো। ইসা আলাইহিস সালাম-এর পবিত্র সত্তা ও তাঁর হাওয়ারিগণ জায়গাটির ভেতরে রুদ্ধ হয়ে পড়লেন। শত্রুরা চারদিক থেকে বেষ্টনি দিয়ে থাকলো। কাজেই স্বাভাবিকভাবে এই প্রশ্নের উদয় হয় যে, এখন শত্রুদের ব্যর্থ হওয়ার কী উপায় হতে পারে

[৯৩] সুরা আলে ইমরান : আয়াত ৫৪।

এবং কীভাবে তারা কিছুতেই হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর ক্ষতি করতে না পারে, যাতে মহান আল্লাহর ইসা আলাইহিস সালামকে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি ও তাঁর কৌশল সর্বোত্তম হওয়ার দাবি পূর্ণ হতে পারে। এই প্রশ্নের জবাবে কুরআন বলেছে, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয়েছে এবং তাঁর সর্বোত্তম প্রচেষ্টা ইসা আলাইহিস সালামকে শত্রুদের শত্রুদের হাত থেকে সার্বিকভাবে সুরক্ষিত রেখেছে। তার পন্থা হয়েছিলো এই যে, সেই সঙ্কটপূর্ণ মুহূর্তে ইসা আলাইহিস সালাম-এর কাছে ওহি এলো—ইসা, ভয় করো না, তোমার মুদ্দত পূর্ণ করা হবে, (অর্থাৎ, শত্রুরা তোমাকে হত্যা করতে পারবে না এবং এখন তোমার মৃত্যুর সঙ্গে সাক্ষাতও ঘটবে না।) আমি তোমাকে নিজের দিকে (ঊর্ধ্বজগতে) উঠিয়ে নেবো এবং কাফেরদের থেকে তোমাকে সার্বিকভাবে পবিত্র রাখবো। (অর্থাৎ, তারা কোনোক্রমেই তোমাকে কব্জা করতে পারবে না।) আর তোমার অনুসারীদেরকেও এই কাফেরদের বিরুদ্ধে সবসময় জয়ী রাখবো। (সবসময় মুসলিম ও ইসায়ি জাতি বনি ইসরাইলের বিরুদ্ধে কিয়ামত পর্যন্ত প্রবল থাকবে। কখনো তারা এই দুই জাতির ওপর শাসনক্ষমতা লাভ করতে পারবে না।) তারপর (মৃত্যুর পর) সবাইকে আমার কাছে ফিরে আসতে হবে। তখন আমি যেসব বিষয়ে তোমরা একে অপরের সঙ্গে মতভেদ করতে সেগুলো মীমাংসা করে দেবো।

এই কথাগুলো কুরআনে বর্ণিত হয়েছে এভাবে—

إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (سورة آل عمران)

"স্মরণ করো, যখন আল্লাহ বললেন, 'হে ইসা, আমি তোমার কাল পূর্ণ করছি এবং তোমাকে আমার কাছে তুলে নিচ্ছি এবং (বনি ইসরাইলের) যারা কুফরি করেছে তাদের থেকে তোমাকে পবিত্র করছি। আর তোমার অনুসারীদেরকে কেয়ামত পর্যন্ত কাফেরদের ওপর প্রাধান্য দিচ্ছি, অতঃপর আমার কাছে তোমাদের প্রত্যাবর্তন। তারপর যে বিষয়ে তোমাদের মতান্তর ঘটছে আমি তা মীমাংসা করে দেবো।'" [সূরা আলে ইমরান : আয়াত ৫৫]

وإذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ (سورة المائدة)

"(কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা হযরত ইসা আলাইহিস সালামকে তাঁর অনুগ্রহসমূহ স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলবেন, হে মারইয়াম-তনয় ইসা, স্মরণ করো,) আমি তোমার থেকে বনি ইসরাইলকে (তাদের পাকড়াও ও হত্যা করার ষড়যন্ত্রকে) নিবৃত্ত রেখেছিলাম; তুমি যখন তাদের কাছে স্পষ্ট নিদর্শন এনেছিলে তখন তাদের মধ্যে যারা কুফরি করেছিলো তারা বলছিলো, 'এটা তো স্পষ্ট জাদু।'" [সুরা মায়িদা : আয়াত ১১০]

তো এখন যখন হযরত ইসা আলাইহিস সালামকে আশ্বস্ত করে দেয়া হলো যে, এমন কঠিন ঘেরাও সত্ত্বেও শত্রুরা তোমাকে হত্যা করতে পারবে না এবং তোমাকে অদৃশ্য হাত উর্ধ্বজগতের দিকে তুলে নিয়ে যাবে এবং এইভাবে তোমাকে দীনের শত্রুদের অপবিত্র হাত থেকে সার্বিকভাবে সুরক্ষা দেয়া হবে, তখন এখানে আরেকটি প্রশ্নের উদয় হয় : এটা কীভাবে হলো এবং ঘটনাটি কীরূপে ঘটেছিলো? কেননা, ইহুদি ও নাসারারা তো বলে মাসি আলাইহিস সালামকে শূলিবিদ্ধ করা হয়েছিলো এবং হত্যা করা হয়েছিলো। সুতরাং কুরআন বলে দিয়েছে যে, ইসা ইবনে মারইয়াম (আলাইহিমাস সালাম)-এর শূলিবিদ্ধ করা ও হত্যার ঘটনাটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত এবং মিথ্যা। বরং প্রকৃত ব্যাপার এই যে, মাসিহ আলাইহিস সালামকে জীবিত অবস্থায় উর্ধ্বজগতের দিকে তুলে নেয়ার পর শত্রুর দল যখন ওই জায়গায় প্রবেশ করলো, অবস্থার প্রেক্ষিতে তারা গোলক ধাঁধায় পতিত হলো। তারা কোনোভাবেই বুঝতে পারলো না যে, মাসিহ আলাইহিস সালাম এই জায়গা থেকে কোথায় চলে গেছেন।

কুরআন মাজিদ নিম্নবর্ণিত আয়াতে এই ঘটনা উল্লেখ করেছে—

وقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللّٰهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا () بَلْ رَفَعَهُ اللّٰهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (سورة النساء)

"আর (ইহুদিদেরকে অভিশপ্ত সাব্যস্ত করা হয়েছে) তাদের 'আমরা আল্লাহর রাসুল মারইয়াম-তনয় ইসা মাসিহকে হত্যা করে ফেলেছি' উক্তির জন্য। অথচ তারা তাকে হত্যা করে নি, ক্রুশবিদ্ধও করে নি; কিন্তু (আল্লাহর গোপনীয় কৌশলের ফলে) তাদের এরূপ বিভ্রম ঘটেছিলো। যারা তার (মাসিহ আলাইহিস সালাম) সম্পর্কে মতভেদ করেছিলো তারা নিশ্চয় এই সম্পর্কে সন্দিগ্ধ ছিলো; এই সম্পর্কে (ধারণা ও) অনুমানের অনুসরণ ব্যতীত তাদের কোনো জ্ঞানই ছিলো না। এটা নিশ্চিত যে, তারা তাকে হত্যা করে নি; বরং আল্লাহ তাকে তাঁর কাছে তুলে নিয়েছেন এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" [সুরা নিসা : আয়াত ১৫৬-১৫৭]

কুরআন ইসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে ইহুদি ও নাসারাদের সৃষ্ট রূপকথার বিরুদ্ধে এই বক্তব্য প্রদান করেছে। এখন তাওরাত ও কুরআন উভয়ের বর্ণনাই আপনাদের সামনে রয়েছে। আর ন্যায় ও ইনসাফের পাল্লা আপনাদের হাতে। প্রথমে হযরত মাসিহ আলাইহিস সালাম-এর ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর দাওয়াত ও হেদায়েতের মিশনকে ঐতিহাসিক তথ্যাবলির আলোকে জেনে নিন। তারপর আরো একবার ওইসব বিশদ ঘটনার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন যা একজন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নবী, আল্লাহর দরবারে নৈকট্যপ্রাপ্ত, (নাসারাদের বাতিল আকিদা অনুযায়ী আল্লাহর পুত্র)-কে আল্লাহর সিদ্ধান্তের সামনে হতাশ, উদ্বিগ্ন, আশ্রয়হীন ও নিঃসহায় এবং আল্লাহর দরবারে অভিযোগ উত্থাপনকারীরূপে প্রকাশ করছে। সঙ্গে সঙ্গে এই পরস্পরবিরোধী বর্ণনাতেও মনোযোগ দিন যে, একদিকে 'কাফ্ফারার আকিদা'র ভিত্তি শুধু এটার ওপর প্রতিষ্ঠিত যে, হযরত ইসা মাসিহ আলাইহিস সালাম আল্লাহর পুত্র হয়ে এসেছেন, তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য ছিলো শূলিবিদ্ধ হয়ে প্রাণত্যাগ করে মানবজগতের যাবতীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা। অপরদিকে মাসিহ আলাইহিস সালামকে শূলিতে চড়ানো ও হত্যা করার কাহিনিকে এই ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে যে, যখন প্রতিশ্রুত মুহূর্ত এসে পৌছায় তখন আল্লাহর এই কথিত পুত্র তাঁর স্বরূপ ও পৃথিবীতে তাঁর অস্তিত্বকে একেবারে বিস্মৃত হয়ে ايلى ايلى لما سبقتنى 'হে প্রভু, হে প্রভু, আপনি কেনো আমাকে পরিত্যাগ করলেন?'-এর হতাশাজনক বাক্যটি মুখে উচ্চারণ করে আল্লাহর মর্জির বিরুদ্ধে তাঁর অসন্তোষ ও ক্ষোভ প্রকাশ করেন। এখানে

কেউ কি এমন প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারে না যে, যদি নাসারাদের বিবরণের উভয় অংশ অভ্রান্ত ও নির্ভুল হয়ে থাকে, তবে তাদের মধ্যে এই পরস্পরবিরোধিতা কেনো এবং এই অনৈক্যের অর্থ কী?
সুতরাং, যদি একজন সূক্ষ্মতত্ত্ববিদ ও দূরদর্শী মানুষ এসব দিককে সামনে রেখে ঘটনাবলির ও অবস্থাসমূহের বিক্ষিপ্ত বিবরণকে সংযুক্ত করে অনুধাবন করেন, তবে তিনি সত্যকে উপলব্ধি করার প্রেক্ষিতে দ্বিধাহীন চিত্তে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন যে, বাইবেলে উল্লেখিত কাহিনিসমূহ পরস্পরবিরোধী এবং সম্পূর্ণ মনগড়া। আর কুরআন এ-ব্যাপারে যে-ফয়সালা প্রদান করেছে তা-ই সত্য ও সততার ওপর প্রতিষ্ঠিত।
ইতিহাস সাক্ষী রয়েছে যে, হযরত মাসিহ আলাইহিস সালাম-এর পরে সেন্টপলের পূর্ব পর্যন্ত ইহুদিদের রচিত এই রূপকথার সঙ্গে নাসারাদের কোনোও সম্পর্ক ছিলো না। কিন্তু সেন্টপল যখন ত্রিত্ববাদ ও কাফ্ফারার আকিদা (প্রায়শ্চিত্ত-কেন্দ্রিক বিশ্বাস)-এর নতুন খ্রিস্টধর্মের ভিত্তি স্থাপন করলেন তখন কাফ্ফারার আকিদার দৃঢ়তা সাধনের লক্ষ্যে ইহুদিদের ওই মনগড়া রূপকথার গল্পকেও ধর্মের অংশ বানিয়ে নেন।

কিন্তু ঘটনাটি সম্পর্কে চূড়ান্ত আক্ষেপজনক দিক এই যে, যখন চৌদ্দ শতাব্দী পূর্বে পবিত্র কুরআন ইসা আলাইহিস সালাম-এর মর্যাদা ও মাহাত্ম্য ঘোষণা করে তাকে 'ঊর্ধ্বকাশে তুলে নেয়া'র সত্যকে ইহুদি ও নাসারাদের অলীক কল্পকথার বিরুদ্ধে ইলম ও ইয়াকিনের (দিব্যজ্ঞান ও দৃঢ়বিশ্বাসের) আলোকে প্রকাশ করে দলিল ও প্রমাণের দ্বারা ইহুদি ও নাসারাদের নিরুত্তর ও দমিত করে দিয়েছিলো, তখন তার মোকাবিলায় আজ এক ইসলামের দাবিদার নবী হওয়ার দাবিতে ও মাসিহ হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় অথবা হিন্দুস্তানে দখলদার খ্রিস্টান সরকারকে স্বার্থপরতামূলক তোষামোদের উদ্দেশ্যে ইহুদি ও নাসারাদের ওই আকিদাকে পুনরুজ্জীবিত করা এবং তার ওপর নিজের 'নবী হওয়ার বাতিল আকিদা'র ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছে।
পাঞ্জাবের অন্তর্গত কাদিয়ান এলাকার ভণ্ড নবী কুরআন মাজিদের স্পষ্ট ঘোষণাসমূহ থেকে বেপরোয়া হয়ে অত্যন্ত দুঃসাহসের সঙ্গে ওইসব মনগড়া কাহিনিকে সত্যায়ন করছে, যেগুলোকে ইহুদি ও নাসারারা তাদের বাতিল আকিদাসমূহের সমর্থনে সৃষ্টি করেছে। ওই ভণ্ড নবী বলে,

'নিঃসন্দেহে ইহুদিরা ইসা আলাইহিস সালামকে বন্দি করেছিলো, তাঁকে নানাভাবে তিরস্কার করেছিলো, তাঁর চেহারায় থুথু নিক্ষেপ করেছিলো, তাঁর মুখে চড় মেরেছিলো, তাঁকে কাঁটার টুপি পরিয়েছিলো। তা ছাড়া তাঁকে যেভাবে পারে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করেছিলো। তারপর তাঁকে শূলিতে চড়িয়েছিলো এবং তাদের নিজেদের ধারণায় অবশেষে তাঁকে হত্যাও করে ফেলেছিলো।' তবে সে ইহুদি ও নাসারাদেরকে অক্ষরে অক্ষরে সত্যায়ন করার পর কুরআনের কোনো দলিল, হাদিসের কোনো রেওয়ায়েত ও ঐতিহাসিক প্রমাণ ব্যতীত নিজের পক্ষ থেকে তার সঙ্গে এইটুকু কথা যুক্ত করে নিয়েছে যে, যখন শিষ্যবৃন্দের আবেদনের প্রেক্ষিতে হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর মৃতদেহ তাঁদের হাতে সোপর্দ করা হলো এবং তাঁর কাফন-দাফনের জন্য প্রস্তুত হলো, দেখলো যে তাঁর দেহে প্রাণ অবশিষ্ট আছে। তারপর তাঁরা গোপনীয়তার সঙ্গে বিশেষ ধরনের পট্টি দ্বারা তাঁর যখমসমূহের চিকিৎসা করলেন। এতে ইসা আলাইহিস সালাম সুস্থ হয়ে উঠলেন। তারপর তিনি আত্মগোপন করে কাশ্মিরে চলে এলেন। এখানে তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নিজেকে লুকিয়ে রাখলেন এবং অপরিচিত অবস্থায় এখানেই পরলোকগমন করলেন। আপনারা এ-কথা বলতে পারেন যে, ইহুদি ও নাসারাদের রচিত কল্পকাহিনিতে হযরত মাসিহ আলাইহিস সালাম-সম্পর্কে অপমানিত ও অপদস্থ করার যতগুলো দিক ছিলো তার সবগুলো এই মিথ্যা নবুওতের দাবিদার কবুল করে নিয়েছে। তার ওপর ইসা আলাইহিস সালাম-এর মহামর্যাদা ও উচ্চ মাহাত্ম্য-সম্পর্কিত দিকটিকে কাহিনি থেকে খারিজ করে দিয়ে তার সঙ্গে একটি কাল্পনিক অংশ জুড়ে দিয়েছে। এই কাল্পনিক অংশটি একদিকে প্রকৃতিপূজারীদেরকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করার একটি উপায় হতে পারে আর অন্যদিকে তা হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর অবশিষ্ট জীবনকে অপরিচিত অবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে অপমান ও অপদস্থতার আরো একটি দিক পূর্ণ করেছে যার জন্য সে লালায়িত ছিলো। (إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ)

পাঞ্জামের এই ভণ্ড নবীর এতকিছু করার দরকার করেছিলো কেনো? এর প্রতি এইমাত্র উপরে ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং তার বিস্তারিত বিবরণ জানার জন্য প্রফেসর বার্নি কর্তৃক রচিত গ্রন্থ 'কাদিয়ানি মাযহাব' পাঠ

করা যেতে পারে। অথবা স্বয়ং মিথ্যুক ও ভণ্ড নবীটির রচিত অর্থহীন প্রলাপসমূহ নগ্নভাবে এই সত্য উদ্‌ঘাটনে সহায়ক হবে।

আমাদের প্রেক্ষিত কেবল এই বিষয়টি যে, পাঞ্জাবের এই মিথ্যাবাদী ভণ্ড নবী কীভাবে কুরআনে হাকিমের অকাট্য দলিলসমূহের বিরুদ্ধে ইহুদি ও নাসারাদের হযরত ইসা আলাইহিস সালামকে লাঞ্ছিত করা-শূলিবিদ্ধ করা-হত্যা করার আকিদাকে সমর্থন করতে অন্যায় দুঃসাহসের সঙ্গে অগ্রসর হলো। তাদের সঙ্গে যতটুকু মতভেদ করেছে তাতে সে কুরআনের দাবির বিপরীতে ইসা আলাইহিস সালাম-এর পবিত্র জীবনকে উদ্দেশ্যহীন, ব্যর্থ ও অজ্ঞাত সাব্যস্ত করার অনর্থক প্রচেষ্টা ব্যয় করেছে।

আপনি এইমাত্র শুনেছেন যে, কুরআন মাজিদ কী বর্ণনাশক্তির সঙ্গে বনি ইসরাইলের ষড়যন্ত্রের মোকাবিলায় আল্লাহ তাআলা কর্তৃক হযরত ইসা আলাইহিস সালামকে সুরক্ষিত রাখার দাবি উচ্চকিত করেছে—

وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ

"আর তারা চক্রান্ত করেছিলো আর আল্লাহও কৌশল করেছিলেন; আল্লাহ কৌশলীদের শ্রেষ্ঠ।"[১৪]

إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا

আমি তোমার কাল পূর্ণ করছি এবং তোমাকে আমার কাছে তুলে নিচ্ছি এবং যারা কুফরি করেছে তাদের মধ্য থেকে তোমাকে পবিত্র করছি।

আবার কুরআন কী জোরের সঙ্গে ঘোষণা করেছে যে, আল্লাহ তাআলা ইসা আলাইহিস সালাম সুরক্ষাদানের প্রতিশ্রুতিকে এমনভাবে পূর্ণ করলেন যে, শত্রুরা কিছুতেই ইসা ইবনে মারইয়াম (আলাইহিমাস সালাম)-এর বিরুদ্ধে সক্ষম হতে পারে নি। এমনকি হাত দিয়ে তাঁকে স্পর্শ করতে পারে নি। কুরআন বলছে—

وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ.......

"(হে মারইয়াম-তনয় ইসা, স্মরণ করো,) আমি তোমার থেকে বনি ইসরাইলকে (তাদের পাকড়াও ও হত্যা করার ষড়যন্ত্রকে) নিবৃত্ত রেখেছিলাম........।"

---

[১৪] সুরা আলে ইমরান : আয়াত ৫৪।

وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ..... وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا () بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ...

"অথচ তারা তাকে হত্যা করে নি, ক্রুশবিদ্ধও করে নি; কিন্তু তাদের এরূপ বিভ্রম ঘটেছিলো। ..... এটা নিশ্চিত যে, তারা তাকে হত্যা করে নি; বরং আল্লাহ তাকে তাঁর কাছে তুলে নিয়েছেন...।" [সুরা নিসা : আয়াত ১৫৬-১৫৭]

এখন চিন্তার বিষয় এই যে, আমরা দুনিয়ায় দিন-রাত দেখছি যদি কোনো ক্ষমতাবান ব্যক্তির প্রিয় বন্ধু বা সঙ্গীর পেছনে শত্রু লেগে গিয়ে তাঁকে হত্যা করার চেষ্টা করে এবং সেই বন্ধু বা সঙ্গী মনে করেন যে, আমি এখন ক্ষমতাবান ব্যক্তির সাহায্য ছাড়া শত্রুর মোকাবিলায় টিকে থাকতে পারবো না, তখন তিনি ওই ক্ষমতাবান ব্যক্তির শরণাপন্ন হন। ক্ষমতাবান ব্যক্তি তাঁকে সম্পূর্ণভাবে আশ্বস্ত করে দেন যে, শত্রু তোমার কোনোও ক্ষতি করতে সক্ষম হবে না। তাদের হাতকে তোমার পর্যন্ত পৌঁছতেই দেয়া হবে না। এ-ক্ষেত্রে প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি এই অর্থই গ্রহণ করে যে, এখন কোনো অবস্থাতেই তার শত্রুর ভয় থাকলো না। তবে হ্যাঁ, যদি ওই ক্ষমতাবান ব্যক্তি তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ না করে মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হন বা শত্রুর শক্তি ও ক্ষমতা এত বেশি যে, তিনি নিজেই ওই সাহায্য ও নিরাপত্তা বিধানে অক্ষম, তবে ভিন্ন কথা।

মানবজগতে এই সংবাদ পৌঁছে যে, ক্ষমতাবান সত্তার প্রিয় বন্ধুকে বা সঙ্গীকে শত্রুরা গ্রেপ্তার করে খুব কঠিনভাবে প্রহার করেছে, চেহারায় থুথু নিক্ষেপ করেছে এবং যেভাবে ইচ্ছা লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করেছে, তাদের ধারণায় মেরেও ফেলেছে এবং মৃত মনে করে লাশ তার আত্মীয়-স্বজনের হাতে তুলে দিয়েছে; কিন্তু ঘটনাক্রমে আত্মীয়-স্বজনেরা তার নাড়ি বুঝতে পারলো যে কোথাও প্রাণ আটকে আছে। কাজেই তার চিকিৎসা করানো হয়েছে এবং সে আরোগ্য লাভ করেছে। এ-ক্ষেত্রে দুনিয়ার মানুষ ওই ক্ষমতাবান সত্তা সম্পর্কে কী ধারণা পোষণ করবে, যিনি এই নির্যাতিত লোকটিকে সাহায্য ও সুরক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন? তিনি কি তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছেন? না-কি করেন নি? বলা বাহুল্য, মানুষ এই মন্তব্যই করবে যে, তিনি প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন নি। তা ইচ্ছাকৃতভাবেই হোক আর অক্ষমতার কারণেই হোক।

অতএব, মানবজগতের ক্ষেত্রে অবস্থা যখন এমন, তখন জানি না, পাঞ্জাবের ওই মিথ্যাবাদী ভণ্ড নবীর মন ও মস্তিষ্ক সর্বশক্তিমান আল্লাহর সম্পর্কে কোন্ বিবেচনায় এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো যে, আল্লাহ তাআলা ইসা ইবনে মারইয়ামকে (আলাইহিমাস সালাম) সবধরনের সাহায্য ও সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি প্রদান করা সত্ত্বেও শত্রুদের হাতে তিনি এসবকিছুকে ঘটতে দিলেন? এসবকে পাঞ্জাবের ভণ্ড মিথ্যুক নবী ইহুদি ও নাসারাদের অন্ধ অনুকরণে মেনে নিলো এবং কুম্ভিরাশ্রু বিসর্জনের জন্য কেবল এতটুকু কথা জুড়ে দিলো যে, 'যদিও ইহুদিরা ইসা আলাইহিস সালামকে শূলিবিদ্ধ ও হত্যা করার পর মনে করেছিলো যে তাঁর প্রাণ দেহখাঁচা ত্যাগ করেছে, কিন্তু বাস্তবে তা ঘটে নি; বরং প্রাণের উপস্থিতি তখন অনুভবযোগ্যরূপে অবশিষ্ট ছিলো। এইভাবে তাঁর প্রাণ রক্ষা পেয়েছিলো। যেমন, এখন থেকে কিছুকাল আগে জেলখানাগুলোতে ফাঁসি দেয়ার যে-রীতি প্রচলিত ছিলো তার কারণে কোনো কোনো সময় ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির প্রস্থানোদ্যত আত্মার সামান্যকিছু থেকে যেতো এবং মৃতদেহ তার আত্মীয়স্বজনের হাতে তুলে দেয়ার পর চিকিৎসার মাধ্যমে সে ভালো হয়ে যেতো।'

যাই হোক। আমরা অবশ্যই একক সত্তা, অসীম ক্ষমতার অধিকারী মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখছি। তিনি যখনই তাঁর বিশিষ্ট বান্দাগণের (নবী ও রাসুলের) সঙ্গে এই প্রকারের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তখন সেই প্রতিশ্রুতিকে এমনভাবে পূর্ণ করেছেন যা অসীম ক্ষমতাবানের মর্যাদার উপযোগী।

হযরত সালেহ আলাইহিস সালাম ও তাঁর সম্প্রদায়ের সত্য অস্বীকারকারীদের যে-ঘটনা সুরা নামল-এ অলৌকিক বর্ণনাশৈলীর সঙ্গে ব্যক্ত করা হয়েছে তার প্রতি মনোনিবেশ করুন। আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ () قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ () وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ () فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ

مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ () فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ () وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (سورة النمل)

“আর সেই শহরে ছিলো এমন নয় ব্যক্তি,[৯৫] যারা দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করতো এবং সৎকাজ করতো না। তারা বললো, “তোমরা আল্লাহর নামে শপথ গ্রহণ করো—“আমরা রাত্রিকালে তাকে ও তার পরিবার-পরিজনকে অবশ্যই আক্রমণ করবো; তারপর তার অভিভাবককে (খুনের বদলা দাবিকারীদেরকে) নিশ্চয় বলবো, তার পরিবার-পরিজনের হত্যা আমরা প্রত্যক্ষ করি নি; (তারা কখন ধ্বংস হয়েছে তা আমরা দেখি নি।) আমরা অবশ্যই সত্যবাদী।” তারা এক (গোপনীয়) চক্রান্ত করেছিলো এবং আমিও এক কৌশল অবলম্বন করলাম; কিন্তু তারা বুঝতে পারে নি। (টেরই পায় নি।) অতএব দেখো, তাদের চক্রান্তের পরিণাম কী হয়েছে—আমি অবশ্যই তাদেরকে ও তাদের সম্প্রদায়ের সবাইকে ধ্বংস করেছি। এই তো তাদের ঘর-বাড়ি, সীমালঙ্ঘনের কারণে তা জনশূন্য (ও বিধ্বস্ত) অবস্থায় পড়ে আছে; এতে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে। এবং যারা মুমিন ও মুত্তাকি ছিলো (আবাধ্যচরণ থেকে নিজেদের রক্ষা করেছিলো) তাদেরকে আমি উদ্ধার করেছি। [সুরা আন-নামল : আয়াত ৪৮-৫৩]

তারপর সেই মহান ঘটনাটি পাঠ করুন যা খাতিমুল আম্বিয়া মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হিজরতের সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং সুরা আনফালে সত্যের শত্রুদের অপমান ও লাঞ্ছনার চিরস্থায়ী ঘোষণা।

কুরআন মাজিদ উল্লিখিত দুটি ঘটনায় সত্য ও মিথ্যার সংগ্রামে শত্রুদের গোপনীয় ষড়যন্ত্রসমূহ, আম্বিয়া কেরামকে (আলাইহিমুস সালাম) নিরপত্তা ও সুরক্ষদানে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি এবং এসব প্রতিশ্রুতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পূর্ণ হওয়ার যে-চিত্র পেশ করেছে, ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে তার প্রতি মনোনিবেশ করুন এবং মীমাংসা করুন যে, যে-আল্লাহ হযরত সালেহ আলাইহিস সালাম ও খাতিমুল আম্বিয়া মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু

---

[৯৫] رهط, অর্থ দল। এখানে সে-শহরের নয়টি দলের নয়জন নেতার কথা বলা হচ্ছে, যারা ধনেজনে ও শক্তিতে শ্রেষ্ঠ ছিলো। তারা হযরত সালেহ আলাইহিস সালাম-কে তাঁর পরিবার-পরিজনসহ হত্যা করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলো। আল্লাহর ইচ্ছায় তাদের এই ষড়যন্ত্র বিফল হয় এবং তারা নিজেরাই ধ্বংস হয়ে যায়।

আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গে কৃত নিরাপত্তা ও সুরক্ষাদানের প্রতিশ্রুতিকে উচ্চতর মানের সঙ্গে পূর্ণ করেছেন। পাঞ্জাবের ওই ভণ্ড ও মিথ্যুক কি বিশ্বাস করে যে, একইভাবে আল্লাহ তাআলা হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর সঙ্গে কৃত প্রতিশ্রুতিকে অলৌকিক উচ্চতার সঙ্গে পূর্ণ করেছেন? না, কিছুতেই বিশ্বাস করে না। অথচ কুরআন মাজিদের আয়াতসমূহ সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, উল্লিখিত দুটি ঘটনার মোকাবিলায় ইসা ইবনে মারইয়াম (আলাইহিমাস সালাম)-এর সঙ্গে কৃত প্রতিশ্রুতিসমূহ আরো অধিক স্পষ্ট বিবরণের সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলার গোপনীয় কৌশলের ফলে শত্রুরা ইসা আলাইহিস সালামকে হাত দ্বারা পর্যন্ত স্পর্শ করতে পারে নি। এ-কারণেই তো আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন ইসা আলাইহিস সালাম-এর প্রতি তাঁর যে-নিয়ামতরাজি ও অনুগ্রহসমূহ গণনা করবেন তার মধ্যে একটি বড় অনুগ্রহ ও নেয়ামত এটাও হবে—

وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ.......

"(হে মারইয়াম-তনয় ইসা, স্মরণ করো,) আমি তোমার থেকে বনি ইসরাইলকে (তাদের পাকড়াও ও হত্যা করার ষড়যন্ত্রকে) নিবৃত্ত রেখেছিলাম........।"

পাঞ্জাবের ভণ্ড নবী তার নবী হওয়ার ও মাসিহ হওয়ার মিথ্যাচার ও প্রতারণাকে দৃঢ় করার জন্য ইসা আলাইহিস সালামকে জীবিত অবস্থায় ঊর্ধ্বলোকে উঠিয়ে নেয়ার বিরুদ্ধে কতটা বিদ্বিষ্ট, তা ভণ্ডটির পুস্তকগুলো থেকে জানা যায়। তারপরও সে ইহুদি ও নাসারাদের এই অন্ধ অনুকরণের জন্য কুরআনের স্পষ্ট দলিলসমূহের বিরুদ্ধে গিয়ে কুফরির স্তর পর্যন্ত পৌঁছেছে, ইসা আলাইহিস সালাম-এর উচ্চ মর্যাদা ও মাহাত্ম্যের ক্ষেত্রে অপমান ও অপদস্থতার পথ বেছে নিয়েছে এবং আল্লাহ তাআলার প্রতিশ্রুতিকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে। এটাই কি যথেষ্ট ছিলো না যে, অপব্যাখ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে এতটুকু বলে দিতো যে, ইসা আলাইহিস সালামকে জীবিত অবস্থায় আমানে উঠিয়ে নেয়া হয় নি; কিন্তু আল্লাহ তাকে আবদ্ধ জায়গা থেকে কোনো উপায়ে শত্রুদের বেষ্টনি থেকে বের

করে সুরক্ষিত রেখেছেন এবং শত্রুরা কোনোভাবে তার সন্ধান পায় নি।[৯৬] কিন্তু কাদিয়ানের ভণ্ড নবীটির জন্য আফসোস! আল্লাহ তাআলার সত্যনবী ইসা ইবনে মারইয়াম (আলাইহিমাস সালাম)-এর সঙ্গে বিদ্বেষ ও শত্রুতা তাকে خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ 'দুনিয়া ও আখেরাত উভয়টিতে ক্ষতিগ্রস্ত হলো'-এর লক্ষ্যস্থল বানিয়ে ছাড়লো।

ভণ্ড নবীর প্রতারণা ও তার জবাব

হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর এই মতযুদ্ধপূর্ণ মাসআলায়—যা তাঁর উচ্চ মর্যাদা ও মাহাত্ম্যের বড় নিদর্শন—সুরা আলে ইমরানের আয়াতসমূহের পারস্পরিক যোগসূত্র ও উল্লেখের পর্যায়ক্রম বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। এ-ক্ষেত্রেও কাদিয়ানের ভণ্ড মিথ্যুক নবী সত্যকে মিথ্যার সঙ্গে মিশিয়ে অজ্ঞ লোকদেরকে পথভ্রষ্ট করতে প্রচেষ্টা ব্যয় করেছে।

কুরআন মাজিদের সুরা আলে ইমরানে আল্লাহ তাআলা হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর শত্রুদের বেষ্টনীতে পতিত হওয়া প্রসঙ্গে যে-সান্ত না ও প্রতিশ্রুতির উল্লেখ করেছেন তা থেকে বুঝা যায় সেখানে যে-প্রাকৃতিক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিলো তা এই : যখন সত্যধর্মের শত্রুরা হযরত ইসা আলাইহিস সালামকে একটি আবদ্ধ স্থানে চারপাশ থেকে ঘিরে ধরলো তখন একজন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নবী ও সত্য খোদার মধ্যে নৈকট্যের যে-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত তার প্রেক্ষিতে স্বাভাবিকভাবে হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর মনে এসব ভাবনার উদয় হলো যে, এখন কী ঘটবে—সত্যপথে প্রাণ বিসর্জণ দিতে হবে না-কি আল্লাহর অসীম ক্ষমতার কোনো কারিশমা প্রকাশ পাবে? যদি শত্রুদের আক্রমণ থেকে আমাকে রক্ষা করার কোনো কারিশমা প্রকাশ পায়, তবে তার অবস্থা কী হবে, কারণ বাহ্যিকভাবে কোনোও উপকরণ দেখা যাচ্ছে না? আর যদি আমি রক্ষাও পাই, তবে কি দুঃখ-কষ্ট ও যন্ত্রণা ভোগের পর রক্ষা পাবো,

---

[৯৬] একে অপব্যাখ্যা বলা হচ্ছে এ-কারণে যে, ইসা আলাইহিস সালাম-এর জীবিত থাকা সম্পর্কে কুরআনের অন্যান্য আয়াত, রাসুলের হাদিস ও উম্মতের ইজমার প্রেক্ষিতে এ-জায়গায় এই ব্যাখ্যা নিঃসন্দেহে বাতিল। কিন্তু তাতে অন্তত ইসা আলাইহিস সালামকে হীন ও লাঞ্ছিত প্রতিপন্ন করা এবং আল্লাহর প্রতিশ্রুতিকে মিথ্যা সাব্যস্ত করার ব্যাপারটি

না-কি শত্রুরা কোনোভাবেই আমাকে করায়ত্ত করতে পারবে না? তখন আল্লাহ তাআলা ইসা আলাইহিস সালামকে সম্বোধন করে হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর অন্তরে স্বভাবগত কারণে উত্থিত প্রশ্নসমূহের পর্যায়ক্রমিক জবাব দিলেন। তা এভাবে : হে ইসা, এটা আমার দায়িত্ব যে, আমি তোমার নির্ধারিত জীবৎকাল পূর্ণ করবো। অর্থাৎ, তুমি নিশ্চিত থাকো যে, শত্রু তোমাকে কিছুতেই হত্যা করতে পারবে না। (إِنِّي مُتَوَفِّيكَ : আমি তোমার কাল পূর্ণ করছি।) আর তা এই উপায়ে হবে যে, ওই সময় আমি তোমাকে আমার দিকে অর্থাৎ উর্ধ্বাকাশে তুলে নেবো। (وَرَافِعُكَ إِلَيَّ : তোমাকে আমার কাছে তুলে নিচ্ছি।) আর তা এভাবে নয় যে, প্রথমে তুমি সবধরনের দুঃখ-কষ্ট ও যন্ত্রণা ভোগ করবে, অবশেষে আমি তোমাকে চিকিৎসা করে সুস্থ করে তুলবো, তারপর আমার দিকে উঠিয়ে নেবো, না এভাবে নয়; বরং তা এভাবে হবে যে, তুমি শত্রুদের অপবিত্র হাত থেকে সার্বিকভাবে সুরক্ষিত থাকবে, কোনো শত্রু তোমার গায়ে হাতও লাগাতে পারবে না। (وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا : এবং যারা কুফরি করেছে তাদের মধ্য থেকে তোমাকে পবিত্র করছি।) এই তো গেলো স্বাভাবিক জিজ্ঞাসাসমূহের জবাব। কিন্তু তার থেকেও অধিক আমি যা করবো তা এই : যারা তোমার অনুসারী (চাই তারা ভ্রান্ত হোক, যেমন নাসারা বা বিশুদ্ধ আকিদার অধিকারীই হোক, যেমন মুসলমান) তাদেরকে কিয়ামত পর্যন্ত ইহুদিদের বিরুদ্ধে প্রবল রাখবো এবং কিয়ামত পর্যন্ত ইহুদিরা কখনো তাদের ওপর শাসকসুলভ ক্ষমতা লাভ করতে পারবে না। অবশিষ্ট থাকলো অন্যান্য মতভেদপূর্ণ বিষয়গুলোর মীমাংসা, সেগুলোর জন্য (কিয়ামতের) দিবস নির্ধারিত রয়েছে। সেদিন সবধরনের বিতণ্ডার অবসান ঘটবে এবং সত্য ও মিথ্যার সঠিক ফয়সালা করে দেয়া হবে।

আলোচ্য আয়াতগুলোর উল্লিখিত তাফসির যেমন পূর্ববর্তীকালের উলামায়ে কেরাম ও ইজমায়ে উম্মতের মতানুরূপ, তেমনি এই তাফসিরে আয়াতে উল্লেখিত প্রতিশ্রুতি কতিপয়ের পর্যায়ক্রমেও কোনো তারতম্য ঘটে নি। আর অগ্রবর্তীকে পশ্চাদ্‌বর্তী এবং পশ্চাদ্‌বর্তীকে অগ্রবর্তী করারও কোনো দরকার করে নি।

কিন্তু মির্যা কাদিয়ানি তার 'মাসিহত্ব ও নবুওতের মসনদ' প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কুরআন মাজিদ, সহিহ হাদিস ও ইজমায়ে উম্মতের মোকাবিলায় যখন দাবি করলো যে ইসা আলাইহিস সালাম-এর মৃত্যু হয়েছে, তখন এ-ঘটনা সম্পর্কিত আয়াতসমূহের অর্থ বিকৃত করারও জন্য নিষ্ফল প্রচেষ্টা ব্যয়েরও প্রয়োজন মনে করলো। সে দাবি করলো যে, মাসিহ আলাইহিস সালাম-এর মৃত্যুর সংঘটনকে যদি উর্ধ্বাকাশে উত্তোলন, কাফেরদের অপবিত্র হাতের স্পর্শ থেকে পবিত্র রাখা এবং তাঁর অনুসারীবৃন্দকে কাফেরদের ওপর জয়ী রাখার (প্রতিশ্রুতির) পূর্ববর্তী ঘটনা হিসেবে মেনে নেয়া না হয়, তা হলে বর্ণনার পর্যায়ক্রমের মধ্যে তারতম্য সৃষ্টি হবে এবং অগ্রবর্তীকে পশ্চাদ্‌বর্তী এবং পশ্চাদ্‌বর্তীকে অগ্রবর্তী মানতে হবে। আর এটা কুরআন মাজিদের আলঙ্কারিক বৈশিষ্ট্যের বিরোধী। সুতরাং, মেনে নিতে হবে যে, إِنِّي مُتَوَفِّيكَ : আমি তোমার কাল পূর্ণ করছি-এর প্রতিশ্রুতি কার্যকর হয়েছিলো এবং ইসা আলাইহিস সালাম মৃত্যুবরণ করেছিলেন।

মির্যা কাদিয়ানির এই প্রতারণা ওই সকল জ্ঞানী ব্যক্তির কাছে অস্পষ্ট নয় যারা আরবি ভাষা ও কুরআন মাজিদের বর্ণানশৈলীর ব্যাপারে সুরুচির অধিকারী; কিন্তু তা সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্তিতে ফেলতে পারে। এ-কারণে এই শিরোনামের শুরুর দিকেই আয়াতগুলোর তাফসির এমনভাবে বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে যাতে মির্যার পক্ষ থেকে যে-প্রতারণার অবতারণা করা হয়েছে তা আপনা-আপনিই দূরীভূত হয়ে যায়। তারপরও অধিক ব্যাখ্যার জন্য এই কথাগুলো যুক্ত করা হচ্ছে : বর্ণনার পর্যায়ক্রম রক্ষার উদ্দেশ্য হলো যদি কথার মধ্যে কয়েকটি বিষয় পর্যায়ক্রমে উল্লেখ করা হয় তবে তাদের সংঘটনও একইভাবে পর্যায়ক্রমিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। যাতে ওই কথার মধ্যে বিবৃত ধারাক্রম বিকৃত না হয় এবং অগ্রবর্তীকে পশ্চাদ্‌বর্তী এবং পশ্চাদ্‌বর্তীকে অগ্রবর্তী করতে না হয়। আর এটা জরুরি যে, ভাষার ফাসাহাত ও বালাগাত (বিশুদ্ধতা ও অলঙ্কার)-এর চাহিদাই হবে কথার মধ্যে যে-পর্যায়ক্রম রয়েছে তাতে ব্যতিক্রম না ঘটা। অন্যথায় তো কোনো কোনো ক্ষেত্রে অগ্রবর্তীকে পশ্চাদ্‌বর্তী এবং পশ্চাদ্‌বর্তীকে অগ্রবর্তী ফাসাহাতের প্রাণ বলে বিবেচনা করা হয় এবং এটি অলঙ্কারশাস্ত্রের প্রসিদ্ধ বিষয়বস্তু।

সুতরাং পবিত্র কুরআনের এই আয়াতগুলোর সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায়ে কেরামের তাফসির অনুযায়ী বর্ণিত পর্যায়ক্রম যথাযথভাবে বিদ্যমান। কেননা, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে প্রথমে যে-প্রতিশ্রুতি দেয়া হলো তা এই : আমি তোমার নির্ধারিত জীবৎকাল পূর্ণ করবো। (إِنِّي مُتَوَفِّيكَ : আমি তোমার কাল পূর্ণ করবো।) অর্থাৎ, তোমার মৃত্যুর এই শত্রুদের হাতে হবে না; বরং তুমি স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করবে। কিন্তু এই প্রথম প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করার কয়েকটি পন্থা হতে পারতো : শত্রুদের ওপর বাইরে থেকে অকস্মাৎ আক্রমণ হতো এবং তারা পালিয়ে যেতো বা ওখানেই মরে পড়ে থাকতো এবং হযরত ইসা আলাইহিস সালাম তাদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতেন; অথবা এই অবস্থা হতো যে, আদ বা সামুদ সম্প্রদায়ের মতো জমিন বা আসমান থেকে কুদরতি আযাব এসে তাদের সবাইকে ধ্বংস করে দিতো; অথবা এমন অবস্থা হতো যে, হযরত ইসা আলাইহিস সালাম কোনো-না-কোনো উপয়ে সম্পূর্ণ নিরাপদ অবস্থায় তাদের ঘেরাও থেকে বেরিয়ে যেতেন এবং তাদের কবল থেকে মুক্ত হতেন; কিংবা এমন অবস্থা হতো যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর অসীম ক্ষমতাবলে তাঁকে উর্ধ্বলোকে উঠিয়ে নিয়ে যান, ইত্যাদি ইত্যাদি।

কুরআন বলছে, আল্লাহ তাআলা ইসা আলাইহিস সালামকে সংবাদ প্রদান করেছেন যে, প্রথম প্রতিশ্রুতি উল্লিখিত পন্থাসমূহের মধ্য থেকে শেষোক্ত পন্থায়, অর্থাৎ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ ‘তোমাকে আমার কাছে তুলে নেবো’-এর পন্থায় হবে। এবং তা-ও হবে এমন অসীম কুদরতের হাতে যে, ওই ঘেরাও বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও শত্রুরা তাদের অপবিত্র হাত দ্বারা তোমাকে স্পর্শও করতে পারবে না। আমি কাফেরদের হাত থেকে তোমাকে পবিত্র রাখবো— وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا : ‘এবং যারা কুফরি করেছে তাদের মধ্য থেকে তোমাকে পবিত্র করছি।’ এসব ব্যাপার ছাড়া এটাও হবে যে, আমি তোমার অনুসারীদেরকে তোমাকে অবিশ্বাসকারীদের ওপর কিয়ামত পর্যন্ত জয়ী রাখবো। যাই হোক, (প্রথমটির) পরবর্তী এই তিনটি প্রতিশ্রুতি তখনই পর্যায়ক্রমে কার্যকর হবে যখন প্রথমে প্রথম প্রতিশ্রুতিটি কার্যকর হবে। অর্থাৎ, তোমার মৃত্যু তাদের হাতে হবে না; বরং নির্ধারিত সময়সীমায় পৌঁছে স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটবে।

এই আয়াতগুলোতে প্রথম প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে এ-কথা বলা হয় নি যে, আমি তোমাকে প্রথমে মৃত্যু দান করবো, তারপর পর্যায়ক্রমে পরবর্তী বিষয়গুলো কার্যকর করবো। কেননা, কেবল মূর্খই এমন কথা বলতে পারে। কিন্তু যে-ব্যক্তির কথোপকথনের ন্যূনতমও রুচিবোধ আছে তিনি কখনো এমন কথা বলতে দুঃসাহস করবেন না। কেননা, বর্ণনার পর্যায়ক্রম রক্ষার্থে এটাই হওয়া উচিত যে, ওই ব্যাপারগুলোর সংঘটনকালে এমন অবস্থার সৃষ্টি হবে না যাতে বর্ণনার পর্যায়ক্রমে ব্যবধান এনে পরবর্তীকে পূর্বে ও পূর্ববর্তীকে পরে উপস্থাপন করার মতো ত্রুটিপূর্ণ কাজের প্রয়োজন পড়ে। কিন্তু যদি কোনো ব্যাপার কালের দীর্ঘতা ও বিস্তৃতি দাবি করে এবং তার শেষ অংশের সংঘটন তার পরে উল্লেখিত সমস্ত বিষয়ের পরে হয়, কিন্তু বর্ণিত পর্যায়ক্রমে আদৌ কোনো ব্যবধান সৃষ্টি করে না, তবে এই অবস্থায় ওই শেষ অংশের সংঘটনের বিলম্বিত হওয়ায় কোনো জ্ঞানী ব্যক্তির মতেই ফাসাহাত ও বালাগাতের নিয়মকানুনে ত্রুটি ঘটে না এবং বর্ণনা-পর্যায়ক্রমের সঙ্গে এ-ধরনের সংঘটন-পরম্পরা কোনো সম্পর্ক রাখে না।

সুতরাং আলোচ্য ঘটনায় হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর স্বাভাবিক মৃত্যু যখনই ঘটুক না কেনো, কুরআনের বর্ণনা-পর্যায়ক্রমের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। এখানে তো 'إِنِّي مُتَوَفِّيكَ : আমি তোমার কাল পূর্ণ করবো' বলে এ-কথা বুঝানো হয়েছে যে, কৃতঅঙ্গীকার কতিপয়ের মধ্যে প্রথমে এই অঙ্গীকারটিই কার্যকর হবে যে, তোমার মৃত্যুর কারণ বনি ইসরাইলের এই ইহুদিরা হবে না; বরং যখনই নির্ধারিত সময়সীমা পূর্ণ হবে, তা এমন পন্থায় হবে যাকে সাধারণভাবে আমার প্রতি সম্পর্কিত করা হয় (অর্থাৎ, স্বাভাবিক মৃত্যু)। আর এই অঙ্গীকার সর্ববস্থায় অবশিষ্ট অঙ্গীকার তিনটি থেকে অগ্রবর্তীই আছে। কেননা, তখনই কেবল অবশিষ্ট অঙ্গীকার তিনটি যথাক্রমে কার্যকর হতে পারবে। আর যদি প্রথমেই শত্রুদের হাতে ইসা আলাইহিস সালাম-এর মৃত্যু হতো তবে 'উর্ধ্বলোকে উত্তোলন' ও 'শত্রুদের অপবিত্র হাত থেকে পবিত্র রাখা'র কোনো পন্থাই অবশিষ্ট থাকতো না। তখন বরং মির্যা কাদিয়ানির মতো বাতিল ও অনর্থক অপব্যাখ্যার শরণাপন্ন হতে হতো এবং তাতে আলোচ্য আয়াতগুলোর আত্মা বিনষ্ট হয়ে যেতো। কেননা, আসমানে উত্তোলনের

contents

অর্থ যদি হয় আত্মিক উত্তোলন এবং পবিত্র রাখার অর্থ যদি হয় আত্মিক পবিত্রতা তবে তা সম্পূর্ণরূপে অসংলগ্ন ও অপ্রাসঙ্গিক হবে। কেননা, কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর সঙ্গে এসব অঙ্গীকার করা হয়েছে; সুতরাং হযরত ইসা আলাইহিস সালামকে এসব কথা বলা সম্পূর্ণভাবে অনর্থক যে, 'তোমার প্রতি ইহুদিদের যে-বিশ্বাস—তুমি মিথ্যা ও অভিশপ্ত, তা ভ্রান্ত এবং তুমি নিশ্চিন্ত থাকো যে, আমি তোমার আত্মিক উত্তোলনকারী।' কারণ হযরত ইসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর নবী এবং তিনি ভালো করেই জানতেন যে ইহুদিদের মিথ্যাচারের স্বরূপ কী। তা ছাড়া আত্মিকভাবে উর্ধ্বলোকে উত্তোলনের ব্যাপারটি ইহুদিরা কখনো জানতে পারে না। কারণ তা অদৃশ্য জগতের বিষয়। সুতরাং আল্লাহ তাআলার আত্মিক উত্তোলনের প্রতিশ্রুতি না হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর জন্য সময়োচিত সান্ত্বনার কারণ হতে পারতো, না ইহুদিদের জন্য লাভজনক হতে পারতো।

আর দ্বিতীয় প্রতিশ্রুতি—পবিত্র রাখারও একই অবস্থা; বরং কাদিয়ানির বক্তব্য অনুযায়ী ইহুদিদের অপবিত্র হাত দ্বারা ইসা আলাইহিস সালামকে শূলিতে চড়ানো, তাঁর মৃতদেহ হাতে পাওয়ার পর তাঁর শিষ্যবৃন্দ কর্তৃক যথার্থ চিকিৎসা দ্বারা তাঁকে সুস্থ করে তোলা, তারপর তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে যাদের হেদায়েত ও নসিহতের জন্য আদিষ্ট ছিলেন তাদের থেকে প্রাণ বাঁচিয়ে পলায়ন করা এবং আজীবন নিরুদ্দেশ ও অপরিচিত অবস্থায় জীবন কাটিয়ে দেয়ার পর 'وَرَافِعُكَ إِلَيَّ : তোমাকে আমার কাছে তুলে নেবো' অথবা 'وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا : এবং যারা কুফরি করেছে তাদের মধ্য থেকে তোমাকে পবিত্র করছি' বলে দেয়ায় ইসা আলাইহিস সালাম -সম্পর্কিত ইহুদিদের আকিদারও খণ্ডন হবে না আর কোনো নিরপেক্ষ মানুষও এটা বুঝতে পারবে না যে, যখন ইসা আলাইহিস সালাম শত্রুদের বেষ্টনিতে আবদ্ধ এবং এ-ব্যাপারে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে যে, তিনি আল্লাহর নবী এবং মৃত্যুর পর আত্মিকভাবে তাঁকে আসমানে উঠিয়ে নেয়া ও শত্রুর হাত থেকে পবিত্র রাখা অবধারিত বিষয়, তখন এমন ক্ষেত্রে এসব সান্ত্বনাবাণী ও অঙ্গীকারের সার্থকতা কী। বিশেষত যখন শত্রুরা তাঁর বিরুদ্ধে যা কিছু করতে চেয়েছিলো তার সবকিছুই করে ফেলেছে।

অবশ্য জমহুর উলামায়ে কেরামের তাফসির অনুযায়ী কুরআনের আয়াতসমূহের আত্মা অলৌকিক অলঙ্কারময়তার সঙ্গে পূর্ণরূপে বর্ণনা করছে যে, এই অঙ্গীকারগুলো হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর সঙ্গে যেভাবে করা হয়েছে তা যথাযথ এবং স্বভাবগত অস্থিরতার জন্য নিঃসন্দেহে প্রশান্তি লাভের কারণ এবং নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আবির্ভাবের সময় ইহুদি ও নাসারাদের পরম্পরাগত বাতিল আকিদাসমূহকে খণ্ডনের জন্য যথেষ্ট ও প্রমাণিত।

সংখ্যাগরিষ্ঠ সত্যপন্থী উলামায়ে কেরামের এই তাফসির করা হয়েছে توفى শব্দের 'নির্ধারিত মুদ্দত বা সময়সীমা পূর্ণ করা' অর্থ গ্রহণ করে। এর সারমর্ম হলো, توفى-এর অর্থ মৃত্যু। কিন্তু توفى-এর এটি মূল অর্থ নয়; বরং তা ইঙ্গিতার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ আরবি ভাষায় এর ধাতুমূল وفى يفى وفاء এবং এর অর্থ 'পূর্ণ করা'। একে যখন باب تفعل-এ নিয়ে توفى করা হয়, তখন তার অর্থ হয় 'কোনো বস্তুকে পরিপূর্ণরূপে গ্রহণ করা' বা 'কোনো বস্তুকে নিখুঁত অবস্থায় হস্তগত করা'। আরবি ভাষায় বলা হয় توفى الشيء, অর্থাৎ, أخذه وافيا تاما 'তাকে পূর্ণরূপে গ্রহণ করেছে'। আরো বলা হয় توفيت من فلان مالى عليه 'তার কাছে আমার যা প্রাপ্য তা আমি পরিপূর্ণ গ্রহণ করেছি'। আর ইসলামি আকিদা অনুযায়ী মৃত্যুতে আত্মাকে পূর্ণরূপে নিয়ে যাওয়া হয়, তা-ই ইঙ্গিতস্বরূপ—যাতে মূল অর্থ যথার্থভাবে সুরক্ষিত থাকে—'মৃত্যু' অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে এবং বলা হয় توفاه الله 'আল্লাহ তাকে মৃত্যুদান করেছেন'। কিন্তু কোনো ক্ষেত্রে যদি অন্যান্য প্রমাণ উপস্থিত থাকার প্রেক্ষিতে توفى-এর মূল অর্থ গ্রহণ করা যেতে পারে অথবা মূল অর্থ ব্যতীত অন্যকোনো অর্থ গ্রহণ করা যেতেই পারে না, সে-ক্ষেত্রে কর্তা 'আল্লাহ তাআলা' হোক এবং কর্ম 'আত্মাসম্পন্ন মানুষ'ই হোক না কেনো, সেখানে মূল অর্থ 'পূর্ণরূপে গ্রহণ করা'ই উদ্দেশ্য হবে। যেমন— اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا 'আল্লাহই প্রাণ হরণ করেন (পূর্ণরূপে গ্রহণ করেন) জীবসমূহের তাদের মৃত্যুর সময় এবং যাদের মৃত্যু আসে নি তাদের প্রাণও (পূর্ণরূপে

গ্রহণ করেন) নিদ্রার সময়।[৯৭] এখানে وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ (যাদের মৃত্যু আসে নি)-এর জন্য توفى শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ, একদিকে এটা স্পষ্ট করা হচ্ছে যে, এগুলো সেসব আত্মা যাদের মৃত্যু আসে নি এবং অপরদিকে এটাও স্পষ্ট করা হচ্ছে যে, আল্লাহ তাআলা তাদের ঘুমিয়ে থাকার অবস্থায় তাদের সঙ্গে মৃত্যুর মতো ব্যাপারই ঘটিয়ে থাকেন। সুতরাং এখানে আল্লাহ তাআলা فاعل বা 'কর্তা', মানে متوفى (মুতাওয়াফ্ফি) এবং মানুষের আত্মা বা مفعول 'কর্মপদ', মানে متوفى (মুতাওয়াফ্ফা)। কিন্তু তারপরও কিছুতেই এখানে توفى-এর 'মৃত্যু' অর্থ শুদ্ধ হতে পারে না। কারণ এখানে توفى-এর 'মৃত্যু' অর্থ শুদ্ধ হলে বাক্যটি (নাউযুবিল্লাহ) অর্থহীন হয়ে পড়বে। (কেননা, তখন অর্থ দাঁড়াবে এই যে, আল্লাহ তাআলা তাদের মৃত্যু দেয়ার পরও তাদের মৃত্যু হয় নি।) অথবা যেমন আল্লাহর বাণী— وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ 'তিনি রাত্রিকালে তোমাদের মৃত্যু (নিদ্রারূপ মৃত্যু) ঘটান এবং দিবসে তোমরা যা করো তা তিনি জানেন।[৯৮] এই আয়াতে কোনোভাবেই توفى-এর 'মৃত্যু' অর্থ শুদ্ধ হতে পারে না। অথচ ক্রিয়ার কর্তা আল্লাহ তাআলা এবং কর্ম মানবাত্মা। অথবা যেমন, حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا 'অবশেষে যখন তোমাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন আমার প্রেরিতরা তার মৃত্যু ঘটায় (তার জান কব্য করে নেয়)।[৯৯] এই আয়াতে মৃত্যুরই আলোচনা হচ্ছে; কিন্তু توفته শব্দে توفى-এর মৃত্যু অর্থ গ্রহণ করা যেতে পারে না। কারণ তাতে অনর্থক দ্বিরুক্তি আবশ্যক হবে। অর্থাৎ, أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ বাক্যাংশে 'মাওত' বা 'মৃত্যু' শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে, এখন توفته শব্দেও যদি توفى-এর মৃত্যু অর্থ গ্রহণ করা হয় , তবে আয়াতটির তরজমা হবে এমন : 'যখন

---

[৯৭] সুরা যুমার : আয়াত ৪২।

[৯৮] সুরা আনআম : আয়াত ৬০।

[৯৯] সুরা আনআম : আয়াত ৬১।

তোমাদের মধ্য থেকে কারো মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ মৃত্যু নিয়ে আসে।' এই অবস্থায় মৃত্যু শব্দটির পুনরাবৃত্তি অনর্থক এবং ফাসাহাত, বালাগাত ও অলৌকিকতার গুণ-সম্পন্ন কালাম তো দূরের কথা, দৈনন্দিন কথাবার্তা ও সাধারাণ আলোচনার বিচারেও তা নিম্নস্তরের ও নিষ্ফল। অবশ্য যদি توفی-এর প্রকৃত অর্থ—'কোনো বস্তুকে করতলগত (কব্য) করা' অথবা 'কোনো বস্তুকে পূর্ণরূপে হস্তগত করা'—গ্রহণ করা হয় তবে কুরআনের উদ্দেশ্য যথার্থভাবে প্রকাশিত হবে এবং কথাটিও তার অলৌকিকতার সীমায় স্থির থাকবে।

এখন প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তি চিন্তা করতে পারেন যে, توفی শব্দের প্রকৃত অর্থ মৃত্যু বলে দাবি করা—বিশেষ করে যখন এখানে (কর্তা) আল্লাহ তাআলা এবং (যার ওপর কর্তার ক্রিয়া সম্পন্ন হয়/কর্মপদ) প্রাণধারী মানুষ—কতটুকু শুদ্ধ ও সঠিক?

এখানে موت ও توفی শব্দ দুটির একইসঙ্গে বর্ণিত হওয়া ও একই বস্তুর জন্য প্রযোজ্য হওয়া, আবার শব্দ দুটির অর্থে ভিন্নত ও তারতম্য হওয়া এ-বিষয়টির স্পষ্ট প্রমাণ যে, শব্দ দুটি مرادف বা সমার্থবোধক নয়। যেমন, أسد ও ليث (সিংহ), إبل ও جمل (উট), نون ও حوت (মাছ), ইত্যাদি নামবাচক শব্দ এবং جمع ও شمل ও كسب (একত্র করা), لبث ও ও مكث (অবস্থান করা) عطش ও ظمأ (পিপাসার্ত হওয়া), جوع ও سغب (ক্ষুধার্ত হওয়া) ইত্যাদি কর্মবাচক শব্দ সমার্থবোধক। موت ও توفی শব্দ দুটির অবস্থা এই শব্দগুলোর অবস্থার মতো নয়; বরং موت ও توفی শব্দ দুটির প্রকৃত অর্থের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

অথবা যেমন— فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ 'যদি তারা সাক্ষ্য দেয় তবে তাদেরকে গৃহে অবরুদ্ধ রাখবে, যে পর্যন্ত না তাদের মৃত্যু হয়।'[১০০] আয়াতে الْمَوْتُ বা মৃত্যু শব্দটিকে توفی ক্রিয়ার কর্তা সাব্যস্ত করা হয়েছে। প্রত্যেক ভাষার ব্যাকরণের অনুশাসন এই যে,

[১০০] সূরা নিসা : আয়াত ১৫।

ক্রিয়া ও তার কর্তা একই বস্তু হয় না। কারণ ক্রিয়া তার কর্তা দ্বারা নিষ্পন্ন হয়, ক্রিয়াই কর্তা হয় না। এই আয়াত থেকে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, توفى শব্দের প্রকৃত অর্থ কখনোই মৃত্যু নয়। এ-কারণে মৃত্যু অর্থে توفى শব্দের প্রয়োগও বৈধ নয়।

উল্লিখিত তিনটি স্থান ছাড়া সুরা বাকারার আয়াত— ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ 'তারপর প্রত্যেককে তার কর্মের ফল পুরোপুরি প্রদান করা হবে।'[১০১] এবং সুরা নাহল-এর আয়াত— وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ এবং প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের পূর্ণফল দেয়া হবে।'[১০২]-তেও توفى ক্রিয়ার কর্তা আল্লাহ তাআলা এবং কর্ম(পদ) মানব বা মানবাত্মা। এখানেও توفى-এর মৃত্যু অর্থ শুদ্ধ হতে পারে না এবং এটা স্পষ্ট ও পরিষ্কার কথা।

মোটকথা, উল্লিখিত আয়াতসমূহে توفى ক্রিয়ার কর্তা আল্লাহ তাআলা এবং তার কর্ম(পদ) মানব বা মানবাত্মা হওয়া সত্ত্বেও অভিধানবিশেষজ্ঞ ও মুফাস্‌সিরগণের ঐকমত্যে توفى-এর অর্থ 'মৃত্যু' হতে পারে না। হয়তো তা এ-কারণে যে, দলিল ও ইঙ্গিত এই অর্থ হওয়ার বিরোধী অথবা এ-কারণে যে, এখানে توفى-এর প্রকৃত অর্থ 'পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করা বা হস্তগত করা' ব্যতীত 'মৃত্যু' অর্থ কিছুতেই হতে পারে না।

সুতরাং মির্যা কাদিয়ানির এই দাবি— توفى ও موت শব্দ দুটি সমার্থবোধক অথবা এই দাবি— توفى ক্রিয়ার কর্তা যদি আল্লাহ তাআলা হন এবং তার কর্ম(পদ) মানব বা মানবাত্মা হয়, তবে এ ক্ষেত্রে توفى-এর অর্থ কেবল 'মৃত্যু'ই হবে—দুটি দাবিই বাতিল ও কুরআনের আয়াতসমূহের সম্পূর্ণ বিরোধী। অতএব, (তাদের বলছি,) هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ

---

[১০১] সুরা বাকারা : আয়াত ২৮১; সুরা আলে ইমরান : আয়াত ১৬১।

[১০২] সুরা নাহল : আয়াত ১১১।

إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ 'যদি তোমরা তোমাদের দাবিতে সত্যবাদী হয়ে থাকো তবে তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত করো।'[১০৩]

توفى এবং موت শব্দ দুটি নিশ্চিতভাবেই সমার্থবোধক নয় এবং توفى-এর প্রকৃত অর্থ 'মৃত্যু' নয়; বরং এর প্রকৃত অর্থ 'পূর্ণরূপে গ্রহণ করা বা হস্ত গত করা'। কুরআন মাজিদ থেকে এ-ব্যাপারে একটি স্পষ্ট দলিল এই যে, গোটা কুরআনের কোনো-একটি স্থানেও موت ক্রিয়াটির আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্যকাউকে সাব্যস্ত করা হয় নি; কিন্তু তার বিপরীতে অনেক জায়গায় توفى ক্রিয়ার কর্তা ফেরেশতাগণকে সাব্যস্ত করা হয়েছে। যেমন, সুরা নিসার একটি আয়াতে আছে— إِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ 'ফেরেশতাগণ যাদের প্রাণ হরণ (কব্য) করেন বা পূর্ণরূপে গ্রহণ করেন'[১০৪] এবং সুরা আনআমের একটি আয়াতে আছে— قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ বলো, মৃত্যুর ফেরেশতা তোমাদের প্রাণ হরণ করবে বা পূর্ণরূপে গ্রহণ করবে।'[১০৫] আর সুরা আনফালে বলা হয়েছে— وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِيْنَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ 'তুমি যদি দেখতে পেতে ফেরেশতাগণ কাফেরদের মুখমণ্ডলে ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করে তাদের প্রাণ হরণ (কব্য) করছে।'[১০৬]

এসব জায়গায় توفى শব্দটি ইঙ্গিতার্থে 'মৃত্যু' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে; কিন্তু তারপরও তার (মৃত্যু ঘটানোর) সম্পর্ক যেহেতু আল্লাহ তাআলার পরিবর্তে ফেরেশতাগণ ও মালাকুল মাউতের প্রতি করা হয়েছে, তা-ই موت শব্দটি ব্যবহার না করে তার স্থলে توفى শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। তা শুধু এ-কারণে যে, মৃত্যু ঘটানো তো একমাত্র আল্লাহ তাআলারই কর্ম। আর মৃত্যুর সময় মানুষের রুহ বা আত্মা কব্য করা এবং সেটিকে (দেহপিঞ্জর) থেকে পূর্ণরূপে নিয়ে নেয়া ফেরেশতাদের কর্ম। সুতরাং

---

[১০৩] সুরা বাকারা : আয়াত ১১১।
[১০৪] সুরা নিসা : আয়াত ৯৭।
[১০৫] সুরা সাজদা : আয়াত ১১।
[১০৬] সুরা আনফাল : আয়াত ৫০।

যেসব জায়গায় এটা বলা উদ্দেশ্য হয় যে, যখন আল্লাহ তাআলা কোনো মানুষের আয়ুষ্কাল পূর্ণ করে দেন এবং মৃত্যুর আদেশ প্রদান করেন তখন কাজটি কী প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হয়—এসব ক্ষেত্রে موت শব্দের ব্যবহার কিছুতেই সমীচীন নয়; বরং توفى শব্দটিই সেই অবস্থা (মৃত্যু ঘটনারো প্রক্রিয়া) প্রকাশ করতে পারে।

কুরআন মাজিদ توفى ও موت শব্দ দুটিকে যে-অর্থে প্রয়োগ করেছে তার প্রেক্ষিতে توفى ও موت শব্দ দুটির মধ্যে একটি বড় পার্থক্য দেখা যায়। তা এই যে, কুরআন মাজিদ জায়গায় জায়গায় الْمَوْت ও الْحَيَاة শব্দ দুটিকে বিপরীতার্থক সাব্যস্ত করেছে; কিন্তু কোনো একটি জায়গাতেও توفى শব্দটিকে حَيَاة-এর বিপরীতার্থক সাব্যস্ত করে নি। যেমন, সুরা মুল্‌ক-এ বলা হয়েছে—الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ 'তিনিই মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন।'[১০৭] সুরা ফুরকানে বলা হয়েছে— وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً 'তারা জীবনেরও মালিক নয়, মৃত্যুরও মালিক নয়।'[১০৮] একইভাবে এই শব্দ দুটি থেকে নির্গত বিভিন্ন শব্দরূপকেও পরস্পর-বিরোধী বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। যেমন—

أَنَّى يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا (سورة البقرة)

وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا (سورة الروم)

فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا (سورة البقرة، سورة النحل، سورة الجاثية)

وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ (سورة آل عمران)

وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ (سورة الشورى)

এ-রকম উদাহরণ আরো অনেক আছে। অবশ্য توفى শব্দের প্রকৃত অর্থে এই ব্যাপকতা রয়েছে যে, ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গিতে যা মৃত্যুর প্রকৃত

---

[১০৭] সুরা মুল্‌ক : আয়াত ২।

[১০৮] সুরা ফুরকান : আয়াত ৩।

অবস্থা, তার জন্যও ক্ষেত্রবিশেষে ইঙ্গিতার্থে توفى ব্যবহার করা যেতে পারে।

توفى শব্দের উল্লিখিত বিশদ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের সারমর্ম এই যে, আরবি ভাষা ও কুরআনের প্রয়োগ—উভয়টি এ-কথার সাক্ষী যে, توفى ও موت শব্দ দুটির প্রকৃত অর্থে ও তাদের প্রয়োগে স্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। এবং শব্দ দুটি مرادف বা সমার্থবোধক নয়, توفى ক্রিয়ার فاعل বা কর্তা আল্লাহ তাআলা এবং তার مفعول বা কর্ম(পদ) মানব বা মানবাত্মা হলেও। ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গিতে মৃত্যু এমন একটি বাস্তবতার নাম, যার ওপর ব্যাপকতার পন্থায় ও ইঙ্গিতার্থে توفى শব্দটি প্রয়োগ করা যেতে পারে। সুতরাং, যেখানে স্থানগত ইঙ্গিত ও প্রয়োগক্ষেত্রের চাহিদা হয় এই যে, সেখানে توفى শব্দটি উল্লেখ করে ইঙ্গিতার্থে 'মৃত্যু'র অর্থ গ্রহণ করা উচিত, তবে সে-ক্ষেত্রে توفى শব্দ দ্বারা 'মৃত্যু'র অর্থই উদ্দেশ্য হবে। কিন্তু তার বিপরীতে দলিল, ইঙ্গিত ও প্রয়োগক্ষেত্র যদি توفى-এর প্রকৃত অর্থের দাবিদার হয়, তবে সে-ক্ষেত্রে ওই অর্থই উদ্দেশ্য হবে এবং ওই অর্থকেই অগ্রগণ্য মনে করা হবে, চাই সেখানে ইঙ্গিতার্থক অর্থ একেবারেই গ্রহণ করা যেতে না পারুক অথবা গ্রহণ করা যেতে পারুক। কারণ প্রয়োগক্ষেত্র ও অন্যান্য প্রমাণ তাকে দুর্বল বা নিষিদ্ধ সাব্যস্ত করে।

এটাই ওই গূঢ়তত্ত্ব যার প্রতি গভীরভাবে লক্ষ করার পর অভিধানশাস্ত্রের বিখ্যাত পণ্ডিত আবুল বাকা আইয়ুব বলেছেন, توفى শব্দের অর্থ জনসাধারণের মধ্যে 'মৃত্যু' মনে করা হলেও বিশিষ্ট লোকদের কাছে তার অর্থ 'পূর্ণরূপে গ্রহণ করা' ও 'কব্‌য করা'। তিনি বলেছেন—

التوفي الإماتة وقبض الروح وعليه استعمال العامة أو الاستيفاء وأخذ الحق وعليه استعمال البلغاء.

" توفى শব্দের অর্থ 'মৃত্যু ঘটানো' ও 'রুহ কব্‌য (আত্মা হরণ) করা' এবং সর্বসাধারণ এই অর্থেই শব্দটিকে ব্যবহার করে থাকে অথবা শব্দটির অর্থ

'পূর্ণরূপে গ্রহণ করা' ও 'প্রাপ্য গ্রহণ করা' এবং অলঙ্কারশাস্ত্রবিদগণ এই অর্থেই শব্দটিকে ব্যবহার করেন।"[১০৯]

মোটকথা, সুরা মায়িদার إِنِّي مُتَوَفِّيكَ আয়াতে যদি توفى-এর প্রকৃত (আভিধানিক) অর্থ উদ্দেশ্য হয়—যেমনটি অবলম্বন করেছেন উচ্চস্তরের মুফাস্‌সিরগণ ও ভাষাবিদগণ—তবুও মির্যা কাদিয়ানির অসন্তোষ সত্ত্বেও আলোচ্য আয়াতগুলোর উদ্দেশ্য হবে এই যে, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে হযরত ইসা আলাইহিস সালামকে সান্ত্বনা প্রদান করা হয়েছিলো যে, 'হে ইসা, আমি তোমাকে পুরোপুরি নিয়ে নিবো বা তোমাকে আমার করতলগত করবো। এবং তার প্রক্রিয়া হবে এই যে, আমি তোমাকে ঊর্ধ্বলোকে উঠিয়ে নেবো এবং তোমাকে শত্রুদের অপবিত্র হাত থেকে পবিত্র রাখবো।' অর্থাৎ, প্রথমে যখন বললেন, 'তোমাকে পুরোপুরি নিয়ে নিবো বা তোমাকে করতলগত করবো', তখন স্বাভাবিকভাবেই এই প্রশ্নের উদয় হয় যে, পুরোপুরি গ্রহণ করা বা করতলগত (কব্‌য) করার বিভিন্ন উপায় রয়েছে : একটি উপায় এই যে, মৃত্যুদান করা হবে ও রূহকে কব্‌য করে নেয়া হবে এবং পুরোপুরি গ্রহণ করা হবে; দ্বিতীয় উপায় এই যে, জীবত অবস্থায় ঊর্ধ্বলোকের দিকে (নিজের দিকে) উঠিয়ে নেয়া হবে। তা হলে এখানে (ইসা আলাইহিস সালাম-এর ক্ষেত্রে) কোন্ উপায়টি ঘটবে? এই ব্যাপারটিকে পরিষ্কার ও স্পষ্ট করার জন্য বলা হলো, দ্বিতীয় উপায়টি অবলম্বন করা হবে। যাতে শত্রুদের যাবতীয় চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের মোকাবিলায় অলৌকিক প্রচেষ্টার দ্বারা আল্লাহ তাআলার প্রতিশ্রুতি— وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ "আর তারা (ইহুদিরা ইসা আলাইহিস সালাম-এর বিরুদ্ধে) চক্রান্ত করেছিলো আর আল্লাহও (ইহুদিদের গোপনীয় চক্রান্তের বিরুদ্ধে) কৌশল করেছিলেন; আল্লাহ কৌশলীদের শ্রেষ্ঠ (সর্বোত্তম গোপনীয় কৌশলের অধিকারী)।"[১১০]—পূর্ণ হয় এবং وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ

---

[১০৯] দেখুন : الكليات : معجم في المصطلحات والفروق اللغوية, আবুল বাকা আইয়ুব বিন মুসা আল-হুসাইনি আল-কুফি।

[১১০] সুরা আলে ইমরান : আয়াত ৫৪।

"যখন আমি তোমার থেকে বনি ইসরাইলকে (তাদের পাকড়াও ও হত্যা করার ষড়যন্ত্রকে) নিবৃত্ত রেখেছিলাম"-এর যথার্থ প্রদর্শন হয়।

আর توف (পুরোপুরি গ্রহণ করা/কব্‌য করা) ও رفع (উত্তোলন করা)-এর কাজগুলো সম্পন্ন হওয়ার পর তার ফল দাঁড়ালো এই যে, হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর পবিত্র সত্তা কাফেরদের হাত থেকে সবদিক থেকে সুরক্ষিত হয়ে গেলো। এবং এইভাবে আল্লাহ তাআলার অঙ্গীকার—وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا 'এবং (বনি ইসরাইলের) যারা কুফরি করেছে তাদের থেকে তোমাকে পবিত্র করছি।'—কোনো প্রকার ব্যাখ্যা ব্যতীতই সঠিক হলো। আর অপব্যাখ্যার দ্বারা সন্দেহ ও সংশয়, অথবা সত্যিকারের অবস্থাকে অস্বীকার কেবল ওইসব অন্তরের ভাগে থেকে যায় যারা কুরআন থেকে জ্ঞান অন্বেষণ না করে প্রথমে তাদের কল্পনা ও অনুমানকে পথপ্রদর্শক বানায় এবং তারপর কুরআনের ভাষা ও অর্থের বিপরীতে তার মুখে নিজেদের ভাষা রেখে দিতে চায়, এবং কুরআন দ্বারা তা-ই বলাতে চায় যা কুরআন বলতে চায় না। তবে তারা কুরআন মাজিদের এই বৈশিষ্ট্য থেকে অজ্ঞ থেকে যায় যে—

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ

'কোনো মিথ্যা এতে প্রবেশ করতে পারে না অগ্র থেকেও নয়, পশ্চাত থেকেও নয়। ইহা প্রজ্ঞাময়, প্রশংসার্হ আল্লাহর কাছ থেকে অবতীর্ণ।'[১১১]

পাঞ্জাবের স্বঘোষিত ভণ্ড নবী যখন কুরআন মাজিদের এসব অকাট্য প্রমাণ-সম্পর্কি অর্থের বিকৃতি সাধনে ব্যর্থ হলো এবং ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই লাভ করতে পারলো না, তখন সে বাধ্য হয়ে কুরআন মাজিদের দ্ব্যর্থহীন বর্ণনা, সহিহ হাদিসসমূহের সংবাদ এবং ইজামায়ে উম্মতের সিদ্ধান্তকে পেছনে ফেলে দর্শনের কোলে আশ্রয় নেয়ার ইচ্ছা করলো এবং তার রচনাবলিতে এই বুলি আওড়াতে লাগলো যে, যদি হযরত ইসা আলাইহিস সালামকে জীবিত অবস্থায় আসমানে উঠিয়ে নেয়া হয় তবে ব্যাপারটি বুদ্ধি ও যুক্তির বিরোধী। কেননা, কোনো জড় পদার্থ উর্ধ্বলোক পর্যন্ত উড়ে যেতে পারে না আর যদি তা পেরেও থাকে তবে এত

---

[১১১] সুরা হা-মিম-আস-সাজদা : আয়াত ৪২।

দীর্ঘকাল পর্যন্ত কীভাবে জীবিত রয়েছে এবং ওখানে খানাপিনা ও পেশাব-পায়খানার ব্যবস্থা কীভাবে হয়েছে?

আল্লাহর অসীম কুদরতের অলৌকিক কার্যাবলিকে যুক্তিবিরোধী বলে দিয়েই যদি ব্যাপারটি অবসিত হয়ে যেতো তবে হয়তো কাদিয়ানের ভণ্ড নবীর এই দার্শনিক চুলচেরা তর্ক ধর্তব্য বলে বিবেচিত হতে পারতো। কিন্তু বর্তমানে আধুনিক দর্শন বিজ্ঞানরূপে উৎকর্ষ লাভ করে যে-স্তরে পৌঁছেছে, ওখানে থিওরি নয়, বরং পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োগ এ-কথা প্রমাণ করছে যে, যদি শূন্যমণ্ডলের প্রতিবন্ধকসমূহকে ধীরে ধীরে দূর করে দেয়া যায় অথবা সেগুলোকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা যায় তবে জড়দেহের পক্ষে অসীম উচ্চতা পর্যন্ত পৌঁছা কার্যত সম্ভব হয়ে যাবে। এজন্য বিজ্ঞানীরা যে-শ্রম ও প্রচেষ্টা ব্যয় করছেন, ওই ব্যাপারটিকে কার্যে পরিণত করা সম্ভব মনে করেই তা করছেন। তাঁরা বৈজ্ঞানিক উপায়েই তাঁদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন। আজ মানুষ উড়োজাহাজের সাহায্যে বহু মাইল উপর পর্যন্ত ভ্রমণ করতে পারে এবং টেলিভিশনের সাহায্যে হাজারো মাইল দূরে রক্ত-মাংসের মানুষের সঙ্গে কথা বলার সময় তার দেহের ছবি সামনে নিয়ে আসতে পারে এবং বাতাস ও সূর্যকিরণকে নিয়ন্ত্রণে এনে রেডিওর সাহায্যে নিজের আওয়াজকে হাজার হাজার মাইল দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে দিতে পারে এবং আজ হাজারো বছর আগের ঘটনাবলিকে শূন্যমণ্ডলে শৃঙ্খলিত করে এমনভাবে শুনাতে পারে যেনো সবকিছু এখন ঘটছে। সুতরাং দর্শনের আশ্রয়ে সেই মানুষের স্রষ্টার, বরং বিশ্বনিখিলের স্রষ্টা সম্পর্কে 'তিনি জড়বস্তুকে কেমন করে ঊর্ধ্বজগৎ পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারেন?'—ধরনের উক্তি করা নিজের নির্বুদ্ধিতার ওপর মোহর মারা ছাড়া আর কী।

আর যদি ঔষধ, পথ্য ও স্বাস্থ্যরক্ষার বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করে স্বাভাবিক আয়ু দ্বিগুণ ও তিনগুণ করা যেতে পারে এবং তা করা হচ্ছেও[১১২] এবং যদি বিভিন্ন প্রকার খাদ্যের ক্রিয়া ও ফলাফলে এই পার্থক্য হতে পারে এবং হচ্ছেও যে, কোনো খাদ্য থেকে অধিক মল উৎপন্ন হয় আবার কোনোটি থেকে কম উৎপন্ন হয় এবং কোনোটি থেকে মোটেও উৎপন্ন হয় না, বরং তারা খাঁটি রক্তের আকারে শরীরের সঙ্গে

---

[১১২] লেখকের এই বক্তব্য বোধগম্য নয়।

মিশে যায় এবং যদি মানুষ তার প্রচেষ্টা ও সাধনা দ্বারা আধ্যাত্মিক শক্তি বৃদ্ধি করে আজ এই পৃথিবীতে বহু দিন, বহু সপ্তাহ, এমনকি বহু মাস পর্যন্ত পানাহার ব্যতীত জীবিত থাকতে পারে, তবে দুর্বল মানুষের এসব প্রচেষ্টাকে সঠিক ও যথার্থ মনে করা হয়। সুতরাং, আসমান ও জমিনের স্রষ্টার প্রতি হযরত ইসা আলাইহিস সালামকে উর্ধ্বলোকে উঠিয়ে নেয়ার ব্যাপারে উল্লিখিত সন্দেহ পোষণ করা কিংবা সেই সন্দেহের ভিত্তিতে তাঁর সশরীরে উর্ধ্বজগতে পৌঁছা এবং ওখানে জীবিত থাকাকে অবিশ্বাস করা যদি মূর্খতা না হয় তবে আর কী ?

প্রকৃত সত্য এই যে, যে-ব্যক্তি ইলমি তত্ত্বের সঙ্গে অপরিচিত এবং কুরআনের ইলম থেকে বঞ্চিত সে 'যুক্তিবিরোধী' ও 'যুক্তির উর্ধ্বে'—এই দুটি বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে অক্ষম। এজন্য সে সবসময় 'যুক্তির উর্ধ্বে'র ব্যাপারগুলোকে 'যুক্তিবিরোধী' বলে প্রচার করতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে মানুষের চিন্তগত ভ্রষ্টতার উৎস মাত্র দুটি : মানুষের এমনভাবে বুদ্ধি ও বিবেকহীন হওয়া যার ফলে প্রতিটি কথাকে না বুঝেই মেনে নেয় এবং অন্ধের মতো প্রতিটি পথে চলতে থাকে। দ্বিতীয়ত, যে-ব্যাপারটিকে যুক্তির উর্ধ্বে দেখতে পায় তাকে তৎক্ষণাৎ মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং বিশ্বাস করে যে, যে-বিষয়কে তার নিজের বা কতিপয় লোকের বোধ ও বুদ্ধি উপলব্ধি করতে পারে না, প্রকৃতপক্ষে ওই বস্তুর অস্তিত্বই নেই এবং তা বিশ্বাসঅযোগ্য। অথচ এমন অনেক বিষয় আছে যা এক যুগের সকল জ্ঞানী ব্যক্তির কাছে 'যুক্তির উর্ধ্বে' বলে মনে হয়; কারণ তাঁদের জ্ঞান ওই বিষয়গুলোকে উপলব্ধি করতে পারে না। কিন্তু ওই বিষয়গুলোই জ্ঞানের বিকাশ ও উৎকর্ষের অন্যযুগে গিয়ে শুধু সম্ভব বলেই প্রতিপন্ন হয় না; বরং পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার আয়ত্তে চলে আসে। সুতরাং, যদি কোনো বিষয়কে কোনো একজন মানুষ বা একটি দল বা ওই যুগের সকল জ্ঞানী ব্যক্তির কাছে 'যুক্তির উর্ধ্বে' হওয়ার ফলে যুক্তিবিরোধী বা প্রজ্ঞাবিরোধী বলে আখ্যায়িত হওয়ার উপযোগী হয়, তবে তা অন্য যুগে গিয়ে কেনো যুক্তিসম্ভব হয়ে পড়লো, বরং চাক্ষুষ দর্শনের আওতায় চলে এলো?

পবিত্র কুরআন ভ্রষ্টতার প্রথম অবস্থাকে মূর্খতা, ধারণা, কল্পনা ও অনুমান বলে আখ্যায়িত করেছে আর দ্বিতীয় অবস্থাকে ইলহাদ বা খোদাদ্রোহিতা

বলে আখ্যায়িত করেছে। এই দুটি অবস্থাই ইলম ও মারেফাত থেকে বঞ্চিত থাকার ফল।

'যুক্তিবিরোধী' ও 'যুক্তির উর্ধ্বে'র মধ্যে পার্থক্য এই যে, ওই বিষয়ই 'যুক্তিবিরোধী' হতে পারে যার অসম্ভব হওয়ার ব্যাপারে জ্ঞান ও বিশ্বাসের আলোকে অসম্ভব-সাব্যস্তকারী দলিল-প্রমাণ বিদ্যমান; জ্ঞান দলিল-প্রমাণ দ্বারা এবং ইলম বিশ্বাস দ্বারা সাব্যস্ত করে যে, এমন বিষয়ের সংঘটন অসম্ভব এবং কার্যত অসম্ভব। আর 'যুক্তির উর্ধ্বে' বলা হয় এমন বিষয়কে যার সম্পর্কে যুক্তিই এই মীমাংসা প্রদান করে যে, মানবজাতির জ্ঞান ও উপলব্ধি একটি নির্দিষ্ট সীমার বাইরে অগ্রসর হতে পারে না, অথচ সত্য ওই সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকে না। সুতরাং, যেসব বিষয় জ্ঞান ও উপলব্ধির আয়ত্তে আসে না, কিন্তু সেগুলোকে অবিশ্বাস করার পক্ষে যুক্তি ও বিশ্বাসের সাহায্যে দলিল-প্রমাণও উপস্থিত করা যেতে পারে না এসব বিষয়কে 'যুক্তিবিরোধী' না বলে 'যুক্তির উর্ধ্বে' বলতে হবে।

'যুক্তিবিরোধী' ও 'যুক্তির উর্ধ্বে'র মধ্যে পার্থক্যেরই ফল এই যে, অতীতের পৃথিবীতে যেসব বিষয়কে সাধারণভাবে 'যুক্তিবিরোধী' বলা হচ্ছিলো সেগুলোকে বর্তমান পৃথিবীর জ্ঞানী ও বিজ্ঞানীরা 'যুক্তিবিরোধী' বা 'জ্ঞানবিরোধী' মনে করেন নি; বরং সেগুলোকে বাস্তব করে দেখিয়েছেন। ভবিষ্যতে এই জ্ঞানই আরো বিকাশ ও উৎকর্ষ লাভ করে বর্তমান সময়ের অনেক 'যুক্তির উর্ধ্বে'র বিষয়কে যুক্তির আয়ত্তে আনতে সক্ষম হবে। জানি না, জ্ঞানের এই বিকাশ ও উৎকর্ষের ধারা কতকাল চলতে থাকবে।

সুতরাং, যে-ব্যক্তি হযরত আলাইহিস সালাম-এর সশরীরে উর্ধ্বলোকে উত্তোলিত হওয়াকে এই কারণে অবিশ্বাস করে যে যুক্তিসম্মত দর্শন তা স্বীকার করে না, তার এই দাবি দলিল-প্রমাণ এবং জ্ঞান ও বিশ্বাসের পরিবর্তে নিছক মূর্খতা, ধারণা ও অনুমাননির্ভর। আর এসব লোকের জন্য অদৃশ্য জগদের যুক্তিউর্ধ্ব যাবতীয় বিষয়কে—ওহি, ফেরেশতা, জান্নাত, জাহান্নাম, হাশর, আখেরাত, মুজিযা—যুক্তিবিরোধী বলে অস্বীকার করা উচিত।

কুরআন মাজিদ এসব সত্য-অস্বীকারকারীদের জন্যই স্পষ্টভাবে বা অবিশ্বাসকারী উপাধির ব্যবস্থা করেছে—

بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ (سورة يونس)

"পরন্তু তারা যে-বিষয়ের জ্ঞান আয়ত্ত করে নি তা অস্বীকার করে এবং এখনো এর পরিণাম তাদের কাছে উপস্থিত হয় নি।[১১৩] এইভাবে তাদের পূর্ববর্তীরাও মিথ্যা আরোপ করেছিলো। সুতরাং, দেখো, জালিমদের পরিণাম কী হয়েছে!" [সুরা ইউনুস : আয়াত ৩৯]

আয়াতে كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ : 'তারা যে-বিষয়ের জ্ঞান আয়ত্ত করে নি তা অস্বীকার করে' বলে যে-সত্য প্রকাশ করা হয়েছে,—অর্থাৎ, মানুষের জ্ঞান ও বুদ্ধি যে-সকল বিষয়কে উপলব্ধি করতে পারে না সেগুলোকে দলিল-প্রমাণ ও দিব্যজ্ঞান ছাড়া অস্বীকার করা এবং শুধু এ-কারণে অস্বীকার করা যে, ওই বিষয়গুলো আমাদের বোধশক্তির উর্ধ্বে—তার একটি দৃষ্টান্ত মির্যা কাদিয়ানির কর্তৃক হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর জীবিত অবস্থায় সশরীরে উর্ধ্বলোকে উত্তোলিত হওয়াকে অবিশ্বাস ও অস্বীকার। আর তার শিষ্য মিস্টার লাহোরির দার্শনিক কূটতর্কও প্রমাণবিহীন অস্বীকার ও অবিশ্বাসের একটি শাখা।

উল্লিখিত অস্ত্রকেও দুর্বল মনে করে পাঞ্জাবের নবী দাবিদার (মির্যা কাদিয়ানি) আবার দিক পরিবর্তন করেছে এবং দাবি করেছে যে, এই স্থানটি ছাড়া কুরআনের আর কোনো স্থান থেকে প্রমাণ করা যাবে না যে, 'উর্ধ্বলোকে উত্তোলন' দ্বারা 'আত্মিক উত্তোলন' ছাড়া অন্যকোনো অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে, অর্থাৎ জড়বস্তুর প্রতি সশরীরে আসমানে উত্তোলনের সম্পর্ক আরোপ করা হয়েছে। সুতরাং, এই ক্ষেত্রেও 'আত্মিক উত্তোলন' ছাড়া অন্যকোনো অর্থ গ্রহণ করা কুরআনের প্রয়োগ-অশিষ্ট ও ব্যবহার-বিরোধী।

কিন্তু ভণ্ড নবীটির এই দাবিটি প্রথমে তার মূলেই ভুল। কেননা, যদি কোনো শব্দের ব্যবহার-ক্ষেত্র দ্বারা বা কুরআনেরই অন্য আয়াত দ্বারা তার অর্থ নির্দিষ্ট হয়ে পড়ে, তবে এমন প্রশ্ন উত্থাপন করা—এই ব্যবহার যে

---

[১১৩] আল্লাহর দীনকে অস্বীকার করার পরিণাম শাস্তি। সেই শাস্তি এখনো তাদের কাছে আসে নি। ভিন্নমতে تَأْوِيل অর্থ এখানে মূল কথা বা সঠিক ব্যাখ্যা, অর্থাৎ তারা কুরআন বুঝতে পারে নি।—রাগিব।

পর্যন্ত অন্যকোনো স্থানে প্রমাণিত না হবে, মেনে নেয়ার যোগ্য নয়—চূড়ান্ত পর্যায়ের মূর্খতা, যে-পর্যন্ত না দলিল দ্বারা প্রমাণ করা যাবে যে, আরবি ভাষায় এই শব্দটিকে এই অর্থে ব্যবহার করা জায়েযই নয়। আর যদি প্রমাণ পূর্ণাঙ্গ করার জন্য এ-জাতীয় দুর্বল প্রশ্ন বা দাবিকে জবাব প্রদানের বা খণ্ডনের যোগ্য মনে করাই হয়, তবে তার জন্য সুরা নাযিআতের নিম্নলিখিত আয়াতটি যথেষ্ট—

أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا () رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا (سورة النازعات)

"তোমাদেরকে সৃষ্টি করা কঠিনতর, না আকাশ সৃষ্টি? তিনিই তা নির্মাণ করেছেন; তিনি তার ছাদকে সুউচ্চ করেছেন ও সুবিন্যস্ত করেছেন।" [সুরা নাযিআত : আয়াত ২৭-২৮]

আর এটা আসমানের জন্যই কেনো সীমাবদ্ধ হবে? আল্লাহ তাআলা আমাদের থেকে লাখ লাখ ও কোটি কোটি মাইল দূরে শূন্যমণ্ডলে যে-চন্দ্র, সূর্য ও নক্ষত্ররাজিকে উচ্চতা দান করেছেন, অর্থৎ এগুলোকে বহু উর্ধ্বে স্থাপন করেছেন, সেগুলো কি জড়পদার্থ নয়? যদি তা হয়ে থাকে এবং নিশ্চিতভাবে তা-ই, তবে যে-স্রষ্টা জমিন ও আকাশসমূহ সৃষ্টি করেছেন এবং জড়বস্তুসমূহকে বহু উর্ধ্বে স্থাপন করেছেন, তিনি যদি একজন মানবকে আসমানে উঠিয়ে নেন, তাকে কুরআনের প্রয়োগ ও ব্যবহারের বিরোধী বলা নির্বুদ্ধিতা ও মূর্খতা ছাড়ার আর কী? তবে এর পক্ষে প্রমাণ থাকা আবশ্যক। সুতরাং এর পক্ষে পবিত্র কুরআনের অকাট্য দলিল, সহিহ হাদিসসমূহ এবং উম্মতের ইজমার চেয়ে শক্তিশালী ও দৃঢ় প্রমাণ আর কী হতে পারে?

হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর উর্ধ্বলোকে উত্তোলিত হওয়া এবং কিছু আবেগময় উক্তি

মির্যা কাদিয়ানি এই বিষয়টিতে সংখ্যগারিষ্ঠ উলামায়ে কেরামের বিপরীতে ইহুদি ও নাসারাদের অনুকরণে পবিত্র কুরআনের উদ্দেশ্যকে বিকৃত করার ব্যর্থ প্রচেষ্টা ব্যয় করেছে। মিস্টার লাহোরিও কুরআনের তাফসিরে বিকৃত অর্থ পরিবেশনের মাধ্যমে তার পূর্বসূরিকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করেছে। তারপরও আত্মার পঙ্কিলতা তাদেরকে নিশ্চিন্ত করতে পারে নি। এ-কারণে তারা দলিল-প্রমাণের পরিবর্তে আবেগকে

পথপ্রদর্শক বানিয়ে নিয়েছে। কোনো কোনো সময় তারা এমন কথা বলেছে যে, যারা হযরত ইসা আলাইহিস সালামকে আসমানের ওপর জীবিত বলে বিশ্বাস করছে তারা তাঁকে খাতিমুল আম্বিয়া মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওপর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করছে। কেননা, তিনি আছেন পৃথিবীতে, আর ইসা আলাইহিস সালাম আছেন আসমানে—এটা তো ভীষণ অপমানের বিষয়।

কিন্তু আলেম সমাজের কাছে এমন দুর্বল ও অহেতুক আবেগের কী মূল্য থাকতে পারে? কারণ, প্রত্যেক ধার্মিক মানুষ এই সত্য সম্পর্কে খুব ভালোভাবেই অবগত আছে যে, ফেরেশতাগণ সবসময় উর্ধ্বজগতে বিদ্যমান এবং সেখানে অবস্থান করছেন, তারপরও তাঁদের তুলনায়, এমনকি উচ্চস্তরের ফেরেশতা হযরত জিবরাইল ও মিকাইলের তুলনায়ও নিম্ন থেকে নিম্নস্তরের এক নবীও মর্যাদায় অনেক উর্ধ্বে ও শ্রেষ্ঠ। অথচ ওই নবী অবস্থান করেছেন পৃথিবীর মাটিতে আর জিবরাইল আলাইহিস সালাম উর্ধ্বজগতেরও উঁচু স্থানে অবস্থান করছেন। আর খাতিমুল আম্বিয়া মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওপর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব এত উর্ধ্বে যে, নিচের বাক্যটি থেকে তা বুঝা যায়—

بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر

'আল্লাহ তাআলার পরে আপনিই সর্বশেষ্ঠ, সংক্ষিপ্ত কথায় বলতে গেলে এটাই'

তা ছাড়া মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিরাজের রাতে فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى 'দুই ধনুক পরিমাণ বা তার চেয়েও নিকটবর্তী'-এর যে-নৈকট্য ও সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন তা কোনো ফেরেশতাও লাভ করেন নি এবং কোনো নবী ও রাসুলও লাভ করেন নি। সুতরাং হযরত মাসিহ আলাইহিস সালাম উর্ধ্বাকাশে উত্তোলিত হয়ে ওই মর্যাদা ও উচ্চস্তরে পৌছতেও পারেন না, যে-মর্যাদা ও উচ্চস্তরে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিরাজের রাতে পৌছেছিলেন।

যাই হোক। উচ্চস্তর ও নিম্নস্তরের মধ্যে মর্যাদার তারতম্যের জন্য উর্ধ্বলোকে অবস্থান করাই মর্যাদার মানদণ্ড নয়—বিশেষ করে ওই 'শ্রেষ্ঠতম সত্তা'র মোকাবিলায় যাঁর শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড স্বয়ং তাঁর অতুলনীয়

সত্তা এবং যাঁর পবিত্র সত্তাগত বৈশিষ্ট্যাবলি নিজেরাই মর্যাদার উৎস ও পূর্ণতার আধার। এমন সত্তা থেকে তো ‘মর্যাদা’ই সম্মান ও মর্যাদা লাভ করে। ফারসি ভাষার একজন কবি বলেছেন—

حسن یوسف دم عیسی ي د بیضا داری

آنچه خوباں همه دارند تو تنها داری

‘ইউসুফের অনুপম রূপ-সৌন্দর্য, ইসার ফুৎকার[১১৪], [মুসা আলাইহিস সালাম-এর] শুভ্রোজ্জ্বল হাত[১১৫] আপনার রয়েছে। সকল গুণবান যে-সকল গুণের অধিকারী, তার যাবতীয় গুণ আপনার মধ্যে রয়েছে।’

আবার কোনো কোনো সময় ওই ভণ্ড নবী ও তার চেলাচমুণ্ডারা এ-কথা বলেছে যে, যারা ইসা আলাইহিস সালামকে এখনো জীবিত বলে বিশ্বাস করে তারা (নাউযুবিল্লাহ) মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অপমান করে। কারণ তিনি জীবিত নন। আর এভাবে হযরত ইসা আলাইহিস সালাম নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ হয়ে যান।

তাদের এই দাবি আগের দাবির চেয়েও নিরর্থক ও নিষ্ফল। বরং এর ভিত্তি সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। কারণ কোন্ জ্ঞানী আর কোন্ সচেতন ব্যক্তি বলতে পারবেন যে, ‘জীবন’ও উচ্চস্তরের ও নিম্নস্তরের ব্যক্তিদের মধ্যে মর্যাদার মানদণ্ড? কারণ, জীবনের মূল্য হয় ব্যক্তিগত গুণাবলি ও অর্জিত শ্রেষ্ঠত্বের মাধ্যমে, এইজন্য না যে তা জীবন। আবার ‘মর্যাদার মানদণ্ড’-এর আলোচনার প্রতি লক্ষ না করে বলা যায় যে, নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মর্যাদার বিষয়টি এখানে নিয়ে আসাও অনর্থক ও অনুপযোগী। কারণ, কুরআন মাজিদের অকাট্য দলিলসমূহ সমগ্র সৃষ্টির ওপর তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে দিয়েছে। তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলি ও পূর্ণাঙ্গ জীবন জ্বলন্ত সাক্ষী হয়ে কুরআনের অকাট্য দলিলসমূহের সত্যতা প্রতিপন্ন করেছে। সুতরাং, যে-কোনো মানুষের ‘জীবন’ বা ‘উর্ধ্বলোকে উত্তোলন’ বা মর্যাদার অন্যকোনো কারণ রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মর্যাদার

---

[১১৪] ফুৎকার দিয়ে মৃতকে জীবিত করা এবং রুগ্ণকে সুস্থ করা।

[১১৫] ইত্যাদি মুজিযা।

মোকাবিলায় আনা যেতে পারে না। প্রতিটি অবস্থায় ও প্রতিটি ক্ষেত্রে পূর্ণমর্যাদা ও পূর্ণশ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী থাকবেন সেই সত্তাই যিনি যাবতীয় পূর্ণগুণ নিজের মধ্যে ধারণ করে আছেন।

وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ-এর তাফসির

এ-বিষয়টি সমাপ্ত করার পূর্বে এখন একটি কথা বাকি থেকে যায়। তা হলো সুরা নিসার নিম্নলিখিত আয়াতে وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ 'কিন্তু তাদের এরূপ বিভ্রম ঘটেছিলো' বাক্যটির তাফসির কী? অর্থাৎ, তা কী ধরনের গোলকধাঁধা ছিলো যাতে ইহুদিরা পতিত হয়েছিলো? সুতরাং, পবিত্র কুরআন এর জবাব এখানেও এবং সুরা আলে ইমরানেও প্রদান করেছে। তা হলো হযরত ইসা আলাইহিস সালামকে উর্ধ্বাকাশে উঠিয়ে নেয়া। সুরা আলে ইমরানে একে প্রতিশ্রুতির আকারে প্রকাশ করা হয়েছে : وَرَافِعُكَ إِلَيَّ 'আমি তোমাকে আমার কাছে উঠিয়ে নিচ্ছি'। আর সুরা নিসায় প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করার আকারে প্রকাশ করা হয়েছে : 'বরং আল্লাহ তাকে তাঁর কাছে উঠিয়ে নিয়েছেন'। এর সারমর্ম হলো এই, চারপাশে ঘেরাওয়ের সময় সত্য-অস্বীকারকারীরা হযরত ইসা আলাইহিস সালামকে গ্রেপ্তার করার জন্য ভেতরে প্রবেশ করে; কিন্তু তারা সেখানে ইসা আলাইহিস সালামকে পায় না। এই ব্যাপার দেখে তারা হতভম্ব ও অস্থির হয়ে পড়ে। তারা কিছুতেই অনুমান করতে পারে না যে, কীভাবে কী ঘটে গেলো। এইভাবে তাদের বিভ্রম ঘটেছিলো এবং তারা এক বিরাট গোলকধাঁধায় পতিত হয়েছিলো। তারপর কুরআন বলছে—

وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا (سورة النساء)

"যারা তার সম্পর্কে মতভেদ করেছিলো তারা নিশ্চয় এই সম্পর্কে সন্দিগ্ধ ছিলো; এই সম্পর্কে অনুমানের অনুসরণ ব্যতীত তাদের কোনো জ্ঞানই ছিলো না। এটা নিশ্চিত যে, তারা তাকে হত্যা করে নি।" [সুরা নিসা : আয়াত ১৫৭।]

তাদের বিভ্রম ঘটার পরে যে-অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিলো তার চিত্রই এই আয়াতে অঙ্কন করা হয়েছে। এর দ্বারা দুটি বিষয় পরিষ্কারভাবে বুঝা

যাচ্ছে। তার একটি এই যে, ইহুদিরা এ-ব্যাপারে সন্দেহ ও বিভ্রমে পতিত হয়েছিলো এবং ধারণা ও অনুমান ছাড়া জ্ঞান ও বিশ্বাসের কোনো অবস্থাই তাদের মধ্যে অবশিষ্ট ছিলো না। দ্বিতীয় বিষয় এই যে, তারা কোনো-একজন ব্যক্তি হত্যা করে প্রচার করে দিয়েছিলো যে, তারা 'মাসিহ আলাইহিস সালাম'কে হত্যা করে ফেলেছে। অথবা, উল্লিখিত আয়াতটি রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগের ইহুদিদের অবস্থা বর্ণনা করছে।

হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর নিরাপত্তা ও সুরক্ষা সম্পর্কে পবিত্র কুরআন পরিষ্কারভাবে যেসব ঘোষণা প্রদান করেছে তার বিস্তারিত আলোচনা উপরে করা হয়েছে। তারপর, উল্লিখিত আয়াতের তাফসিরে যে-দুটি বিষয় প্রকাশ পাচ্ছে সেগুলোর আংশিক বিবরণ সাহাবায়ে কেরাম (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)-এর বাণী ও ঐতিহাসিক রেওয়ায়েতসমূহের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা রাখে। এ-ক্ষেত্রে কেবল ওইসকল বাণী ও রেওয়ায়েত গ্রহণযোগ্য মনে করা হবে যেগুলো রেওয়ায়েত হিসেবে বিশুদ্ধ হওয়ার পাশাপাশি কুরআনের জায়গায় জায়গায় স্পষ্টরূপে বর্ণিত বুনিয়াদি বিবরণের বিরোধী হবে না এবং إن القرآن يُفسِّر بعضه بعضا : 'কুরআনের এক অংশ অপর অংশের তাফসির করে থাকে'-এর মূলনীতি অনুসারে যেগুলো থেকে প্রমাণিত হবে যে, শত্রুরা ইসা আলাইহিস সালামকে হাত দ্বারা স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারে নি এবং তিনি সুরক্ষিত অবস্থায় ঊর্ধ্বলোকে উত্তোলিত হয়েছেন।

আর একটু পরে 'হায়াতে ইসা' বা 'ইসা আলাইহিস সালাম-এর জীবিত থাকা' শিরোনামের আলোচনায় কুরআনের অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত হবে যে, তাঁর অস্তিত্ব কিয়ামত-সংঘটনের জন্য একটি নিদর্শন এবং এ-কারণে তিনি পুনরায় এই পৃথিবীতে ফিরে আসবেন এবং তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্বসমূহ পালন করবেন। তারপর স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করবেন।

নিহত ব্যক্তি ও শূলিবিদ্ধ হওয়া সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরামের বাণী ও ইতিহাসের যেসব মিশ্রিত বর্ণনা রয়েছে সেগুলোর সারমর্ম এই : শনিবারের রাতে ইসা আলাইহিস সালাম বাইতুল মুকাদ্দাসের একটি আবদ্ধ জায়গায় হাওয়ারিদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন। সে-সময় বানি

ইসরাইলের ষড়যন্ত্র ও প্ররোচনায় দামেস্কের মূর্তিপূজক রাজা হযরত ইসা আলাইহিস সালামকে গ্রেপ্তারের উদ্দেশে একদল সৈন্য প্রেরণ করলো। সৈন্যরা ওখানে গিয়ে জায়গাটি ঘেরাও করে ফেললো। ইত্যবসরে আল্লাহ তাআলা ইসা আলাইহিস সালামকে ঊর্ধ্বজগতে তুলে নিলেন। সৈন্যরা ভেতরে প্রবেশ করে হাওয়ারিদের মধ্য থেকে মাত্র একজন ব্যক্তিকেই ইসা আলাইহিস সালাম-এর আকৃতির দেখতে পেলো এবং তাঁকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেলো। তারপর তাঁর সঙ্গে ওই সমস্ত ব্যবহার করলো যা উপরে বর্ণিত হয়েছে। এসব রেওয়ায়েতেই কেউ তাঁর নাম বলেছেন 'ইউদাস বিন কারইয়া ইউতা', কেউ বলেছেন 'জিরজিস' এবং অন্যরা বলেছেন 'দাউদ বিন লুযা'।

আবার এসব রেওয়ায়েতের কয়েকটিতে বর্ণিত হয়েছে যে, নিহত ব্যক্তিটি তাঁর আকৃতি ও গঠনে হযরত মাসিহ আলাইহিস সালাম-এর অবিকল সদৃশ্য ও তাঁর দ্বিতীয় ছবি ছিলেন। ইঞ্জিলের ইসরাইলি রেওয়ায়েতসমূহে আছে যে, হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর হওয়ারিদের মধ্য থেকে 'ইয়াহুদা আসখার লুতি' হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর সমাকৃতির ছিলেন। কিছু রেওয়ায়েতে আছে যে, যখন এই সঙ্কটাকীর্ণ মহূর্তটি এলো, ইসা আলাইহিস সালাম তাঁর হাওয়ারিদের সত্যের দাওয়াত ও তাবলিগ-সংক্রান্ত দীক্ষা ও হেদায়েত প্রদানের পর তাঁদেরকে বললেন, 'আল্লাহ তাআলা ওহির মাধ্যমে আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, আমাকে এক দীর্ঘকালের জন্য ঊর্ধ্বলোকে উঠিয়ে নেয়া হবে এবং এই ঘটনা আমার বিরোধী ও অনুসারী উভয় দলের জন্যই কঠিন পরীক্ষা ও বিপদের কারণ হবে। সুতরাং, তোমাদের মধ্য থেকে যে-কেউ এর জন্য প্রস্তুত হও যে, আল্লাহ তাআলা তাকে আমার সমাকৃতি করে দেবেন এবং সে আল্লাহর পথে শহীদ হয়ে যাবে, তার জন্য জান্নাত লাভের সুসংবাদ রয়েছে।' একজন হাওয়ারি সঙ্গে সঙ্গে সবার আগে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং নিজেকে ওই সেবার জন্য পরিবেশন করলেন। ফলে আল্লাহর পক্ষ থেকে ইনি হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর আকৃতি পেলেন এবং সৈন্যরা তাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেলো।[১১৬]

---

[১১৬] ঘটনার এই বিবরণগুলো তাফসিরে ইবনে কাসির, দ্বিতীয় খণ্ড এবং অন্যান্য তাফসিরের কিতাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

উল্লিখিত বিবরণসমূহ কুরআনেও নেই, মারফু হাদিসসমূহেও নেই। সুতরাং এই বিবরণগুলো শুদ্ধই হোক আর ভ্রান্তই হোক, মূল বিষয়টি যথাস্থানে অটল এবং কুরআনের আয়াতে অকাট্যরূপে প্রমাণিত। সুতরাং, রুচিবানদের ইখতিয়ার আছে, তাঁরা শুধু কুরআনের উল্লিখিত মোটামুটি বিবরণে সন্তুষ্ট থাকতে পারেন। অর্থাৎ, হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর উর্ধ্বলোকে উত্তোলিত হওয়া এবং সবদিক থেকে শত্রুদের হাত থেকে নিরাপদ ও সুরক্ষিত থাকা; এ ছাড়া, ইহুদিদের গোলকধাঁধায় পতিত হয়ে অন্য ব্যক্তিকে হত্যা করা, ইহুদি ও নাসারাদের কাছে এ-ব্যাপারে নিশ্চিত জ্ঞান ও বিশ্বাস না থাকার ফলে তাদের ধারণা, অনুমান, সন্দেহ ও বিভ্রমে পতিত হওয়া, তারপর কুরআন কর্তৃক প্রকৃত বিষয়টিকে দিব্যজ্ঞান ও দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে প্রকাশ করে দেয়া— এসবগুলোই প্রমাণিত সত্য। আর وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ 'কিন্তু তাদের এরূপ বিভ্রম ঘটেছিলো' এবং وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ 'যারা তার সম্পর্কে মতভেদ করেছিলো তারা নিশ্চয় এই সম্পর্কে সন্দিগ্ধ ছিলো' আয়াত দুটির তাফসিরে উল্লিখিত রেওয়ায়েতসমূহের বিবরণকেও গ্রহণ করুন এবং তা মেনে নিন এটা মনে করে যে, আলোচ্য আয়াতসমূহের তাফসির এসব বিবরণের ওপর নির্ভরশীল নয়; এগুলো বরং অতিরিক্ত বিষয়, যা আয়াতগুলোর যথার্থ তাফসিরের জন্য সহায়তাকারী।

হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর জীবিত থাকা

সুরা আলে ইমরান, সুরা মায়েদা ও সুরা নিসার আলোচ্য আয়াতসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা হযরত ইসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে এই মীমাংসা প্রদান করেছেন যে, তাঁকে জীবিত অবস্থায় উর্ধ্বলোকে উঠিয়ে নেয়া হয় এবং শত্রুদের ও কাফেরদের হাত থেকে পুরোপুরি সুরক্ষিত থাকেন। কিন্তু কুরআন এ-ব্যাপারে কেবল এতটুকুর ওপরই ক্ষান্ত হয় নি; বরং প্রেক্ষিত অনুসারে তাঁর বর্তমানে জীবিত থাকার ব্যাপারে অকাট্য প্রমাণ দ্বারা বিভিন্ন জায়গায় আলোকপাত করেছে। সেসব স্থানে হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর দীর্ঘ জীবন ও উর্ধ্বাকাশে উত্তোলন-এ যে-হেকমত নিহিত রয়েছে তার দিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে। যাতে সত্যাবলম্বীদের অন্তরসমূহ ঈমানের সজীবতা দ্বারা

প্রফুল্ল হয়ে ওঠে আর বাতিলপন্থীরা তাদের অভ্যন্তরীণ অন্ধত্বের জন্য লজ্জিত হয়।

আয়াত : لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ

وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا

"কিতাবিদের মধ্যে প্রত্যেকে তাদের মৃত্যুর পূর্বে তাকে (ইসা আলাইহিস সালামকে) বিশ্বাস করবেই এবং কিয়ামতের দিন সে (হযরত ইসা আলাইহিস সালাম) তাদের (ইহুদি ও নাসারাদের) বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে।" [সুরা নিসা : আয়াত ১৫৯]

এই আয়াতের পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে উল্লিখিত ঘটনাই বর্ণনা করা হয়েছে, অর্থাৎ, হযরত ইসা আলাইহিস সালামকে শূলেও চড়ানো হয় নি এবং তাকে হত্যাও করা হয় নি। বরং আল্লাহ তাআলা তাঁকে নিজের দিকে উঠিয়ে নিয়েছেন। এর মাধ্যমে ইহুদি ও নাসারারা তাদের বাতিল চিন্তা ও অনুমানের ওপর যে-আকিদা প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছিলো তাকে খণ্ডন করা হয়েছে। তাদেরকে বলা হয়েছে যে, হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর ব্যাপারে শূলিতে চড়ানো ও তাঁকে হত্যা করার দাবি লানত ও অভিশাপগ্রস্ততার উপযুক্ত। কারণ, অপবাদ ও লানত জমজ জিনিস। তারপর এই আয়াতে প্রথম বিষয়টির সত্যতা দৃঢ়ীকরণে এ-কথার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে যে, আজ তোমরা তোমাদের এই অভিশাপগ্রস্ত আকিদার জন্য গর্ববোধ করছো। তবে এমন সময়ও আসবে, যখন হযরত ইসা ইবনে মারইয়াম (আলাইহিমাস সালাম) মহান আল্লাহর প্রজ্ঞা ও কল্যাণকামিতার দাবি পূরণ করার জন্য পুনরায় এই পৃথিবীতে আগমন করবেন। সে-সময় ইহুদি ও নাসারাদের মধ্যে যারা জীবিত থাকবে তারা ইসা আলাইহিস সালামকে চাক্ষুষ দর্শন করবে এবং তাদের প্রত্যেকেরই কুরআনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর প্রতি ঈমান না আনা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে না। তারপর তিনি তাঁর নির্ধারিত আয়ুষ্কাল পূর্ণ করে মৃত্যুর কোলে আশ্রয় নেবেন। কিয়ামতের দিবসেও তিনি তার উম্মতদের (কিতাবিদের) ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করবেন, যেমন অন্য সকল নবী ও রাসুলই তাঁদের উম্মতদের ব্যাপারে সাক্ষী হবেন।

এটা কোনো অজ্ঞাত সত্য নয় যে, হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর ব্যাপারে ইহুদি ও নাসারা ঘটনা দুটি তথা শূলিতে চড়ানো ও হত্যা করার ব্যাপারে একমত। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে জাতি দুটির আকিদার ভিত্তি সম্পূর্ণরূপে বিপরীতমুখী নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। ইহুদিরা হযরত ইসা আলাইহিস সালামকে প্রতারক ও মিথ্যাবাদী বলে। এমনকি তাঁকে দাজ্জালও বলে। তারা গর্ব ও উল্লাস প্রকাশ করে যে, তারা ইয়াসু মাসিহকে (আলাইহিস সালাম) শূলিবিদ্ধ করেছে এবং ওই অবস্থায় হত্যা করে ফেলেছে। তাদের বিপরীতে নাসারাদের আকিদা এই যে, পৃথিবীর প্রথমমানব আদম (আলাইহিস সালাম) পাপাচারী ছিলেন এবং গোটা মানবজগৎ-ও পাপবিদ্ধ ছিলো। এ-কারণে আল্লাহর 'রহমত' গুণটি পৃথিবীকে পাপ থেকে মুক্তি দিতে চাইলো। ফলে 'রহমত' গুণটি 'পুত্রত্ব'-এর রূপ ধারণ করলো এবং তাকে পৃথিবীতে পাঠালো। যাতে সে ইহুদিদের হাতে শূলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হয় এবং এইভাবে অতীত ও ভবিষ্যতের বিশ্বনিখিলের যাবতীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়ে পৃথিবীর মুক্তির কারণ হয়।

সুরা নিসার আয়াতসমূহে কুরআন মাজিদ পরিষ্কার ভাষায় বলে দিয়েছে যে, হযরত ইসা আলাইহিস সালামকে হত্যা করার দাবি যে-আকিদার ওপরই প্রতিষ্ঠিত হোক না কেনো তা লানতের উপযুক্ত এবং লাঞ্ছনা ও ক্ষতির কারণ। আল্লাহ তাআলার সত্য নবীকে প্রতারক ও মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে এই আকিদা পোষণ করার লানতের কারণ। আল্লাহ তাআলার বান্দা ও হযরত মারইয়াম (আলাইহাস সালাম)-এর গর্ভজাত মানুষকে আল্লাহর পুত্র বানিয়ে এবং 'কাফ্ফারা'র ভ্রান্ত আকিদা উদ্ভাবন করে হযরত ইসা আলাইহিস সালামকে শূলে চড়ানো হয়েছে এবং হত্যা করা হয়েছে বলে বিশ্বাস করাও পথভ্রষ্টতা এবং জ্ঞান ও প্রত্যয়ের বিপরীতে অনুমানের তীরমাত্র। এ-ব্যাপারে সত্য ও সঠিক সিদ্ধান্ত তা-ই যা পবিত্র কুরআন ব্যক্ত করেছে, যার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে জ্ঞান ও ধ্রুববিশ্বাস এবং আল্লাহ তাআলার ওহির ওপর।

সুতরাং, আজ তোমাদের সামনে এই মতবিরোধের যা সন্দেহ ও অনুমানের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত মীমাংসার জন্য জ্ঞান ও ধ্রুববিশ্বাসের আলো এসেছে। তারপরও তোমরা তোমাদের অচল ধারণা ও ভ্রান্ত অনুমানের ওপর গোঁ ধরে বসে আছো এবং হযরত ইসা আলাইহিস

সালাম-এর ব্যাপারে বাতিল আকিদা পরিত্যাগ করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছো না। তা হলে পবিত্র কুরআনের আরো একটি সিদ্ধান্ত ও আল্লাহর ওহির ঘোষণা শুনে রাখো যে, তোমাদের বংশধরদের জন্য এমন একটি সময় আসবে যখন কুরআনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হযরত ইসা আলাইহিস সালাম ঊর্ধ্বলোক থেকে পুনরায় পৃথিবীর বুকে আগমন করবেন এবং তাঁর এই আগমন হবে দর্শনযোগ্য ব্যাপার। তখন ইহুদি ও নাসারাদের মধ্যে একজন সদস্যও এমন থাকবে না যে ইচ্ছাকৃতভাবে বা অনিচ্ছাকৃতভাবে ওই সম্মানিত সত্তার প্রতি ঈমান আনবে না। তাদের প্রত্যেকেই এই বিশ্বাস স্থাপন করবে যে, তিনি আল্লাহর সত্য রাসুল, আল্লাহর পুত্র নন, সম্মানিত ও মর্যাদাশীল ব্যক্তি; তাঁকে শূলিবিদ্ধও করা হয় নি এবং হত্যাও করা হয় নি। তিনি জীবিত অবস্থায় আমাদের চোখের সামনে উপস্থিত।

وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ

"কিতাবিদের মধ্যে প্রত্যেকে তাদের মৃত্যুর পূর্বে তাকে (ইসা আলাইহিস সালামকে) বিশ্বাস করবেই।"

এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, সুরা আলে ইমরান ও সুরা মায়েদার মতো এই আয়াতে হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর জন্য توفى শব্দটি ব্যবহৃত হয় নি; বরং স্পষ্টভাবে موت বা মৃত্যু শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এটা কেনো? শুধু এ-কারণে যে, ওই দুটি স্থানে (সুরা আলে ইমরান ও সুরা মায়েদা) যে-সত্য প্রকাশ করা উদ্দেশ্য তার জন্য توفى শব্দটিই যথার্থ। সুরা আলে ইমরানের আয়াতটির ব্যাখ্যায় ও তাফসিরে তা বর্ণনা করা হয়েছে এবং সুরা মায়িদার আয়াতটির তাফসির একটু পরেই বর্ণিত হবে। আর এখানে সরাসরি موت বা মৃত্যু শব্দটিই উল্লেখ করা উদ্দেশ্য এবং ওই অবস্থার বর্ণনা করা হয়েছে যার হযরত ইসা আলাইহিস সালামও كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ 'প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করবে'-এর প্রয়োগক্ষেত্র হবেন। সুতরাং এখানে موت বা মৃত্যু শব্দটি সরাসরি আনাই অত্যাবশ্যক ছিলো। আমাদের এই দাবিটির জন্য এটা আরো অধিক প্রমাণ যে, সুরা আলে ইমরান ও সুরা মায়েদার মধ্যে موت বা মৃত্যু শব্দটির পরিবর্তে توفى শব্দটি নিঃসন্দেহে বিশেষ

উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। অন্যথায় ওই দুটি স্থানে যেমন توفى শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, তেমনি এখানেও توفى শব্দটিকেই ব্যবহার করা হতো। অথবা, এখানে যেমন موت শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, তেমনি ওই দুটি ক্ষেত্রেও موت শব্দটি ব্যবহার করা উচিত ছিলো। কিন্তু কুরআনের এই সূক্ষ্ম বর্ণনাশৈলীর পার্থক্য উপলব্ধি করা কেবল সত্যান্বেষীদের ভাগ্যেই রয়েছে। বক্রপন্থা অবলম্বনকারী মিথ্যাবাদী কাদিয়ানি আর তার দোসর মিস্টার লাহোরির ভাগ্যে নয়। যারা নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলের জন্য প্রথমে একটি মতবাদ সৃষ্টি করে, তারপর এ-সংক্রান্ত কুরআনের যাবতীয় আয়াতকে তারই ছাঁচে ঢেলে তাকে 'কুরআনের তাফসির' নামে আখ্যায়িত করে।

যাই হোক। সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায়ে কেরামের কাছে শিরোনামে উল্লেখিত আয়াতটির তাফসির তা-ই যা উপরে বর্ণিত হয়েছে। বিখ্যাত মুহাদ্দিস, উচ্চস্তরের মুফাস্সির ও ইসলামি ইতিহাসবিদ আল্লামা ইমাদুদ্দিন বিন কাসির রহ. বর্ণিত তাফসিরকে আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) ও হাসান বসরি (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বিশুদ্ধ সনদের সঙ্গে উদ্ধৃত করে লিখেছেন—

وكذا قال قتادة، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وغير واحد. وهذا القول هو الحق، كما سنبينه بعد بالدليل القاطع، إن شاء الله، وبه الثقة وعليه التكلان.

"কাতাদা রহ., আবদুর রহমান বিন যায়দ বিন আসলাম রহ. ও একাধিক মুফাস্সির একই কথা বলেছেন। এই বক্তব্যই সঠিক। একটু পরেই আমরা তা অকাট্য দলিল-প্রমাণ দ্বারা স্পষ্ট করবো, ইনশাআল্লাহ। এটিই বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল ব্যাখ্যা।"[১১৭]

আর মুহাদ্দিসকুলের শিরোমণি ইবনে হাজার আসকালানি (রহিমাহুল্লাহ)-ও উল্লিখিত তাফসিরেরই সমর্থন করে বলছেন—

وبهذا جزم بن عباس فيما رواه بن جرير من طريق سعيد بن جبير عنه بإسناد صحيح ومن طريق أبي رجاء عن الحسن قال قبل موت عيسى والله إنه الآن لحي

---

[১১৭] তাফসিরে ইবনে কাসির, প্রথম খণ্ড, সুরা নিসা।

ولكن إذا نزل آمنوا به أجمعون ونقله عن أكثر أهل العلم ورجحه بن جرير وغيره

"এই তাফসিরের ব্যাপারেই হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) দৃঢ়মত পোষণ করেছেন। এই তাফসির ইবনে জারির সাঈদ বিন জুবায়েরের সূত্রে বিশুদ্ধ সনদের সঙ্গে তাঁর (আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন; আর আবু রেজার সূত্রে হাসান থেকে বর্ণনা করেছেন। আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা. বলেছেন, 'قبل موته 'তার মৃত্যুর পর'-এর অর্থ হলো قبل موت عيسى 'ইসা আলাইহিস সালাম-এর মৃত্যুর পর'। আল্লাহর কসম, নিশ্চয় তিনি (ইসা আলাইহিস সালাম) অবশ্যই (এখনো পর্যন্ত) জীবিত আছেন। কিন্তু যখন তিনি অবতরণ করবেন, তারা (ইহুদি ও নাসারা) সবাই তাঁর প্রতি ঈমান আনবে।' ইবনে জারির এই তাফসির সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায়ে কেরাম থেকে বর্ণনা করেছেন। আর ইবনে জারির ও অন্য মুফাস্‌সিরগণ এই তাফসিরকেই প্রণিধান দিয়েছেন।"[১১৮]

কিন্তু এই বিশুদ্ধ তাফসির ছাড়াও তাফসিরের কিতাবসমূহে যৌক্তিক সম্ভাবনার প্রেক্ষিতে আরো দুটি বক্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে। কিন্তু বক্তব্য দুটি সনদের বিচারে দুর্বল ও নির্ভরঅযোগ্য এবং আয়াতের পূর্বাপর সম্পর্কের বিচারে (অর্থাৎ, আলোচ্য আয়াতের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আয়াতসমূহের প্রতি লক্ষ করে) ভ্রান্ত ও ভ্রূক্ষেপঅযোগ্য। অর্থাৎ, এমন যৌক্তিক সম্ভাবনা যা রেওয়ায়েত ও আয়াতসমূহের পারস্পরিক শৃঙ্খলা ও পর্যায়ক্রমের বিরোধী।

এই দুটি সম্ভাবনামূলক বক্তব্যের একটির অর্থ এই যে, কুরআনের আয়াতে موته শব্দে ه সর্বনামটির উদ্দেশ্য হবে হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর পরিবর্তে আহলে কিতাব (ইহুদি ও নাসারা) এবং আয়াতটির অনুবাদ হবে এমন : 'আর আহলে কিতাবের মধ্যে কোনো সদস্যই এমন থাকবে না যে তার মৃত্যুর পূর্বে হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর প্রতি ঈমান আনবে না।' অর্থাৎ, ইহুদি ও নাসারারা তাদের জীবদ্দশায় হযরত

ইসা আলাইহিস সালাম-এর ব্যাপারে কুরআনে বর্ণিত আকিদায় বিশ্বাস স্থাপন করবে না এবং নিজ নিজ আকিদা-বিশ্বাসের ওপর অটল থাকবে; কিন্তু যখন তাদের মৃত্যু চলে আসবে, ওই অন্তিম সময়ে মুমূর্ষু অবস্থায়, যাকে প্রাণ টেনে বের করার অবস্থা বলা হয়, তারা বিশুদ্ধ আকিদা অনুযায়ী ঈমান আনবে। আর কিতাবি সম্প্রদায়ের (ইহুদি ও নাসারা) কাউকেই বাদ না দিয়ে প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই এই ব্যাপারটি ঘটবে।

আর দ্বিতীয় যৌক্তিক সম্ভাবনামূলক বক্তব্য এই যে, আহলে কিতাবের সবাই তাদের নিজ নিজ মৃত্যুর পূর্বে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি ঈমান আনে। অর্থাৎ, যখন সে পার্থিব জগৎ থেকে ছিন্নসম্পর্ক হয়ে অদৃশ্য জগতের সঙ্গে যুক্ত হতে চলে, তখন তার কাছে প্রকৃত সত্য উন্মোচিত হয়ে পড়ে যে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর সত্য নবী ছিলেন।

উল্লিখিত তাফসিরমূলক বক্তব্য দুটি যে সনদ ও রেওয়ায়েতের বিচারে নির্ভরঅযোগ্য ও অশুদ্ধ এবং আয়াতের পূর্বাপর সম্পর্কের বিরোধী তার থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেও, (এ-কথা বলা যা যে,) বক্তব্য দুটি যৌক্তিক দৃষ্টিকোণ থেকেও ভ্রান্ত। তার কারণ এই যে, যদি আয়াতটির অর্থ এটাই হয় যা উপরে বলা হয়েছে তবে আয়াতটি তার বর্ণনার বিপরীতে নিরর্থক ও নিষ্ফল হয়ে পড়বে (নাউযুবিল্লাহ)। কারণ কুরআন মাজিদ অন্যান্য স্থানে বলে দিয়েছে যে, মানুষ যখন পার্থিব জগৎ থেকে ছিন্নসম্পর্ক হয়ে অদৃশ্য জগতের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হতে চলে এবং প্রাণ টেনে বের করার সময় চলে আসে, যেসব ব্যাপার তার এই মুহূর্তটির পূর্ব পর্যন্ত অদৃশ্যের ব্যাপার ছিলো সেগুলো তার চাক্ষুষ দর্শনের মধ্যে আসতে শুরু করে, তখন তার আমল ও কর্মসমূহের হিসাব বন্ধ করে দেয়া হয় এবং তখন আকিদা পরিবর্তনের কোনো ফল ও প্রতিদান পাওয়া যায় না। অর্থাৎ, সে-সময় স্বীকৃতি ও স্বীকারোক্তিও বিবেচ্য নয় এবং অস্বীকারও বিবেচ্য নয়। পবিত্র কুরআন বলছে—

فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ () فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ

() فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ (سورة المؤمن)

"তাদের কাছে যখন স্পষ্ট নিদর্শনসহ রাসুল আসতো তখন তারা তাদের জ্ঞানের দম্ভ করতো। তারা যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো তা-ই তাদেরকে বেষ্টন করলো। তারপর তারা যখন আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করলো তখন বললো, 'আমরা এক আল্লাহতেই ঈমান আনলাম এবং আমরা তাঁর সঙ্গে যাদেরকে শরিক করতাম তাদের প্রত্যাখ্যান করলাম।' তারা যখন আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করলো তখন তাদের ঈমান তাদের কোনো উপকারে এলো না। আল্লাহর এই বিধান পূর্ব থেকেই তার বান্দাদের মধ্যে চলে আসছে এবং সেই ক্ষেত্রে কাফেররা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।" [সুরা মুমিন : আয়াত ৮৩-৮৫]

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (سورة النساء)

"তওবা তাদের জন্য নয় যারা আজীবন[১১৯] মন্দ কাজ করে, অবশেষে তাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হলে সে বলে, 'আমি এখন তওবা করছি' (প্রকাশ থাকে যে, এমন অবস্থার তওবা সত্যিকারের তওবা হয় না) এবং তাদের জন্যও নয়, যাদের মৃত্যু হয় কাফের অবস্থায়। এরাই তারা যাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তির ব্যবস্থা করেছি।" [সুরা নিসা : আয়াত ১৮]

সুতরাং, এই অবস্থায় হযরত ইসা আলাইহিস সালাম বা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার অর্থ কী? মানুষ যখন এই অবস্থায় পৌঁছে তখন তার সামনে থেকে অদৃশ্য জগতের পর্দাসমূহ দূরীভূত হয়ে যায় এবং আলমে বরযখ, আল্লাহর ফেরেশতামণ্ডলী, শাস্তি বা শান্তি, জান্নাত বা জাহান্নাম—মোটকথা, সত্যধর্মের শিখানো যাবতীয় সত্য তার চোখের সামনে উন্মোচিত হয়ে ওঠে। এতে ইহুদি বা নাসারাদেরই বা বিশেষত্ব কী? এই অবস্থা তো প্রত্যেক আদমসন্তানেরই হবে। তা ছাড়া, যখন এই প্রকারের ঈমান

---

[১১৯] حَتَّى-এর অর্থ এখানে আজীবন করা হয়েছে। মৃত্যুর স্পষ্ট নিদর্শন প্রকাশ পেলে তওবা কবুল হয় না।

কবুল হওয়ার যোগ্যই নয়, তখন তার উল্লেখ ওই বর্ণনা-পদ্ধতির সঙ্গেই হওয়া উচিত ছিলো যা ফেরআউনের নিমজ্জিত হওয়ার সময় ফেরআউনের ঈমানি স্বীকৃতি ও স্বীকারোক্তির জন্য অবলম্বন করা হয়েছে, যাতে ফেরআউনের ঈমানের ঘোষণাকে মূল্যহীন হওয়ার কথা প্রকাশ করা হয়েছে; এমন বর্ণনাপদ্ধতির সঙ্গে নয়, যেনো ভবিষ্যতে ঘটিতব্য কোনো মহান ঘটনার সংবাদ প্রদান করা হচ্ছে, যা সম্বোধিত ব্যক্তিদের (ইহুদি ও নাসারাদের) আকিদা ও বিশ্বাসের বিপরীতে হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-সম্পর্কিত কুরআনের সত্যতা প্রতিপাদন এবং তার সুদৃঢ় সিদ্ধান্তের জীবন্ত সাক্ষ্য হয়ে সামনে আসবে। অন্যথায় কোনো নাসারা বা ইহুদি মৃত্যুর পাঞ্জায় ধরা দেয়ার মুহূর্তে, প্রিয় প্রাণটাকে মৃত্যুর মুখে তুলে দেয়ার পূর্বে হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর প্রতি ঈমান আনলেই কী আর না আনলেই কী। তার এই সত্যায়ন ও ঈমান মানবজগতের জ্ঞান ও উপলব্ধির বাইরে কেবল সে ও তার স্রষ্টার সঙ্গে সম্পর্কিত। আর জানা কথা যে, এমন কথা এমন স্থানে বলা মোটেই স্থানোচিত নয়, যেখানে একটি জাতিকে তাদের একটি বিশেষ আকিদার কারণে দোষী ও অপরাধী সাব্যস্ত করতে সত্যের মীমাংসাকে দৃঢ়ীকরণে অতীত ও ভবিষ্যতে পৃথিবীর বুকে ঘটিত ও ঘটিতব্য ঘটনাসমূহকে উপস্থিত করা হচ্ছে, যেমন তা আয়াতটির পূর্বাপর সম্পর্কের দ্বারা প্রকাশ পাচ্ছে। তা ছাড়া এসব সম্ভাবনার অবকাশ এখানে নেই। কারণ, প্রাণ টেনে বের করার সময় হযরত ইসা আলাইহিস সালাম বা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি ঈমান আনা তো আহলে কিতাবের (ইহুদি ও নাসারার) ওইসব ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত যারা এই আয়াতটি নাযিল হওয়ার কিছুদিন পূর্বে বা বহু শতাব্দী পূর্বে গত হয়েছে ও মৃত্যুবরণ করেছে। সুতরাং, উল্লিখিত আয়াতে যদি এ-বিষয়বস্তু বর্ণনা করা উদ্দেশ্য হতো, তবে তার জন্য ভবিষ্যৎ কালবাচক দৃঢ়তার সঙ্গে لَيُؤْمِنَنَّ 'তারা অবশ্যই ঈমান আনবে' বলা আল্লাহর কালামের বালাগাত ও ফাসাহাতের সম্পূর্ণ বিপরীত। তার জন্য এমনভাবে বলা জরুরি ছিলো যা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ—তিন কালের জন্যই ব্যাপক। যাতে কুরআনের উদ্দেশ্য তার ব্যাপকতার প্রেক্ষিতে পুরোপুরিভাবে সম্পন্ন হতো।

তা ছাড়া, দ্বিতীয় অর্থটি তো সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও অসমঞ্জস, এ-কারণে যে, এই আয়াতের আগের ও পরের আয়াতগুলোতে, অর্থাৎ পূর্বাপর সম্পর্কে খাতিমুল আম্বিয়া মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উল্লেখ পর্যন্ত নেই। কেননা, আয়াতগুলোর প্রথম দিকে শুধু হযরত ইসা আলাইহিস সালামকে উল্লেখ করা হচ্ছে এবং শেষে দিকে বলা হয়েছে যে, وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا 'কিয়ামত দিবসে তিনি তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হবেন'। আর এটা স্পষ্ট কথা যে, এখানে সাক্ষী বলতে হযরত ইসা আলাইহিস সালামকে বুঝানো হয়েছে আর عَلَيْهِمْ 'তাদের বিরুদ্ধে' বলে তাঁর উম্মতকে বুঝানো হয়েছে। সুতরাং, নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উল্লেখ করা ছাড়া মধ্যস্থলের কোনো সর্বনামের উদ্দেশ্য তাঁর পবিত্র সত্তাকে সাব্যস্ত করা কেবল বালাগাত ও ফাসাহাতের বিরোধীই নয়; বরং আরবি ভাষার ব্যকরণেরও সম্পূর্ণ বিরোধী এবং তা সর্বনামসমূহের বিশৃঙ্খলাকেও আবশ্যক করে তোলে।

মোটকথা, কোনো সন্দেহ ও সংশয় ব্যতীত বিশুদ্ধ অর্থ সেটাই যা সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায়ে কেরাম গ্রহণ করেছেন। আর উল্লিখিত দুটি মনগড়া সম্ভাবনা আয়াতসমূহের তাফসির তো দূরের কথা, বিশুদ্ধ সম্ভাবনা নামে আখ্যায়িত করারও যোগ্য নয়।[১২০]

---

[১২০] এই স্থানটি ছাড়াও সুরা মায়িদার আয়াত مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ "মারইয়াম তনয় মাসিহ তো কেবল একজন রাসুল। তার পূর্বে অনেক রাসুল গত হয়েছে।" এবং সুরা আলে ইমরানের প্রথম থেকে বিরাশি আয়াত পর্যন্ত, যাতে নাজরানের প্রতিনিধি দলের আলোচনা রয়েছে,—এইসব স্থান স্পষ্ট নির্দেশের (دلالة النص) আকারে বা ইঙ্গিতার্থের (إشارة النص) আকারে হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর সশরীরে জীবিত থাকার জ্বলন্ত প্রমাণ। এসব দলিল-প্রমাণের বিবরণ ও সাক্ষ্য সংকলিত ও শৃঙ্খলিতরূপে আমার কাছে সংরক্ষিত আছে। তারপরও কিতাবের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় এখানে তা উল্লেখ করা থেকে বিরত থাকলাম। অবসর সময়ে ইনশাআল্লাহ একটি স্বতন্ত্র বিষয়বস্তুরূপে পাঠকবর্গের সামনে উপস্থিত করা হবে। কিংবা হুজ্জাতুল ইসলাম আল্লামা মুহাম্মদ আনওয়ার শাহ (নাওওয়ারাল্লাহু মারকাদাহু)-এর কিতাব 'আকিদাতুল ইসলাম ফি হায়াতি ইসা আলাইহিস সালাম' এই উদ্দেশ্যের জন্য প্রণিধানযোগ্য।—লেখক।

হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর জীবিত থাকা এবং পৃথিবীতে পুনরাগমন : সহিহ হাদিসসমূহ

কুরআন মাজিদ অলৌকিক সংক্ষিপ্ততার সঙ্গে হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর উর্ধ্বলোকে উত্তোলিত হওয়া, আজ পর্যন্ত জীবিত থাকা, কিয়ামতের আলামত হিসেবে পুনরায় আসমান থেকে অবতরণ সম্পর্কে যে-বিবরণ প্রদান করেছে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সহিহ হাদিসসমূহের ভাণ্ডারে ওই আয়াতগুলোরই বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করে ওইসব তথ্যকে আলোকিত করে তুলেছে।

হাদিসশাস্ত্রের ইমাম, ইমাম ইসমাইল বুখারি ও ইমাম মুসলিম (রাহিমাহুমাল্লাহ) সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিমে হযরত আবু হুরায়রাহ রা. থেকে বিভিন্ন ধরনের সূত্রে নিম্নলিখিত হাদিসটি বর্ণনা করেছেন—

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِه لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ وَيَفِيضَ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ حَتَّى تَكُونَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرًا مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ وَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ {وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِه قَبْلَ مَوْتِه وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا}

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ! অচিরেই ইসা ইবনে মারইয়াম ন্যায়পরায়ণ শাসক হিসেবে তোমাদের মধ্যে অবতরণ করবেন। তিনি (খ্রিস্টান ধর্মের প্রতীক) ক্রুশ ভেঙে ফেলবেন, শূকর হত্যা করবেন, জিযিয়া প্রথা বিলুপ্ত করবেন (অর্থাৎ, ইসলাম গ্রহণ ব্যতীত অন্যকিছু গ্রহণ করা হবে না) এবং ধন-সম্পদের এত প্রাচুর্য হবে যে, কেউ-ই তা গ্রহণ করবে না। সেই সময় একটি সেজদা দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে তা অপেক্ষা অধিক উত্তম হবে। (অর্থাৎ, মানুষ তখন ইবাদতমুখী হবে।)' তারপর আবু হুরায়রা রা. বলেন, যদি তোমরা চাও তবে প্রমাণ হিসেবে এই আয়াতটি পাঠ করো—

وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا

"কিতাবিদের মধ্যে প্রত্যেকে তাদের মৃত্যুর পূর্বে তাকে (ইসা আলাইহিস সালামকে) বিশ্বাস করবেই এবং কিয়ামতের দিন সে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে।" [সুরা নিসা : আয়াত ১৫৯][১২১]

সহিহ মুসলিম ও সহিহ বুখারিতে আবু কাতাদা আনসারি (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর আযাদকৃত গোলাম হযরত নাফে রা.-এর সূত্রে হযরত আবু হুরায়রাহ রা. থেকে নিম্নলিখিত হাদিসটি উদ্ধৃত করা হয়েছে—

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيكُمْ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ.

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'তখন তোমাদের অবস্থা কেমন হবে যখন ইসা ইবনে মারইয়াম তোমাদের মধ্যে অবতরণ করবেন এবং ইমাম হবেন তোমাদের মধ্য থেকে।' (অর্থাৎ, ইসা আলাইহিস সালাম হবেন শাসক, আর নামাযের ইমামতি করবেন মাহদি আলাইহিস সালাম।)[১২২]

এই দুটি হাদিস ছাড়াও হযরত আবু হুরায়রাহ রা. থেকে বিভিন্ন সূত্রে আরো অনেক হাদিস সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম, মুসনাদে আহমদ এবং সুনানসমূহে (সুনানে আবি দাউদ, সুনানে নাসায়ি, সুনানুত তিরমিযি ও সুনানে ইবনে মাজাহ) বর্ণনা করা হয়েছে। এসব হাদিস এই একই অর্থ ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করছে। এই হাদিসগুলোর মধ্যে একটি হাদিস অধিক বিস্তারিত এবং আলোচ্য বিষয়টির অন্যান্য কতিপয় দিকও প্রকাশ করছে। মুসনাদে আহমদে আছে—

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلَّاتٍ أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ وَأَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ نَازِلٌ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَاعْرِفُوهُ رَجُلًا مَرْبُوعًا إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ

---

[১২১] সহিহ বুখারি : হাদিস ৩৪৪৮। অনুচ্ছেদ : ইসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস সালাম-এর অবতরণ

[১২২] সহিহ মুসলিম : হাদিস ৪০৯।

مُمصَّرَان كَأَنَّ رَأْسَهُ يَقْطُرُ وَإِنْ لَمْ يُصِبْهُ بَلَلٌ فَيَدُقُّ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ وَيَدْعُو النَّاسَ إِلَى الْإِسْلَامِ فَيُهْلِكُ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمِلَلَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِسْلَامَ وَيُهْلِكُ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ وَتَقَعُ الْأَمَنَةُ عَلَى الْأَرْضِ حَتَّى تَرْتَعَ الْأُسُودُ مَعَ الْإِبِلِ وَالنِّمَارُ مَعَ الْبَقَرِ وَالذِّئَابُ مَعَ الْغَنَمِ وَيَلْعَبَ الصِّبْيَانُ بِالْحَيَّاتِ لَا تَضُرُّهُمْ فَيَمْكُثُ أَرْبَعِينَ سَنَةً ثُمَّ يُتَوَفَّى وَيُصَلِّي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ وَيَدْفِنُونَهُ.

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'নবীগণ বৈমাত্রেয় ভাইদের মতো; তাঁদের মা ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু সবার ধর্ম এক (তাওহিদ, রিসালাত, মৌল বিশ্বাস)। আর আমি অন্যান্য নবীর তুলনায় হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর অধিক নিকটবর্তী। কেননা, আমার ও তাঁর মধ্যকালে কোনো নবী প্রেরিত হন নি। নিঃসন্দেহে তিনি পুনরায় পৃথিবীর বুকে অবতরণ করবেন। সুতরাং, যখন তোমরা তাঁকে দেখবে, তাঁর চেহারা ও আকৃতি দেখে চিনে নেবে : তিনি মধ্যমাকৃতি, রক্তিম সাদা বর্ণের হবেন, তাঁর দেহের ওপর দুটি লালচে রঙের চাদর থাকবে। প্রথম দৃষ্টিতেই এমন মনে হবে যে, তিনি এইমাত্র গোসল করে এসেছেন এবং তাঁর মাথা থেকে পানির ফোঁটাগুলো মুক্তার মতো পড়ছে। তিনি (খ্রিস্টান ধর্মের প্রতীক) ক্রুশ ভেঙে ফেলবেন, শূকর হত্যা করবেন, জিযিয়া প্রথা বিলুপ্ত করবেন (অর্থাৎ, ইসলাম গ্রহণ ব্যতীত অন্যকিছু গ্রহণ করা হবে না)। তিনি মানুষকে ইসলাম ধর্মের দাওয়াত প্রদান করবেন এবং আল্লাহ তাআলা তাঁর সময়ে সব বাতিল ধর্মকে বিলুপ্ত করে দেবেন এবং একমাত্র ইসলাম ধর্মই অবশিষ্ট থাকবে। আল্লাহ তাআলা তাঁর সময়ে 'মাসিহ দাজ্জাল'কে ধ্বংস করবেন। বিশ্বজগতে শুধু আমানত—ভালো ও সৎকাজই স্থান করে নেবে। এমনকি সিংহকে উটের সঙ্গে, চিতাবাঘকে গরুর সঙ্গে এবং নেকড়েকে বকরির সঙ্গে বিচরণ করতে দেখা যাবে। শিশুরা সাপ নিয়ে খেলা করবে; কিন্তু সাপ তাদেরকে দংশন করবে না। ইসা আলাইহিস সালাম এই পৃথিবীর বুকে চল্লিশ বছর জীবিত থেকে

স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করবেন। মুসলমানগণ তাঁর জানাযার নামায পড়বেন এবং তাঁকে দাফন করবেন।'[১২৩]

আর সহিহ মুসলিম শরিফে হযরত আবু হুরায়রাহ রা. থেকে একটি দীর্ঘ হাদিস বর্ণনা করা হয়েছে। তাতে দাজ্জালের বহিরাগমনের কথা উল্লেখ করে নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এই পবিত্র বাণীটিও উদ্ধৃত করা হয়েছে—

فَإِذَا جَاءُوا الشَّأْمَ خَرَجَ فَبَيْنَمَا هُمْ يُعِدُّونَ لِلْقِتَالِ يُسَوُّونَ الصُّفُوفَ إِذْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ فَأَمَّهُمْ فَإِذَا رَآهُ عَدُوُّ اللَّهِ ذَابَ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ فَلَوْ تَرَكَهُ لَانْذَابَ حَتَّى يَهْلِكَ وَلَكِنْ يَقْتُلُهُ اللَّهُ بِيَدِهِ فَيُرِيهِمْ دَمَهُ فِي حَرْبَتِهِ.

"যখন (মুসলমানগণ কনস্ট্যান্টিনোপল ত্যাগ করে) সিরিয়ায় প্রবেশ করবে তখনই দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে। এই সময় মুসলমানগণ দাজ্জালের সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রস্তুতি নিতে থাকবে এবং সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে যাবে। তৎক্ষণাৎ নামাযের উদ্দেশ্যে (মুয়াজ্জিন কর্তৃক) একামত দেয়া হবে এবং এই মুহূর্তে হযরত ইসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস সালাম আকাশ থেকে (দামেস্কের জামে মসজিদের মিনারায়) অবতরণ করবেন এবং মুসলমানদেরকে নামায পড়াবেন (ইমামতি করবেন)। তারপর আল্লাহর দুশমন (দাজ্জাল) তাঁকে দেখতে পাবে, তখন সে এমনভাবে গলে যেতে থাকবে যেভাবে লবণ পানিতে গলে যায়। আর যদি হযরত ইসা আলাইহিস সালাম তাঁকে এমনিতেই ছেড়ে দিতেন, তবুও সে এমনিতেই গলে গিয়ে ধ্বংস হয়ে যেতো; কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাঁকে হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর হাতেই হত্যা করাবেন। তারপর হযরত ইসা আলাইহিস সালাম যে-বর্শা দ্বারা তাকে হত্যা করবেন, সেই রক্তমাখা বর্শাটি তিনি লোকদের সবাইকে দেখাবেন।"[১২৪]

সহিহ মুসলিম শরিফে নাওয়াস বিন সিমআন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে একটি দীর্ঘ হাদিস বর্ণনা করা হয়েছে। তাতে উল্লেখ করা হয়েছে—

---

[১২৩] মুসনাদে আহমদ : হাদিস ৯৬৩২।

[১২৪] সহিহ মুসলিম : হাদিস ৭৪৬০।

فَبَيْنما هُوَ كَذلِكَ إِذْ بَعَثَ اللّهُ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ فَيَنْزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ بَيْنَ مَهْرُودَتَيْنِ وَاضِعًا كَفَّيْهِ عَلَى أَجْنِحَةِ مَلَكَيْنِ إِذَا طَأْطَأَ رَأْسَهُ قَطَرَ وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ جُمَانٌ كَاللُّؤْلُؤِ فَلاَ يَحِلُّ لِكَافِرٍ يَجِدُ رِيحَ نَفَسِهِ إِلاَّ مَاتَ وَنَفَسُهُ يَنْتَهِي حَيْثُ يَنْتَهِي طَرْفُهُ فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ بِبَابِ لُدٍّ فَيَقْتُلُهُ ثُمَّ يَأْتِي عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ قَوْمٌ قَدْ عَصَمَهُمُ اللّهُ مِنْهُ فَيَمْسَحُ عَنْ وُجُوهِهِمْ وَيُحَدِّثُهُمْ بِدَرَجَاتِهِمْ فِي الْجَنَّةِ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أَوْحَى اللّهُ إِلَى عِيسَى إِنِّي قَدْ أَخْرَجْتُ عِبَادًا لِي لاَ يَدَانِ لأَحَدٍ بِقِتَالِهِمْ فَحَرِّزْ عِبَادِي إِلَى الطُّورِ. وَيَبْعَثُ اللّهُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ.

(হযরত নাওয়াস বিন সামআন রা. বলেন. একবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাজ্জালের আলোচনা করে বললেন,) সে (দাজ্জাল) এইসব কর্মকাণ্ডে লিপ্ত থাকবে, ঠিক এমন সময় আল্লাহ তাআলা হঠাৎ হযরত ইসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস সালাম-কে (আসমান থেকে) প্রেরণ করবেন এবং তিনি দামেস্কের পূর্বপ্রান্তের সাদা মিনারা থেকে হলুদ বর্ণের দুটি কাপড় পরিহিত অবস্থায় দুইজন ফেরেশতার পাখায় হাত রেখে অবতরণ করবেন। তিনি যখন মাথা নিচু করবেন তখন ফোঁটা ফোঁটা ঘাম ঝরবে আর যখন মাথা উঁচু করবেন তখন তা স্বচ্ছ মুক্তার মতো ঝরতে থাকবে। (মনে হবে, যেনো তিনি এইমাত্র গোসল করে এসেছেন।) যে-কোনো কাফের তাঁর শ্বাসের বায়ু পাবে সে তৎক্ষণাৎ মৃত্যুবরণ করবে। এবং তাঁর শ্বাসবায়ু তাঁর দৃষ্টির প্রান্ত সীমা পর্যন্ত পৌছে যাবে। এই অবস্থায় তিনি দাজ্জালকে খোঁজ করতে থাকবেন। অবশেষে তিনি তাকে (বাইতুল মুকাদ্দাসের নিকটবর্তী) লুদ্দ নামক এলাকার ফটকের কাছে পেয়ে তাকে হত্যা করবেন। অবশেষে এমন একটি সম্প্রদায় হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর কাছে আসবে যাদেরকে আল্লাহ তাআলা দাজ্জালের ফেতনা থেকে নিরাপদে রেখেছেন। তিনি তখন তাদের মুখমণ্ডলে হাত ফেরাবেন (হাত দিয়ে মুছবেন) এবং জান্নাতে তাদের জন্য কী পরিমাণ উচ্চ মর্যাদা রয়েছে তার সুসংবাদও প্রদান করবেন। এদিকে তিনি এইসব কাজে লিপ্ত থাকতেই আল্লাহ

আমি আমার এমন কিছুসংখ্যক বান্দা সৃষ্টি করে রেখেছি, যাদের কাবিলার শক্তি কারো নেই। সুতরাং, তুমি আমার বান্দাদেরকে তুর হাড়ে নিয়ে গিয়ে হেফাজত (একত্র) করো। তারপর আল্লাহ তাআলা াজুজ ও মাজুজকে পাঠাবেন। তারা প্রতিটি উঁচু ভূমি থেকে খুব দ্রুত চর ভূমিতে ছড়িয়ে পড়বে।"[১২৫]

াং বিভিন্ন সূত্রে সঙ্গে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ. তাঁর 'মুসনাদে' াং ইমাম তিরমিযি রহ. তাঁর সুনানে হযরত মুজাম্মাআ বিন জারিয়া রিসা) (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে সহিহ সনদের সঙ্গে বর্ণনা করেছেন নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

يقتل ابن مريم الدجال بباب لد

াসিহ ইবনে মারইয়াম দাজ্জালকে লুদের ফটকে[১২৬] হত্যা বেন।"[১২৭]

াম তিরমিযি এই হাদিস বর্ণনা করার পর বলেছেন, هذا حديث صحيح া একটি সহিহ হাদিস। হাদিসের সঙ্গে তিনি সাহাবায়ে কেরামের দিয়াল্লাহু আনহুম) একটি তালিকা দিয়েছেন, যাঁদের থেকে হাদিসের তাবসমূহে হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর আসমান থেকে তরণ ও তাঁর হাতে দাজ্জালের নিহত হওয়া-সম্পর্কিত হাদিসসমূহ না করা হয়েছে। ইমাম তিরমিযি বলেন,

وفي الباب عن عمران بن حصين ونافع بن عتبة وأبي برزة وحذيفة بن أسيد ا هريرة وكيسان وعثمان بن أبي العاص وجابر وأبي أمامة وابن مسعود و عبد بن عمرو وسمرة بن جندب والنواس بن سمعان وعمرو بن عوف وحذيفة اليمان .

ই অধ্যায়ে

১. ইমরান বিন হুসাইন রা.,
২. নাফে বিন উতবা রা.,

সহিহ মুসলিম : হাদিস ৭৫৬০।

দামেস্ক নগরীর শহর-প্রাচীরের একটি ফটক। ফিলিস্তিনের একটি এলাকার নামও।

সুনানে তিরমিযি : হাদিস ২৩৪৫; মুসনাদে আহমদ : হাদিস ১৫৫০৫।

৩. আবু বারযা আসলামি রা.,
৪. হুযাইফা বিন আসিদ রা.,
৫. আবু হুরায়রাহ রা.,
৬. কাইসান রা.,
৭. উসমান বিন আবুল আস রা.,
৮. জাবির বিন আবদুল্লাহ রা.,
৯. আবু উমাম বাহেলি রা.,
১০. আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রা.,
১১. আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস রা.,
১২. সামুরা বিন জুনদুব রা.,
১৩. নাওয়াস বিন সিমআন রা.,
১৪. আমর বিন আওফ রা.,
১৫. হুযায়ফা বিন ইয়ামান রা. থেকে হাদিস বর্ণনা করা হয়েছে।"[১২৮]

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ. তাঁর 'মুসনাদে', ইমাম মুসলিম রহ. তাঁর সহিহ মুসলিমে আর সুনান-সংকলকগণ তাঁদের সুনানে হযরত হুযায়ফা বিন আসিদ রা.-এর সূত্রে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে নিম্নলিখিত হাদিসটি বর্ণনা করেছেন—

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدِ الْغِفَارِيِّ قَالَ اطَّلَعَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- عَلَيْنَا وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ فَقَالَ « مَا تَذَاكَرُونَ ». قَالُوا نَذْكُرُ السَّاعَةَ. قَالَ « إِنَّهَا لَنْ تَقُومَ حَتَّى تَرَوْنَ قَبْلَهَا عَشْرَ آيَاتٍ ». فَذَكَرَ الدُّخَانَ وَالدَّجَّالَ وَالدَّابَّةَ وَطُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَنُزُولَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ -صلى الله عليه وسلم- وَيَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَثَلاَثَةَ خُسُوفٍ خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ وَخَسْفٌ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ تَطْرُدُ النَّاسَ إِلَى مَحْشَرِهِمْ.

হযরত হুযাইফ বিন আসিদ আল-গিফারি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা পরস্পর কথাবার্তা বলছিলাম। এমন সময় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের কাছে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন,

---

[১২৮] সুনানে তিরমিযি : باب ما جاء في قتل عيسى بن مريم الدجال।

'তোমরা কী সম্পর্কে আলোচনা করছো?' তাঁরা বললেন, 'আমরা কিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করছি।' তখন তিনি বললেন, 'তোমরা দশটি নিদর্শন না দেখা পর্যন্ত কেয়ামত কায়েম হবে না : ১. ধোঁয়া (যা এক নাগাড়ে চল্লিশদিন পূর্ব প্রান্ত থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে থাকবে।) ২. দাজ্জাল; ৩. চতুষ্পদ জন্তু; ৪. পশ্চিমাকাশ থেকে সূর্য উদিত হওয়া; ৫. হযরত ইসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস সালাম-এর (আকাশ থেকে) অবতরণ; ৬. ইয়াজুজ ও মাজুজ; তিনটি ভূমিধস—৭. পূর্বাঞ্চলে ভূমিধস, ৮. পশ্চিমাঞ্চলে ভূমিধস; ৯. আরব উপদ্বীপে ভূমিধস এবং ১০. সর্বশেষ ইয়ামান থেকে এমন এক আগুন বের হবে, যা মানুষদেরকে তাড়িয়ে একটি সমবেত হওয়ার স্থানের দিকে নিয়ে যাবে।'[১২৯]

আর মুহাদ্দিস ইবনে আবি হাতিম রহ. এবং উচ্চস্তরের মুহাদ্দিস ও মুফাস্সির ইবনে জারির তাবারি রহ. হাসান বসরি (রাহিমাহুল্লাহ)-এর সূত্রে বিশুদ্ধ সনদের সঙ্গে হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর জীবিত থাকা ও পৃথিবীতে অবতরণ করা সম্পর্কে একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন—

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لليهود، إن عيسى لم يمت وإنه راجع إليكم قبل يوم القيامة

"রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহুদিদের বললেন, নিশ্চয় ইসা বিন মারইয়াম মরেন নি এবং নিশ্চয় তিনি কিয়ামত দিবসের পূর্বে তোমাদের কাছে ফিরে আসবেন।"

অনুরূপ ইবনে আবি হাতিম রহ. ও ইবনে জারির তাবারি রহ. সুরা নিসার নাজরানের প্রতিনিধি দল সম্পর্কিত আয়াতগুলোর তাফসির করতে গিয়ে

---

[১২৯] সহিহ মুসলিম : হাদিস ৭৪৬৭; মুসনাদে আহমদ : হাদিস ১৬১৪১; মিশকাতুল মাসাবিহ : হাদিস ৫৪৬৪।

এই হাদিসে কিয়ামতের যেসব আলামত উল্লেখ করা হয়েছে তার সবগুলোই ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। কিন্তু এখানে তাদের ব্যাখ্যা প্রদান করা স্থানোচিত নয়, তাই তা বাদ দিলাম। এসব আলামতের বিস্তারিত ব্যাখ্যা তাফসির ও হাদিসের কিতাবসমূহ, এবং হযরত শাহ রফিউদ্দিন দেহলবি (নাওওয়ারাল্লাহু মারকাদাহু) কর্তৃক রচিত গ্রন্থ 'আলামতে কিয়ামত' পাঠ করা যেতে পারে।—লেখক।

উসুলে হাদিসের দৃষ্টিকোণ থেকে উত্তম সনদের সঙ্গে রাবি বিন আনাস "রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে একটি দীর্ঘ হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাতেও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে—

فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم : « ألستم تعلمون أن ربنا حي لا يموت وأن عيسى يأتي عليه الفناء ؟

"তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিনিধি দলের সদস্যদের বললেন, তোমরা কি জানো না যে, আমাদের প্রতিপালক চিরঞ্জীব—কখনো তাঁর মৃত্যু নেই আর ইসা আলাইহিস সালামকে অবশ্যই মৃত্যুমুখে পতিত হতে হবে?"[১৩০]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখানে ভবিষ্যৎ-জ্ঞাপক ক্রিয়া يأتي عليه الفناء 'তাঁকে মৃত্যুমুখে পতিত হতে হবে' বলেছেন; অতীতকাল-জ্ঞাপক ক্রিয়া 'মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন' বলেন নি।

ইমাম আবু বকর আল-বায়হাকি রহ. তাঁর الأسماء والصفات গ্রন্থে এবং মুহাদ্দিস আলি বিন হিসামুদ্দিন মুত্তাকি গুজরাটি তাঁর كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال গ্রন্থে এ-ব্যাপারে উত্তম ও বিশুদ্ধ সনদের সঙ্গে যেসকল রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন সেগুলোতে হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর অবতরণের সঙ্গে من السماء (আসমান থেকে) শব্দটি পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।[১৩১]

এগুলো এবং এ-ধরনের অনেক হাদিসের ভাণ্ডার আছে। সেগুলো বনি ইসরাইলের নবী হযরত ইসা মাসিহ আলাইহিস সালাম-এর জীবিত থাকা ও পৃথিবীতে অবতরণ প্রসঙ্গে হাদিস ও তাফসিরের কিতাবসমূহে বর্ণিত হয়েছে। হাদিসগুলো সনদের শক্তির দিক থেকে 'সহিহ' ও 'হাসানে'র চেয়ে নিম্নস্তরের নয়। আর শুহরত বা প্রসিদ্ধি ও তাওয়াতুর বা বহুসংখ্যক রাবি (বর্ণনাকারী) কর্তৃক বর্ণিত হওয়ার বিবেচনায় হাদিসগুলোর অবস্থা

---

[১৩০] দেখুন : تفسير ابن أبي حاتم।

[১৩১] الأسماء والصفات, পৃষ্ঠা ৩০১; كنز العمال, সপ্তম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৬৮।

এই যে, ইমাম তিরমিযির বক্তব্য অনুযায়ী হাফেযে হাদিস ইমাদুদ্দিন বিন কাসির রহ., হাফেযে হাদিস ইবনে হাজার আসকালানি রহ. এবং হাদিসশাস্ত্রের অন্য ইমামগণ ১৬ জন[১৩২] উচ্চশ্রেণির সাহাবি (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) থেকে এই হাদিসগুলো বর্ণনা করেছেন। ১৬ জন সাবাবির মধ্যে কয়েকজন দাবি করেছেন যে, নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শত শত সাহাবায়ে কেরামের মজলিসে খুতবা প্রদান করে এসব কথা বলেছেন এবং এ-সকল সাহাবায়ে কেরাম কোনো ধরনের অস্বীকৃতি ও আজগুবি বলে মনে না করে খুলাফায়ে রাশিদুন (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)-এর যুগে বহুসংখ্যক সাহাবায়ে কেরামের সামনে হাদিসগুলো শুনিয়েছেন। তারপর এ-সকল সম্মানিত সাহাবায়ে কেরাম থেকে তাঁদের হাজার হাজার শাগরিদ (তাবিয়িন) হাদিসগুলো শুনেছেন। তাঁদের মধ্য থেকে উচ্চ মর্যাদাবান ব্যক্তিবর্গের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁদের প্রত্যেকেই হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে দৃঢ়তা ও স্মরণশক্তি, বিশ্বস্ততা ও অগাধ পাণ্ডিত্যের প্রেক্ষিতে ইমাম ও নেতা হওয়ার অধিকার রাখেন। যেমন : হযরত সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব রহ., আবু কাতাদা (রহ.)-এর আযাদকৃত গোলাম নাফে রহ., হানযালা বিন আলি আল-আসলামি রহ., আবদুর রহমান বিন আদম রহ., আবু সালামা রহ., আবু উমরাহ রহ., আতা বিন বাশ্শার রহ., আবু সুহাইল রহ., মুওয়াস্সার বিন গিফারাহ রহ., ইয়াহইয়া বিন আবু আমর রহ., জুবাইর বিন নুদাইর রহ., উরওয়া বিন মাসউদ সাকাফি রহ., আবদুল্লাহ বিন যায়দ আনসারি রহ., আবু যুরআহ, ইয়াকুব বিন আমের রহ., আবু নাসরাহ রহ., আবুত তুফায়েল রহ.।

এ-সকল যুগশ্রেষ্ঠ মহান আলেমে দীন ও সম্মানিত মুহাদ্দিস থেকে অগুনতি শাগরিদ হাদিসগুলো শ্রবণ করেছেন। তাঁদের মধ্যে 'হাদিসের রাবিগণের স্তরবিন্যাস'-এ যাঁরা ইলমুল কুরআন ও ইলমুল হাদিসের ক্ষেত্রে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী এবং যাঁরা নিজ নিজ সময়ে 'ইমামুল হাদিস' ও 'আমিরুল মুমিনিন ফিল হাদিস' উপাধি অর্জন করেছিলেন তাঁদের কয়েকজনের নাম এই : ইবনে শিহাব যুহরি রহ., সুফয়ান বিন উইয়াইনাহ রহ., লাইস, ইবনে আবি যাহাব রহ., আওযায়ি রহ.,

[১৩২] ইমাম তিরমিযি ১৫ জন উল্লেখ করেছেন।

কাতাদা রহ., আবদুর রহমান বিন আবু উমরাহ রহ., সুহাইল, জাবালাহ বিন সুহাইম রহ., আলি বিন যায়দ রহ., আবু রাফে রহ., আবদুর রহমান বিন যুবায়ের রহ., নুমান বিন সালিম রহ., মা'মার রহ., আবদুর রহমান বিন উবায়দুল্লাহ রহ.।

মোটকথা, এ-সকল রেওয়ায়েত ও হাদিস সাহাবায়ে কেরাম, তাবিয়িন, তাবে তাবিয়িন, অর্থাৎ 'খাইরুল কুরুন'-এর স্তরে এই পর্যায়ের প্রসার লাভ করেছিলো এবং কারো অস্বীকার ব্যতিরেকে এই প্রর্যায়ের গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছিলো যে, হাদিসশাস্ত্রের ইমামগণের কাছে হযরত মাসিহ আলাইহিস সালাম-এর জীবিত থাকা ও পৃথিবীতে অবতরণ-সম্পর্কিত হাদিসগুলো তাদের অর্থ ও উদ্দেশ্যের প্রেক্ষিতে 'তাওয়াতুর' (হাদিসে মুতাওয়াতির)-এর[১৩৩] মর্যাদা লাভ করেছিলো। এ-কারণেই তাঁরা দ্বিধাহীনভাবে এ-বিষয়টিকে (ইসা আলাইহিস সালাম-এর জীবিত থাকা ও অবতরণ) মুতাওয়াতির হাদিস দ্বারা প্রমাণিত ও স্বীকৃত বলে মত প্রকাশ করেছেন। বাস্তব অবস্থাও এটাই যে, হাদিস বর্ণনার সকল স্তরে ও সকল পর্যায়ে এই হাদিসগুলো এই পর্যায়ের গ্রহণযোগ্য পেয়েছিলো যে, প্রতিটি যুগে সেগুলোর বর্ণনাকারীদের মধ্যে এমন ব্যক্তিবর্গকে দেখা যাচ্ছে, যাঁরা ছিলেন হাদিসশাস্ত্রের ইমাম এবং যাঁদের ওপর হাদিসের বর্ণনা নির্ভর করতো। এ-কারণেই এই 'মারফু' ও 'সাহাবায়ে কেরামের ওপর সীমাবদ্ধ 'মাওকুফ' হাদিস ও রেওয়ায়েতগুলোর বর্ণনাকারীদের মধ্যে ইমাম আহমদ, ইমাম বুখারি, ইমাম মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ি, তিরমিযি, ইবনে মাজাহর মতো সহিহ ও সুনান সংকলনকারী ইমামগণের নাম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তাঁরা সবাই এই হাদিসগুলোকে ঐকমত্যের সঙ্গে সহিহ ও হাসান বলে আখ্যায়িত করেছেন। এসব হাদিস ও এই প্রকারেরই অন্যান্য সহিহ হাদিস উল্লেখ করে বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও মুফাস্‌সির ইমাদুদ্দিন বিন কাসির তাঁর তাফসিরে প্রথমেই এই শিরোনাম দাঁড় করিয়েছেন—

---

[১৩৩] যে-হাদিসের সনদের সকল স্তরেই বর্ণনাকারীদের সংখ্যা এত বেশি হয় যে, তাঁদের সবার একত্র হয়ে মিথ্যা কথা রচনা করা বা বলা স্বভাবতই অসম্ভব বলে মনে হয়, এমন হাদিসকে হাদিসে মুতাওয়াতির বলে। যেমন إنما الأعمال بالنيات 'সকল আমলের মূল্যায়ন নিয়ত অনুযায়ীই হয়' হাদিসটি সাতশতেরও অধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

ذكر الأحاديث الواردة في نزول عيسى ابن مريم إلى الأرض من السماء في آخ

الزمان قبل يوم القيامة، وأنه يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له

সা ইবনে মারইয়াম (আলাইহিস সালাম)-এর আখেরি যুগে য়ামতের পূর্বে আসমান থেকে পৃথিবীর বুকে অবতরণ এবং এক ও দ্বিতীয় আল্লাহর প্রতি আহ্বান প্রসঙ্গে বর্ণিত হাদিসসমূহের লোচনা।"[১৩৪]

রপর প্রাসঙ্গিক হাদিসসমূহ উদ্ধৃত করার পর সবশেষে লিখেছেন—

فهذه أحاديث متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هرير

وابن مسعود، وعثمان بن أبي العاص، وأبي أمامة، والنواس بن سمعان، وعبد ال

بن عمرو بن العاص، ومجمع بن جارية (حارثة) وأبي سريحة وحذيفة بن أسيد،

رضي الله عنهم.

وفيها دلالة على صفة نزوله ومكانه، من أنه بالشام، بل بدمشق، عند المنارة

الشرقية، وأن ذلك يكون عند إقامة الصلاة للصبح

াদিসগুলো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে তাওয়াতিররূপে বর্ণিত হয়েছে—আবু হুরায়রাহ, আবদুল্লাহ বিন সউদ, উসমান বিন আবুল আস, আবু উমামা, নাওয়াস বিন সিমআন, বদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস, মুজাম্মাআ বিন জারিয়া (হারিসা), বু সুরাইহ ও হুযায়ফাহ বিন আসিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুম-এর সূত্রে। সব হাদিসে হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর অবতরণ-পদ্ধতি ও বতরণের স্থানের ব্যাপারে আলোকপাত করা হয়েছে। অর্থাৎ, তিনি মের (সিরিয়ার) দামেস্কে পূর্বদিকের মিনারায় ফজরের নামাযের সময় বতরণ করবেন।"[১৩৫]

র হাফেযে হাদিস ইবনে হাজার আসকালানি (নাওওয়ারাল্লাহু রকাদাহু) আল্লামা আবুল হুসাইন আল-আবাদি থেকে (রাহিমাহুল্লাহ) সা আলাইহিস সালাম-এর অবতরণ-সম্পর্কিত হাদিসগুলোর

তাফসিরে ইবনে কাসির, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৭৮।
তাফসিরে ইবনে কাসির, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৮৩।

মুতাওয়াতির হওয়ার বিষয়টিকে ফাতহুল বারিতে এই শব্দগুলো দ্বারা প্রকাশ করছেন—

وقال أبو الحسن الخسعي الأبدي في مناقب الشافعي تواترت الأخبار بأن المهدي من هذه الأمة وأن عيسى يصلي خلفه

"আর আবুল হাসান আল-খুসায়ি আল-আবাদি 'মানাকিবুশ শাফিয়ি' গ্রন্থে বলেছেন, এ-ব্যাপারে হাদিসসমূহ তাওয়াতুর পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, ইমাম মাহদি এই (মুহাম্মদি) উম্মতের মধ্য থেকে হবেন এবং ইসা আলাইহিস সালাম তাঁর পেছনে (ইকতেদা) করে নামায পড়বেন।"

তালখিসুল জির-এর 'তালাক' অধ্যায়ে বলা হয়েছে—

و أما رفه عيسى فاتفق أصحاب الأخبار والفسير على أنه ببدنه حيا

"আর ইসা আলাইহিস সালামকে আসমানে উত্তোলিত করা প্রসঙ্গে সকল মুহাদ্দিস ও মুফাস্‌সির এ-ব্যাপারে একমত যে, তিনি এখনো সশরীরে জীবিত আছেন (এবং কিয়ামতের অনতিপূর্বে পৃথিবীর বুকে অবতরণ করবেন)।"

যুগের মুহাদ্দিস ও কালের তত্ত্বজ্ঞানী আল্লামা সাইয়িদ মুহাম্মদ আনওয়ার শাহ 'আকিদাতুল ইসলাস' গ্রন্থে উল্লিখিত হাদিসগুলোর মুতাওয়াতির হওয়ার ব্যাপারে লিখেছেন—

و للمحدث العلامة الشوكانى رسالة سماها التوضيح فى تواتر ما جاء فى المنتظر و الدجال و المسيح، ذكر فيها تسعة و عشرين حديثا فى نزوله عليه السلام ما بين صحيح و حسن و صالح، هذا و أزيد منه مرفوع و أما الأثار فتفوت الإحصاء.

"মুহাদ্দিস আল্লামা শাওকানির একটি পুস্তিকা আছে, তিনি পুস্তিকাটির নাম রেখেছেন 'আত-তাওদিহু ফি তাওয়াতুরি মা জাআ ফিল মুনতাযার ওয়াদ দাজ্জাল ওয়াল মাসিহ'। এই পুস্তিকায় তিনি হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর পৃথিবীতে অবতরণ করার ব্যাপারে ২৯ (উনত্রিশ)টি হাদিস বর্ণনা করেছেন। (হাদিসের মূলনীতি অনুসারে এই হাদিসগুলো) সহিহ, হাসান ও সালেহ এই তিনটি স্তরের অন্তর্ভুক্ত। আর

মারফু হাদিসের সংখ্যা এই সংখ্যা থেকে আরো অনেক বেশি। আর এ-ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের বাণী তো অগুনতি।"[১৩৬]

এ-কারণেই হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর ঊর্ধ্বলোকে উত্তোলিত হওয়া, জীবিত থাকা, আসমান থেকে পৃথিবীর মাটিতে অবতরণ করার ব্যাপারে উম্মতে মুহাম্মদির (আলাইহাস সালাতু ওয়াস সালাম) ইজমা (ঐকমত্য) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আকায়িদশাস্ত্রের বিখ্যাত ও নির্ভরযোগ্য কিতাব 'আল-আকিদাতুস সিফারিনিয়্যাহ'তে উম্মতে মুহাম্মদির এ-ব্যাপারে একমত হওয়ার কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে—

و منها أي من علامات الساعة العظمى العلامة الثالثة أن ينزل من السماء السيد (المسيح) عيسى ابن مريم عليه السلام ونزوله ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة...... وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على نزوله ولم يخالف فيه أحد من أهل الشريعة ، وإنما أنكر ذلك الفلاسفة والملاحدة ممن لا يعتد بخلافه. [القسم : التوحيد والعقيدة]

"আর কিয়ামতের বড় আলামতসমূহের মধ্যে তৃতীয় আলামত এই যে, সাইয়িদ (মাসিহ) ইসা ইবনে মারইয়াম (আলাইহিমাস সালাম) আসমান থেকে অবতরণ করবেন। তাঁর আসমান থেকে অবতরণ করার বিষয়টি কুরআন, সুন্নাহ ও উম্মতে ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। ...... (কুরআন ও হাদিস দ্বারা তাঁর অবতরণ প্রমাণ করার পর বলছেন,) আর ইজমা—হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর অবতরণ করার ব্যাপারে উম্মতে মুহাম্মদি ঐকমত্যে (ইজমায়) পৌঁছেছেন। ইসলামি শরিয়তের অনুসারীদের মধ্যে কেউই এ-ব্যাপারে মতভেদ করেন নি। তবে দার্শনিক ও খোদাদ্রোহীরা ইসা আলাইহিস সালাম-এর অবতরণ করার ব্যাপারটি অস্বীকার করেছে, ইসলামে তাদের অস্বীকারের কোনো মূল্য নেই।" ['তাওহিদ ও আকিদা' অংশ][১৩৭]

---

[১৩৬] হযরত শাহ সাহেবের এই কিতাবটি বিষয়বস্তুর প্রেক্ষিতে একটি অতুলনীয় রচনা। এটি আরবি ভাষায় লিখিত এবং উলামা ও তালেবে ইলম উভয় শ্রেণির জন্য পাঠোপযোগী। কাসাসুল কুরআন-এর রচয়িতাও এ-ব্যাপারে অধিকাংশ আলোচনায় 'আকিদাতুল ইসলাম' থেকেই সহায়তা গ্রহণ করেছেন।—লেখক।

[১৩৭] কিতাব : العقيدة السفارينية (الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية).

contents

ইসা মাসিহ আলাইহিস সালাম-এর জীবিত থাকা এবং পৃথিবীতে অবতরণের হেকমত

ইতোপূর্বে উর্ধ্বলোকে হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর জীবিত থাকা এবং কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে পৃথিবীর মাটিতে অবতরণের বিষয়টি দলিল-প্রমাণসহ বর্ণনা করা হয়েছে। তা একজন ন্যায়বান ও সত্যান্বেষী মানুষকে ধ্রুববিশ্বাস দান করবে। এখন আরো চিত্ত-পরিতৃপ্তির জন্য এ-ব্যাপারে সত্যপন্থী উলামায়ে কেরাম যে-হেকমতসমূহ বর্ণনা করেছেন সেগুলোও উল্লেখ করা সঙ্গত মনে করছি। কিন্তু সেগুলো পাঠ করার পূর্বে এই সত্যটি সবসময় লক্ষণীয় যে, আল্লাহ তাআলার হেকমতসমূহ এবং তাঁর অভিপ্রায়ের কল্যাণসমূহ আয়ত্ত করা মানব-বুদ্ধির পক্ষে অসম্ভব। সৃষ্টমানব বিশ্বস্রষ্টার রহস্য ও হেকমতসমূহ আয়ত্ত করবেই বা কী করে? তারপরও উম্মতের আলেমগণ মুমিনসুলভ বিচক্ষণতা ও সত্যজ্ঞানের পন্থায় দীন ও দীনের হুকুম-আহকামের রহস্যাবলি ও কল্যাণকামিতা সম্পর্কে লিখেছেন এবং নিজেদের সীমিত ক্ষমতা অনুসারে এ-ব্যাপারে জ্ঞানগত তত্ত্বসমূহ প্রকাশ করে আসছেন।

ইসলামি যুগের জ্ঞানের ইতিহাস থেকে এটা জানা যায় যে, প্রথম যুগে ইলমুল আসরার বা ধর্মীয় রহস্যাবলি-সম্পর্কিত জ্ঞানের ইমাম বা বিশিষ্ট অধিকারী ছিলেন হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা, হযরত আলি বিন আবি তালিব রা. এবং উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়েশা রা.। তারপর প্রত্যেক শতাব্দীতেই দু-চারজন আলেমে রব্বানি সে-বিষয়ে দক্ষ ও বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তবে বিশেষভাবে উমাইয়া বংশীয় খলিফা হযরত উমর বিন আবদুল আযিয রহ., ইমাম আবু হানিফা রহ., আল্লামা ইয্‌যুদ্দিন বিন

লেখক : محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان السفاريني।

সাহাবায়ে কেরাম, তাবিয়িন, তাবে-তাবিয়িন-এর তিনটি যুগকে খাইরুল কুরুনি বা সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ বলা হয়। নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই তিন যুগ সম্পর্কে বলেছেন—

خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ.

"সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ আমার যুগ, তারপর তাদের পরবর্তীদের যুগ, এরপর তাদের নিকটবর্তীদের যুগ।" তিনি বলেছেন, "তারপর মিথ্যার আধিক্য দেখা দেবে।" অর্থাৎ, এই তিন যুগের পরে মুসলমানদের মধ্যে ধর্মীয় অবনতি শুরু হবে এবং ইসলামি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহ লোপ পাবে।

দাবি করবে, তারপর 'পথপ্রদর্শক মাসিহ' সাজবে। এ-কারণে তার আবির্ভাব কিয়ামতের পূর্বক্ষণেই হওয়া বাঞ্ছনীয়, যা হবে ফেতনাজর্জরিত যুগ। এজন্য আল্লাহর হেকমত চাইলো যে, 'পথপ্রদর্শক মাসিহ' হযরত ইসা আলাইহিস সালামকে ইহুদিদের ফেতনা থেকে এমনভাবে রক্ষা করা হবে, তারা তাঁকে স্পর্শও করতে পারবে না। যখন ওই সময়টা চলে আসবে যে, পথভ্রষ্টকারী মাসিহ দাজ্জাল তার পথভ্রষ্টতার ঝাণ্ডা উত্তোলন করবে, তখন পথপ্রদর্শক মাসিহ ইসা আলাইহিস সালাম ঊর্ধ্বলোক থেকে পৃথিবীতে অবতরণ করবেন এবং বনি ইসরাইল বংশোদ্ভূত ইহুদিরা—যাদের অধিকাংশই 'পথভ্রষ্টকারী মাসিহ' দাজ্জালের অনুসারী হয়ে থাকবে—নিজ চোখে সত্য ও মিথ্যা দেখে নিতে পারবে। যখন পথপ্রদর্শক মাসিহ ইসা আলাইহিস সালাম-এর পবিত্র হাতে 'পথভ্রষ্টকারী মাসিহ' দাজ্জালের বিলুপ্তি ঘটবে তখন আল্লাহর বাণী جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا 'সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে, মিথ্যা তো বিলুপ্ত হবারই'[১৩৮] ধ্রুববিশ্বাসরূপে চোখের সামনে চলে আসবে। এইভাবে সত্যকে গ্রহণ করা ছাড়া তাদের সামনে আর কোনো উপায় থাকবে না অথব্য সত্য গ্রহণ করা ছাড়াই তাদের 'পথভ্রষ্টকারী মাসিহ' দাজ্জালের সঙ্গে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করা হবে।

এই সত্যটিও চোখের সামনে রয়েছে যে, ধর্ম ও মতাদর্শের ইতিহাসে শুধু ইহুদিরাই এমন একটি জাতি, যারা তাদের নবীদেরকেও হত্যা করা থেকে বিরত থাকে নি; কিন্তু হযরত মুসা আলাইহিস সালাম-এর পরে ইহুদিরা যেসকল নবীকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে তাদের হাত রক্তে-রঞ্জিত করেছে, তাঁরা কেবই নবীই ছিলেন এবং তাঁরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণী كأنبياء بني إسرائيل علماء أمتي 'আমার উম্মতের আলেম সম্প্রদায় বনি ইসরাইলের নবীদের মতো'[১৩৯]-এর লক্ষ্যস্থল।

কিন্তু কোনো শরিয়ত-প্রবর্তক রাসুল ইহুদিদের অন্যায় হত্যার শিকার হন নি। এ-কারণে এটাই ছিলো প্রথম ঘটনা যে, তারা একজন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ

---

[১৩৮] সুরা বনি ইসরাইল : আয়াত ৮১।

[১৩৯] দেখুন : فيض القدير شرح الجامع الصغير، عبد الرؤوف المناوي, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৩১।

রাসুল হযরত ইসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস সালামকে হত্যা করে ফেলার সঙ্কল্পই শুধু করে নি; বরং বৈষয়িক উপকরণের দিক থেকেও তারা পূর্ণপ্রস্তুতি গ্রহণ করেছিলো। তখন আল্লাহ তাআলার অভিপ্রায় এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো যে, 'পথপ্রদর্শক মাসিহ' ইসা আলাইহিস সালামকে এমনভাবে রক্ষা করা হবে যেনো তারা নিজেরাও বুঝতে পারে যে, তারা মাসিহ ইবনে মারইয়াম আলাইহিস সালামকে স্পর্শও করতে পারে নি। সুতরাং, আল্লাহর অভিপ্রায়ের সিদ্ধান্তই কার্যকর হয়েছে এবং হযরত ইসা মাসিহ আলাইহিস সালামকে ঊর্ধ্বলোকে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে এবং যাবতীয় পার্থিব উপকরণ ও প্রস্তুতি ব্যর্থ ও নিষ্ফল হয়েছে। তাদের এই অক্ষমতার অনুভূতি হওয়া সত্ত্বেও মূলত ব্যাপারটি কী ঘটেছিলো অনুভব করতে পারলো না এবং ধারণা ও অনুমানের অতল গহ্বরেই পতিত থাকলো, যেনো তাদের কথা রাখার জন্য এটাই প্রচার করতে থাকলো যে, 'আমরা ইসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস সালামকে হত্যা করে ফেলেছি।'

এদিকে হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর উম্মত নাসারাদের দুর্ভাগ্য দেখুন : কিছুকাল পর সেন্টপল তাদের মধ্যে 'ত্রিত্ববাদ' ও 'কাফ্ফারা'র নতুন আকিদা ও বিশ্বাস সৃষ্টি করে দিলো এবং ইহুদিদের মনগড়া ইসা আলাইহিস সালামকে শূলিবিদ্ধ করে হত্যার রূপকথাকেও তাদের আকিদা ও বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত করে নিলো। ইহুদি ও নাসারা উভয় জাতিই এই ভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতার মধ্যে পতিত হলো যে, হযরত ইসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস সালামকে শূলিতে চড়িয়ে হত্যা করা হয়েছে। তখন পবিত্র কুরআন নাযিল হয়ে সত্য ও মিথ্যার মধ্যে মীমাংসা শুনিয়ে দিলো এবং হযরত ইসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে জাতি দুটির লোকেরা যে-দুটি পৃথক পন্থা অবলম্বন করেছিলো এবং যে-একটি বিষয়ে উভয় জাতির মধ্যে মতৈক্যও ঘটেছিলো এসব বিষয় সম্পর্কে ধ্রুবজ্ঞান দ্বারা প্রকৃত অবস্থাকে উন্মোচিত করে জাতি দুটির পথভ্রষ্টতাকে বিবৃত করে সত্যকে গ্রহণ করার আহ্বান জানালো। কিন্তু ইহুদি ও নাসারা উভয় জাতিই সমষ্টিগতভাবে তা প্রত্যাখ্যান করলো এবং হযরত ইসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে তাদের ভ্রান্তিমূলক আকিদার ওপরই অটল থাকলো। কিন্তু যাবতীয় অদৃশ্য ও দৃশ্যমান বস্তুরাশির জ্ঞানী আল্লাহ তাআলা এসব সত্য ও বাস্তবতা সম্পর্কে তাদের সংঘটন ও অস্তিত্বপ্রাপ্তির পূর্বেই সম্যক

অবগত ছিলেন। তাই তার প্রজ্ঞা ও কল্যাণকামিতা এটাও চাইলো যে, যখন 'পথভ্রষ্টকারী মাসিহ' দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে তখন 'পথপ্রদর্শক মাসিহ' ইসা আলাইহিস সালামকে পৃথিবীর বুকে প্রেরণ করা হবে, যাতে ইহুদি ও নাসারাদের সামনে প্রকৃত সত্যটি চাক্ষুষ দর্শনের পর্যায়ে প্রকাশ পায়। যাতে ইহুদিরা প্রত্যক্ষ করে যে, তারা যাঁকে হত্যা করে ফেলেছিলো বলে দাবি করতো, আল্লাহর অসীম ক্ষমতার লীলায় তিনি আজো জীবিত অবস্থায়ই বিদ্যমান। এবং যাতে নাসারা জাতিও এই ভেবে লজ্জিত হয় যে, তারা হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর সত্যিকারের অনুসরণ ও অনুকরণ পরিত্যাগ করে যে-ভ্রান্তিমূলক আকিদা ও বিশ্বাস পোষণ করেছিলো তা ছিলো সম্পূর্ণ ভুল ও ভ্রষ্টতা। এইভাবে সত্যপথপ্রাপ্তি ও পথভ্রষ্টতার যুদ্ধে উভয় জাতিই সত্যে জয় ও মিথ্যার পরাজয় নিজেদের চোখে দেখে নিয়ে কুরআনের সত্যতা স্বীকারে বাধ্য হয়। এবং যাতে উভয় জাতিই আনন্দ ও উৎসাহের সঙ্গে সত্যিকার অর্থে ঈমান গ্রহণ করে এবং তাদের বাতিল আকিদা ও বিশ্বাসের জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়। আর এই দুটি জাতি ছাড়া অন্যান্য সব বাতিলপন্থীদের ক্ষেত্রেও সত্যপথ ও পথভ্রষ্টতার প্রকাশ ও চাক্ষুষ দর্শন ঘটবে। ফলে তারাও ইসলামের বলয়ে চলে আসবে। এইভাবে সহিহ হাদিসসমূহের বর্ণনা অনুসারে কিয়ামতপূর্বকালে পৃথিবীতে কেবল একটি ধর্ম বিদ্যমান থাকবে এবং তা হবে ইসলাম। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا

"তিনিই তাঁর রাসুলকে পথনির্দেশ ও সত্য দীনসহ প্রেরণ করেছেন, অপর সকল ধর্মের ওপর একে জয়যুক্ত করার জন্য। আর সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।" [সুরা ফাতহ : আয়াত ৪৮]

দুই. ধর্ম ও মতাদর্শের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, আম্বিয়ায়ে কেরাম (আলাইহিমুস সালাম) ও সত্যের শত্রুদের মধ্যে আল্লাহর নীতির দুটি স্বতন্ত্র যুগবিভাজন ছিলো। প্রথম যুগটি হযরত নুহ আলাইহিস সালাম থেকে শুরু করে হযরত লুত আলাইহিস সালাম পর্যন্ত এসে সমাপ্ত হয়। এই যুগে আল্লাহর নীতি ছিলো এই যে, যখন জাতি ও সম্প্রদায় তাদের নবীদের সত্যের আহ্বানে কর্ণপাত করে নি, সবসময় তাঁদেরকে ঠাট্টা-

বিদ্রূপ করেছে এবং তাঁদের সত্যের পয়গামের বিরোধিতা করেছে, তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে আযাব এসে তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছে এবং তাদের ধ্বংসকে অন্য লোকদের উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণের উপকরণ বানিয়ে দিয়েছে। আর দ্বিতীয় যুগটি হযরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম থেকে শুরু করে খাতিমুল আম্বিয়া মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত এসে শেষ হয়। এই যুগে আল্লাহর নীতির বৈশিষ্ট্য ছিলো এই যে, যখন সত্যের শত্রুরা ও সুদৃঢ় দীনের দুশমনেরা সত্যবাণীর বিরুদ্ধে গোঁ ধরে থেকেছে, তাদের নবীদের বিভিন্নভাবে কষ্ট ও যন্ত্রণা দিয়েছে, তাঁদের সঙ্গে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করাকে নিজেদের দৈনন্দিন কর্ম মনে করেছে, তখন আল্লাহ ওইসব জাতি ও সম্প্রদায়কে ধ্বংস করার পরিবর্তে তাদের নবীদেরকে মাতৃভূমি ত্যাগ করে আল্লাহর পথে হিজরত করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। হযরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম ছিলেন প্রথম নবী, যিনি তাঁর জাতির সামনে ঘোষণা করেছিলেন—

إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (سورة العنكبوت)

'আমি আমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে দেশ ত্যাগ করছি। তিনি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।' [সুরা আনকাবুত : আয়াত ২৬]

তারপর হযরত মুসা আলাইহিস সালাম-এর ক্ষেত্রেও এই একই ঘটনা ঘটলো। তিনি বনি ইসরাইলকে সঙ্গে নিয়ে মিসর থেকে শামের (সিরিয়া) দিকে হিজরত করলেন। কিন্তু ফেরআউন ও তার সেনাবাহিনী তাঁকে বাধা দিলো এবং তাঁর হিজরতের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ালো। ফলে তাদেরকে লোহিত সাগরের গর্ভে নিমজ্জিত করে দেয়া হলো।

ঠিক একই অবস্থা ঘটেছিলো খাতিমুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ক্ষেত্রেও। মক্কার কুরাইশরা তাঁকে কষ্ট ও যন্ত্রণা দেয়া, ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা, সত্যধর্মের বিরোধিতা করা এবং সত্যধর্মের কর্মকাণ্ডে বাধা প্রদানে কোনোও ত্রুটি করে নি। তখন আল্লাহ তাআলার অভিপ্রায়ের সিদ্ধান্ত হলো যে, রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনায় চলে যাবেন। ফলে সবধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ ও বাড়িঘরকে চারদিক থেকে ঘেরাও করে রাখা সত্ত্বেও আল্লাহর তাআলার অসীম কুদরতের লীলায় রাসুল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুরক্ষিত ও নিরাপদ অবস্থায় মদিনায় হিজরত করেন।

আল্লাহর নীতির এই যুগেই হযরত ইসা আলাইহিস সালাম প্রেরিত হন। তাঁর জাতি বনি ইসরাইল তাঁর সঙ্গে ও তাঁর সত্যের আহ্বানের বিরুদ্ধে সেসব আচরণই করলো যা সত্যের শত্রুরা ও দীনের দুশমনেরা চিরকাল ধরে তাদের নবী ও রাসুলের সঙ্গে করে আসছে। বনি ইসরাইলের আরেকটি বিশেষ চরিত্র ছিলো এটা যে, তারা হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর পূর্বে অনেক নবীকে হত্যা পর্যন্ত করে ফেলেছিলো এবং হযরত ইসা আলাইহিস সালামকেও হত্যা করার জন্য পেছনে লেগেছিলো। তা সত্ত্বেও এই বিষয়টি মনে রাখতে হবে যে, বনি ইসরাইলের ইহুদিরা 'পথপ্রদর্শক মাসিহ' ও 'পথভ্রষ্টকারী মাসিহ'—এই দুইজন মাসিহের অপেক্ষায় ছিলো এবং হযরত ইসা আলাইহিস সালামকে 'পথভ্রষ্টকারী মাসিহ' সাব্যস্ত করে আজো তারা 'পথপ্রদর্শক মাসিহ'-এর অপেক্ষায় রয়েছে। এ-কারণে আল্লাহর পূর্ণপ্রজ্ঞার এই সিদ্ধান্ত হলো যে, হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর হিজরত হবে ঊর্ধ্বলোকে, যাতে নির্ধারিত ইহুদিরা 'পথপ্রদর্শক মাসিহ' ও 'পথভ্রষ্টকারী মাসিহ'-এর মধ্যে চাক্ষুষ দর্শনের মাধ্যমে পার্থক্য করতে পারে। একদিকে তারা পথপ্রদর্শক মাসিহকে 'পথপ্রদর্শক মাসিহ' বলে বুঝতে পারে এবং অপরদিকে পবিত্র কুরআনের সত্যিকার মীমাংসার সত্যতাকে নিজেদের চোখে দেখে সত্যধর্ম ইসলামের সামনে মস্তক অবনত করে। সঙ্গে সঙ্গে নাসারা জাতিও তাদের মূর্খতা আর ইহুদিদের অন্ধ অনুসরণের জন্য লজ্জিত হয় এবং তারাও কুরআনের শিক্ষার সত্যতার পক্ষে দৃঢ়বিশ্বাসের সঙ্গে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য প্রস্তুত হয়।

এটা একটা বিস্ময়কর ব্যাপার যে, হযরত মাসিহ আলাইহিস সালাম ও খাতিমুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সত্যের দাওয়াত ও তাবলিগ, বিরোধীদের পক্ষ থেকে সত্যের বিরোধিতা ও শত্রুতা, তারপর এগুলোর পরিণতি ও পরিণামের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য রয়েছে। তাঁদের দুইজনেরই নিজ নিজ সম্প্রদায় তাঁদেরকে মিথ্যাবাদী আখ্যায়িত করেছে, তাঁদেরকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করার পর বাসগৃহে অবরুদ্ধ করে রেখেছে। আল্লাহ তাআলার অসীম ক্ষমতার অলৌকিক কারিশমা তাঁদের দুজনকেই শত্রুদের হাত থেকে সার্বিকভাবে সুরক্ষিত ও

নিরাপদ রেখেছে। দুজনের ক্ষেত্রেই হিজরতের ঘটনা ঘটেছে। তবে নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নবুওত ছিলো বিশ্বব্যাপী এবং পৃথিবীর বুকে সত্যের দাওয়াত ও তাবলিগের জন্য রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ভূমণ্ডলে অনবরত অবস্থান করার প্রয়োজন ছিলো। তাই তাঁর প্রতি মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করার নির্দেশ এলো। আর হযরত ইসা ইবনে মারইয়াম (আলাইহিমাস সালাম) তাঁর সম্প্রদায়ের কাছে সত্যের দাওয়াত পৌঁছে দিয়েছিলেন। তবে একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের প্রেক্ষিতে দীর্ঘকাল পরে পৃথিবীর মাটিতে তাঁর উপস্থিত হওয়া আবশ্যক ছিলো। কাজেই তিনি মাটিতে হিজরত করার পরিবর্তে ঊর্ধ্বলোকে হিজরত করেন। আবার যেভাবে নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে পথভ্রষ্টতার নেতা উমাইয়া বিন খাল্‌ফকে নিজ কৌশলে হত্যা করেছিলেন, তেমনি হযরত ইসা ইবনে মারইয়াম (আলাইহিমাস সালাম)-ও জাতির পথভ্রষ্টকারী মাসিহ দাজ্জালকে হত্যা করবেন। এবং যেভাবে আল্লাহ তাআলা নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হিজরতের পরে তাঁর জন্মভূমির ওপর ক্ষমতা ও প্রতাপ দান করেছিলেন, তেমনি হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর অবতরণও সিরিয়ার ওই বিখ্যাত শহরেই হবে যেখান থেকে তাঁকে তাঁর সম্প্রদায়ের শত্রুতামূলক ষড়যন্ত্রের ফলে ঊর্ধ্বলোকে হিজরত করতে হয়েছিলো। তা ছাড়া, ইহুদিদের অসন্তুষ্টি সত্ত্বেও বাইতুল মুকাদ্দাস, দামেস্ক ও সিরিয়ার পূর্বাঞ্চলে হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর শাসনক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হবে।[১৪০]

তিন. হযরত মাসিহ আলাইহিস সালাম-এর পূর্বে নবীদের (আলাইহিমুস সালাম) হত্যা ইহুদি জাতিকে এই পরিমাণ বেআদব ও বেপরোয়া করে দিয়েছিলো যে, তারা মনে করে বসলো যে, নবুওতের দাবিদার কোনো ব্যক্তি সত্যনবী না-কি ভণ্ড নবী তার মীমাংসা আমাদেরই হাতে। যাকে আমরা ও আমাদের ধর্মগুরুরা ভণ্ড ও মিথ্যা নবী বলে সাব্যস্ত করবো, তাকে হত্যা করা আমাদের জন্য আবশ্যক। এই অলীক ধারণা ও মিথ্যা দাবির বশবর্তী হয়ে তারা হযরত ইসা ইবনে মারইয়াম (আলাইহিমাস সালাম)-কে 'পথভ্রষ্টকারী মাসিহ' মাসিহ সাব্যস্ত করলো এবং তাদের

---

[১৪০] আল্লাহ আনওয়ার শাহ কর্তৃক রচিত 'আকিদাতুল ইসলাম' থেকে গৃহীত।

ধর্মগুরুরা তাঁর বিরুদ্ধে মৃত্যু-পরোয়ানা জারি করলো। অথচ তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ উচ্চ মর্যাদাশীল নবী ছিলেন; হযরত মুসা আলাইহিস সালাম-এর পরে বনি ইসরাইল বংশে তাঁর সমশ্রেণির কোনো নবীই প্রেরিত হন নি এবং তিনি সত্যের পয়গাম (ইঞ্জিল) দ্বারা আধ্যাত্মিকতার মৃত জমিনে পুনরায় প্রাণ সঞ্চার করে দিয়েছিলেন। তখন আল্লাহর অভিপ্রায়ের এই সিদ্ধান্ত হলো যে, বনি ইসরাইলের বাতিল ধারণা ও মিথ্যা দাবিকে চিরকালের জন্য চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়া হবে এবং তাদের দেখিয়ে দেয়া হবে যে, বিশ্বনিখিলের স্রষ্টা রাব্বুল আলামিন যাঁকে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দেন, জগতের কোনো ব্যক্তি বা বিশ্বের সমস্ত শক্তিও তার ওপর ক্ষমতা লাভ করতে পারে না। ফলে আল্লাহ তাআলার কুদরতের হাত ওই ভয়ঙ্কর মুহূর্তে ওই পবিত্র সত্তাকে তাঁর দৈহিক অবয়বসহ উর্ধ্বলোকের দিকে তুলে নিলেন, যখন শত্রুর দল তাঁর থাকার জায়গাকে ঘেরাও করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রাণ-রক্ষার যাবতীয় পার্থিব উপায়-উপকরণ বন্ধ করে দিয়েছিলো।

এই ঘটনা আবার একটি নতুন অবস্থার সৃষ্টি করে দিলো। তা এই যে, ধর্মের ইতিহাসে হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর ব্যক্তিত্বই এমন যাঁর নিহত হওয়া ও না-হওয়া সম্পর্কে সত্যপন্থী ও মিথ্যাপন্থীদের মধ্যে ভীষণ মতভেদ ও বিতণ্ডার সৃষ্টি হয়েছে। ইহুদি ও নাসারা তাঁর শূলিবিদ্ধ হওয়া ও নিহত হওয়ার ব্যাপারে একমত হওয়া সত্ত্বেও দুটি বাতিল ও পরস্পরবিরোধী আকিদা নিয়ে কলহে লিপ্ত রয়েছে।

ইহুদিরা তাঁকে শূলে চড়ানো ও হত্যা করার কারণ বলছে যে, তাদের মতে ইসা আলাইহিস সালাম 'পথভ্রষ্টকারী মাসিহ' (দাজ্জাল) ছিলেন। আর নাসারারা তাঁকে শূলিবিদ্ধ করার এই কারণ বর্ণনা করছে যে, তিনি আল্লাহর পুত্র ছিলেন এবং মানবজগতের যাবতীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত (কাফ্ফারা) হয়ে এই পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছিলেন। যাতে পাপবিদ্ধ মানবজগৎ পাপ থেকে পবিত্র হয়। আর কয়েক শতাব্দী পরে যখন কুরআন মাজিদ হযরত ইসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে প্রকৃত ঘটনা ও সত্য বিষয়টি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে দিলো, তখনো ইহুদি ও নাসারা জাতি জাতিগতভাবে কুরআনের বক্তব্য মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানালো। ফলে আল্লাহর কুদরতের সিদ্ধান্ত হলো যে, স্বয়ং মাসিহ ইবনে মারইয়ামই (আলাইহিমাস সালাম) প্রতিশ্রুতি সময়ে আসমান থেকে

অবতরণ করে কুরআনের সত্যতা প্রতিপাদন করবেন। আর এইভাবে ইহুদি ও নাসারাদের বাতিল ও মিথ্যা আকিদা-বিশ্বাসগুলোন বিলুপ্তি ঘটবে। তারপর আহলে কিতাব হওয়ার দাবিদারদের জন্য শিরক ও বাতিলের অনুসরণ করার কোনো অবকাশ থাকবে না এবং তাদের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার প্রমাণ পূর্ণ হয়ে যাবে।

তা ছাড়া, আল্লাহ তাআলা বিশ্বজগতের জন্য এই ফয়সালা করে দিয়েছেন যে, আল্লাহ তাআলার সত্তা ছাড়া প্রতিটি অস্তিত্ববান প্রাণি ও বস্তুর মৃত্যু আছে। আল্লাহ বলেছেন—

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ

"প্রতিটি প্রাণি মৃত্যুর স্বাদা আস্বাদন করবে।"

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ

"সবকিছুই ধ্বংস হবে, আল্লাহর পবিত্র সত্তা ব্যতীত।"

আর জানা কথা যে, উর্ধ্বজগৎ ও 'আলমে কুদ্স' মৃত্যুর জায়গা নয়, জীবিত থাকার জায়গা। সুতরাং, হযরত ইসা ইবনে মারইয়াম (আলাইহিমাস সালাম) উর্ধ্বজগতে জীবিত আছেন এবং তিনিও মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করবেন। এইজন্য তিনি পৃথিবীর বুকে নেমে আসবেন। যাতে জমিনের আমানত জমিনের বুকেই সোপর্দ হয়ে যায়। অতএব, তাঁর জীবিত অবস্থায় উর্ধ্বলোকে উত্তোলিত হওয়ার পর পৃথিবীর বুকে নেমে আসা নির্ধারিত হয়েছে।[১৪১]

সত্যপন্থী উলামায়ে কেরাম হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর উর্ধ্বলোকে জীবিত থাকা এবং কিয়ামতপূর্ব সময়ে পৃথিবীর বুকে নেমে আসা প্রসঙ্গে যেসব রহস্য ও হেকমত বর্ণনা করেছেন, এখানে তার সবগুলোর বিশদ বিবরণ উপস্থিত করা উদ্দেশ্য নয়। সংক্ষেপে কয়েকটি হেকমত বর্ণনা করা হলো। অন্যথায় যুগের মুহাদ্দিস আল্লামা সাইয়িদ মুহাম্মদ আনওয়ার শাহ (নাওওয়ারাল্লাহু মারকাদাহু) এ-সম্পর্কে তাঁর 'আকিদাতুল ইসলাম' গ্রন্থে যে-একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছেন তা পাঠযোগ্য। হযরত শাহ সাহেব অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক কিন্তু সূক্ষ্ম বর্ণনার সঙ্গে বিশ্বজগৎকে 'ইনসানে কাবির' বা 'বৃহৎ মানব' এবং মানুষকে 'আলমে

---

[১৪১] ফাতহুল বারি, প্রথম খণ্ড।

contents

সগির' বা 'ক্ষুদ্র জগৎ' সাব্যস্ত করে এই দুটি জগতের জীবন ও মৃত্যু সম্পর্কে যে-আলোচনা করেছেন তার দ্বারা হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর আসমানে উত্তোলিত হওয়া এবং কিয়ামতের পূর্বকালে পৃথিবীর জগতে ফিরে আসার হেকমত ও রহস্য খুব সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু কাসাসুল কুরআন ওই সূক্ষ্মতত্ত্বালোচনার উপযোগী নয়। সুতরাং তা যথাস্থানে পাঠযোগ্য।

অবশেষে নিজের পক্ষ থেকে এ-প্রসঙ্গে কয়েকটি বাক্য যুক্ত করে এই আলোচনার ইতি টানা সঙ্গত মনে হয়।

চার. কুরআন মাজিদে 'মিসাকুল আম্বিয়া' বা নবীদের থেকে গৃহীত প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে আল্লাহর এই বাণী রয়েছে—

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ (سورة آل عمران)

"আর স্মরণ করো (সেই সময়ের কথা,) যখন আল্লাহ নবীদের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন যে, 'তোমাদেরকে কিতাব ও হেকমত যা কিছু দান করেছি এরপর তোমাদের কাছে যা আছে তার সমর্থকরূপে যখন একজন রাসুল আসবে, তখন তোমরা অবশ্যই তার প্রতি ঈমান আনবে এবং তাকে সাহায্য করবে।' তিনি বললেন, 'তোমরা কি স্বীকার করলে? এবং এই সম্পর্কে আমার অঙ্গীকার কি তোমরা গ্রহণ করলে?' তারা বললো, 'আমরা স্বীকার করলাম।' তিনি বললেন, 'তবে তোমরা সাক্ষী থাকো, আমিও তোমাদের সঙ্গে সাক্ষী থাকলাম।'" [সুরা আলে ইমরান : আয়াত ৮১]

হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর তাফসির[১৪২] অনুযায়ী উল্লিখিত আয়াতে ওই প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকারের উল্লেখ রয়েছে

---

[১৪২] তাফসিরে ইবনে কাসিরে উদ্ধৃত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর তাফসির নিম্নরূপ—

قال علي بن أبي طالب وابن عمه عبد الله بن عباس، رضي الله عنهما: ما بعث الله نبيا من الأنبياء إلا أخذ عليه الميثاق، لئن بعث محمدا وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه، وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته: لئن بعث محمد [صلى الله عليه وسلم] وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه.

যা আল্লাহ তাআলা সৃষ্টির প্রথম লগ্নে খাতিমুল আম্বিয়া মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে নবী ও রাসুলগণ (আলাইহিমুস সালাম) থেকে গ্রহণ করেছিলেন। পবিত্র কুরআনের বর্ণশৈলী অনুসারে এই সম্বোধন ছিলো নবী ও রাসুলগণের মাধ্যমে তাদের উম্মতদের প্রতি, এই মর্মে যে, তাদের মধ্যে যে-উম্মত খাতিমুল আম্বিয়া মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যামানা পাবে, তারা তাঁর প্রতি ঈমান আনবে এবং সত্যের দাওয়াত ও তাবলিগের ক্ষেত্রে তাঁকে সাহায্য ও সহযোগিতা করবে। ফলে প্রত্যেক নবী নিজ নিজ যুগে সত্যের শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ কর্তৃক গৃহীত এই অঙ্গীকারও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। নবীর অনুসারীরাও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলোন এবং স্বীকার করেছিলো যে, অবশ্যই তারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি ঈমান আনবে এবং সত্যে বাণী প্রচারে তাঁকে সাহায্য করবে।

নবীদের থেকে গৃহীত প্রতিশ্রুতি এইভাবে পূর্ণ হতে থাকলো। তারপরও সৃষ্টির আদিলগ্নে যেহেতু এই প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকারের সম্বোধিত ব্যক্তিরা ছিলেন নবী ও রাসুলগণ, এজন্য এই অঙ্গীকার বাস্তবায়নের চাহিদা ছিলো এই যে, স্বয়ং নবী ও রাসুলগণের মধ্য থেকেও কোনো একজন নবী বা রাসুল এই প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকারের কার্যকর প্রকাশ ঘটিয়ে দেখান, যাতে পূর্ববর্তীদের প্রতি সম্বোধন সরাসরি কার্যে পরিণত হয়। কিন্তু ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ বাক্যে আরবি ভাষার নিয়ম অনুসারে সম্বোধন ছিলো ওইসকল নবী ও রাসুলের প্রতি যাঁরা নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর

"আলি বিন আবি তালিব এবং তাঁর চাচাতো ভাই আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) উল্লিখিত আয়াতের তাফসিরে বলেছেন, আল্লাহ যে-কোনো নবীকেই (কোনো জাতি বা সম্প্রদায়ের পথপ্রদর্শনের জন্য) প্রেরণ করেছেন, তাঁর কাছ থেকে এই অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন যে, যদি আল্লাহ মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে তাঁর জীবিত থাকা অবস্থায় প্রেরণ করেন, তবে তিনি অবশ্যই মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি ঈমান আনবেন এবং অবশ্যই তাঁকে (সত্যধর্ম প্রচারে) সাহায্য করবেন। এবং তাঁকে এই নির্দেশও দিয়েছেন যে, তিনি যেনো তাঁর উম্মত থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেন এই মর্মে যে, যদি তাদের জীবিত থাকা অবস্থায় মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রেরিত হন, তবে অবশ্যই তারা মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি ঈমান আনবে এবং অবশ্যই তাঁকে (সত্যধর্ম প্রচারে) সাহায্য করবে।" [তাফসিরে ইবনে কাসির, প্রথম খণ্ড]

পূর্বে এই পৃথিবীর বুকে প্রেরিত হয়েছিলেন। কারণ সৃষ্টির আদিলগ্নেই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্য এই বাণী অবধারিত হয়েছিলো— وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ 'তবে তিনি আল্লাহর রাসুল এবং সর্বশেষ নবী।'[১৪৩] সুতরাং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপাধি হলো 'সর্বশেষ নবী'। আর সৃষ্টির সূচনালগ্নে গৃহীত মিসাকুন নাবিয়্যিন বা নবীদের অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতির সমাবেশ ঘটার একটিমাত্র পন্থায় ঘটা সম্ভব ছিলো। অর্থাৎ, পূর্ববর্তী নবীগণের মধ্যে কোনো-একজন নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আবির্ভাবের পরে অবতরণ করবেন এবং তিনি ও তাঁর উম্মত জগতের মানবমণ্ডলীর সামনে খাতিমুল আম্বিয়া (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি ঈমান আনবেন, সত্যধর্মের ক্ষেত্রে সাহায্য ও সহযোগিতা করবেন, যাতে لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ 'তোমরা অবশ্যই তার প্রতি ঈমান আনবে এবং তাকে সাহায্য করবে'-এর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয়।

আগের পৃষ্ঠাগুলোতে এই সত্যটি যথার্থভাবে প্রকাশ করা হয়েছে যে, সকল নবী ও রাসুল (আলাইহিমুস সালাম) নিজ নিজ যুগে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুসংবাদ প্রদান করে আসছিলেন: কিন্তু এই বৈশিষ্ট্য এলো হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর ভাগ্যে। কেননা, তিনি ছিলেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নবুওত ও রিসালাতের ভূমিকা এবং সরাসরি ঘোষণাকারী ও সুসংবাদদাতা ছিলেন। তিনি বনি ইসরাইলকে সত্যের শিক্ষা দিয়ে বলেছেন—

يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ

"হে বনি ইসরাইল, আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর রাসুল এবং আমার পূর্ব থেকে তোমাদের কাছে যে-তাওরাত রয়েছে আমি তার সমর্থক এবং আমার পরে আহমদ[১৪৪] নামে যে-রাসুল আসবে আমি তার সুসংবাদদাতা।" [সুরা সাফ্ফ : আয়াত ৬]

---

[১৪৩] সুরা আহযাব : আয়াত ৪০।

[১৪৪] হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অপর নাম আহমদ।

সত্য ব্যাপার হলো এই, বনি ইসরাইলের সর্বশেষ নবীরই এই অধিকার ছিলো যে, তিনি সর্বশেষ নবী ও সর্বশেষ রাসুল-এর নবুওত ও রিসালাতের ঘোষণাকারী ও সুসংবাদবাহক হন। ফলে আল্লাহ তাআলার হেকমতের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নবী ও রাসুলগণ থেকে গৃহীত প্রতিজ্ঞাপালনের মর্যাদার জন্য তাঁকেই মনোনীত করা হয় এবং এ-ব্যাপারে তিনি সকল নবী ও রাসুলের পক্ষে নেতৃত্ব দেবেন, যাতে তাঁর মাধ্যমে উম্মতের পক্ষ থেকে কেবল নয়, বরং সকল নবী ও রাসুলের পক্ষ থেকেই অঙ্গীকার পালনের দায়িত্ব পালিত হতে পারে। এই বিষয়টির প্রতি লক্ষ করেই রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى الْأَنْبِيَاءُ أَبْنَاءُ عَلَّاتٍ وَلَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَ عِيسَى نَبِيٌّ.

“আমি ইসার অধিক নিকটবর্তী। নবীগণ বৈমাত্রেয় ভাইদের মতো। আর আমার ও ইসার মধ্যে কোনো নবী নেই।”

কুরআন মাজিদ আল্লাহর শেষ পয়গাম। আল্লাহ তাআলা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন— وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ‘নিশ্চয় আমি তাকে (কুরআনকে পরিবর্তন ও বিকৃতি থেকে) রক্ষা করবো।’ অর্থাৎ, দুনিয়া যতদিন থাকবে ততদিন আল্লাহপাক কুরআনকে হেফাজত করবেন। সুতরাং, স্বাভাবিকভাবে কুরআনের শিক্ষার ফল অন্য আম্বিয়ায়ে কেরামের শিক্ষসমূহের তুলনায় দীর্ঘকাল কার্যকর থাকবে। তার আলো দ্বারা মানুষের অন্তরসমূহ আলোকিত এবং উম্মতে মুহাম্মদির আলেমগণ বনি ইসরাইলের নবীগণের মতো মানুষকে আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্যের প্রতি উদ্বুদ্ধ করার জন্য সত্য দীনের দাওয়াত ও তাবলিগের দায়িত্ব পালন করে যাবেন। কিন্তু নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নবুওতকাল শেষ হওয়ার পর আরো অনেক দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়ে যাবে এবং রহমতপ্রাপ্ত উম্মতের আমলের ক্ষমতা ও তাদের সামগ্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহে চূড়ান্ত অবনতির সৃষ্টি হবে। তাদের অবস্থা এমন হবে যে, তাদেরকে সচেতন ও গতিশীল করে তোলার জন্য শুধু সত্যপন্থী উলামায়ে কেরামের আধ্যাত্মিক শক্তিই যথেষ্ট হবে না। তাদেরকে সামলানোর জন্য কোনো প্রমাণ-দ্বারা-প্রতিষ্ঠিত মহামানবের আগমনই হবে সেই সময়ের চাহিদা ও দাবি। এজন্য আল্লাহ তাআলার অভিপ্রায়

নির্ধারণ করেছে যে, যে-সত্তা (ইসা ইবনে মারইয়াম) নবী ও রাসুলগণ থেকে সৃষ্টির সূচনালগ্নে গৃহীত অঙ্গীকারের নেতৃত্ব গ্রহণে আদিষ্ট হয়েছেন, তিনি ওই সময়েই অবতরণ করবেন এবং উম্মতে মুহাম্মদির মধ্যে থেকে রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতিনিধিত্ব করবেন, উম্মতের নেতৃত্বের দায়িত্ব পালন করবেন এবং لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ 'তোমরা অবশ্যই তার প্রতি ঈমান আনবে এবং তাকে সাহায্য করবে'-এর প্রতিশ্রুতির কার্যকর প্রকাশ ঘটিয়ে দেখাবেন।

এখন আল্লাহর কুদরতের কারিশমা দেখুন। উর্ধ্বলোকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এসব নির্ধারিত বিষয় কীভাবে এই পৃথিবীর বুকে আপন বিছানা বিছিয়ে নিয়েছে! বনি ইসরাইল তাদের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ উচ্চ মর্যাদাশীল নবীকে হত্যা করার জন্য তাদের চক্রান্ত পূর্ণ করলো। রাজার সৈন্যরা চারদিক থেকে জায়গাটিকে ঘেরাও করে ফেললো। কিন্তু আল্লাহর অসীম ক্ষমতা এভাবে কাজ করে নি যে, অলৌকিক উপায়ে তাঁকে সুরক্ষিত রেখে ওখান থেকে বের করে আল্লাহর বিশাল পৃথিবীর অন্য অংশে হিজরত করিয়ে দিয়েছে; বরং তাঁকে উর্ধ্বলোকে হিজরত করানোর জন্য সুরক্ষা ও নিরাপত্তার সঙ্গে আসমানে উঠিয়ে নেয়া হলো। আল্লাহ তাআলা চক্রান্তকারী ও অবরোধকারীদের জল্পনা-কল্পনার গোলকধাঁধায় ফেলে দিয়ে তাদের خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةَ 'দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জায়গাতেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে'-এর নিদর্শন বানিয়ে দিলেন। তারপর জগতের মানুষের জাগতিক বিধানের জন্য এমন একটি সময় নির্ধারণ করে দিলেন যা মিসাকুন নাবিয়্যিন বা নবীদের থেকে গৃহীত অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতির প্রতিনিধিত্ব করার জন্য উপযুক্ত ছিলো। এটাই ওই তত্ত্ব যা ওহির মুখপাত্র রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জবানে প্রকাশ পেয়েছে এভাবে—

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا

'সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ! অচিরেই ইসা ইবনে মারইয়াম ন্যায়পরায়ণ শাসক হিসেবে তোমাদের মধ্যে অবতরণ করবেন।

এ-বিষয়টিকেই কুরআন وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ 'ইসা তো কিয়ামতের সুস্পষ্ট নিদর্শন'[১৪৫] বলে স্পষ্ট করেছে।

তারপর এই ব্যক্তিত্ব (ইসা আলাইহিস সালাম) নবীগণের প্রতিজ্ঞা ও প্রতিশ্রুতির প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব এইভাবে পালন করবেন, তিনি যখন অবতরণ করবেন, আল্লাহর কুদরতের এই কারিশমা দেখে মুসলমানদের অন্তর কুরআনের সত্যতা প্রতিপাদন করবে এবং ঈমানের আলোয় আলোকিত হয়ে উঠবে। তারা ধ্রুব বিশ্বাসের পর্যায়ে বিশ্বাস করবে যে, সন্দেহাতীতভাবে সিরাতে মুসতাকিম বা সরল পথ কেবল ইসলামই। আর সত্য সংবাদবাহক (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এই সংবাদ যেভাবে সত্যিকার অর্থে বাস্তব হয়েছে, তেমনি অদৃশ্য জগৎ সম্পর্কে তাঁর প্রদত্ত যাবতীয় সংবাদই সত্য এবং নিঃসন্দেহে সত্য।

আর নাসারা জাতি সামগ্রিকভাবে তাদের 'ত্রিত্ববাদ' ও 'প্রায়শ্চিত্ত'-সংক্রান্ত বাতিল আকিদার লজ্জিত ও অনুতপ্ত হবে। পবিত্র কুরআন ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি ঈমান আনাকে তাদের জন্য মুক্তির পথ ও সৌভাগ্যের পথ বলে বিশ্বাস করবে। আর ইহুদিরা যখন পথপ্রদর্শক মাসিহ ইসা আলাইহিস সালাম এবং পথভ্রষ্টকারী মাসিহ দাজ্জালের মধ্যে সত্য ও মিথ্যার যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করবে, পথপ্রদর্শক মাসিহ ইসা আলাইহিস সালাম-এর অবতরণের ফলে তাদের শূলিবিদ্ধ করা ও হত্যা করার অভিশপ্ত আকিদাকে মিথ্য সাব্যস্ত হয়েছে দেখতে পাবে, তখন তাদেরও সত্যের ওপর ঈমান আনা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে না। পথভ্রষ্টকারী মাসিহ দাজ্জালের বন্ধুরা ব্যতীত তাদের সবাই মুসলমান হয়ে যাবে। কুরআনই প্রকাশ করেছে এই সংবাদ—

وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ

"কিতাবিদের মধ্যে প্রত্যেকে তাদের মৃত্যুর পূর্বে তাকে (ইসা আলাইহিস সালামকে) বিশ্বাস করবেই।" [সুরা নিসা : আয়াত ১৫৯]

মুসলমানদের মধ্যে ঈমানের সজীবতা ও উচ্ছ্বাস, ইহুদি ও নাসারাদের আকিদা ও বিশ্বাসের পরিবর্তনের বিস্ময়কর বিপ্লব দেখার ফলে মুশরিক দলগুলোর ওপরও আল্লাহর ক্ষমতার প্রভাব পরিলক্ষিত হবে। তার সঙ্গে

---

[১৪৫] সুরা যুখরুফ : আয়াত ৬১।

আল্লাহ তাআলার পবিত্র নবীর আত্মিক প্রভাবও তাদের ওপর কার্যকর হবে। এর ফলে তারাও ইসলামের ছায়াতলে চলে আসবে এবং এইভাবে আল্লাহর ওহির মুখপাত্র, কুরআনের বাহক মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিম্ন-উদ্ধৃত সংবাদ বাস্তবে পরিণত হবে।

وَيَدْعُو النَّاسَ إِلَى الْإِسْلَامِ فَيُهْلِكُ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمِلَلَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِسْلَامَ وَيُهْلِكُ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ

"তিনি মানুষকে ইসলাম ধর্মের দাওয়াত প্রদান করবেন এবং আল্লাহ তাআলা তাঁর সময়ে সব বাতিল ধর্মকে বিলুপ্ত করে দেবেন এবং একমাত্র ইসলাম ধর্মই অবশিষ্ট থাকবে। আল্লাহ তাআলা তাঁর সময়ে 'মাসিহ দাজ্জাল'কে ধ্বংস করবেন।"

উল্লিখিত বিশদ বিবরণে আরে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে গেলো। কুরআন ও হাদিসসমূহের বর্ণনা প্রমাণ করছে যে, যদি এই কর্তব্য পালনের জন্য কোনো নতুন নবী প্রেরিত হতেন, তবে একদিকে নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খাতিমুল আম্বিয়া বা সর্বশেষ নবী হওয়ার বিশেষ যে-মর্যাদা তার অস্তিত্ব থাকতো এবং অপরদিকে সৃষ্টির সূচনালগ্নে নবীদের থেকে গৃহীত অঙ্গীকারও অস্তিত্বের জগতে প্রকাশ পেতো না। কেননা, ওই নতুন নবীকে সর্বাবস্থায় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উম্মতের মধ্য থেকেই হতে হতো। তবে পূর্ববর্তী নবীর (পরবর্তীকালে) আগমন কিতাব ও যুক্তির দিক থেকে খাতিমুল আম্বিয়া বা সর্বশেষ নবী হওয়ার বিশেষ মর্যাদার ক্ষতিকর হয় না এবং সৃষ্টির সূচনালগ্নে নবীদের থেকে গৃহীত অঙ্গীকারও পূর্ণ হয়।

সহিহ হাদিসসমূহের আলোকে অবতরণের ঘটনাবলি

আগের পৃষ্ঠাগুলো হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর অবতরণ প্রসঙ্গে যে-সকল সহিহ হাদিস উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো এবং অন্য আরো অনেক সহিহ হাদিস দ্বারা যেসব বিবরণ প্রকাশ পাচ্ছে সেগুলোকে পর্যায়ক্রমে নিম্নলিখিতরূপে বর্ণনা করা যেতে পারে।

কিয়ামতের দিনটি নির্ধারিত রয়েছে, কিন্তু আল্লাহ তাআলা ছাড়া সে সম্পর্কে আর কেউ কিছু জানে না। আর কিয়ামত সংঘটিত হবে

অকস্মাৎ। যেমন কুরআনে বলা হয়েছে— وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ 'কিয়ামতের জ্ঞান কেবল তাঁরই (আল্লাহরই) আছে।'[১৪৬]

কুরআনের অন্য সুরায় বলা হয়েছে—

حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا

"এমনকি অকস্মাৎ তাদের কাছে যখন কিয়ামত উপস্থিত হয়ে পড়বে তখন তারা বলবে, হায়! একে আমরা যে অবহেলা করেছি তার জন্য আক্ষেপ।"[১৪৭]

কুরআনের আরেক স্থানে বলা হয়েছে—

لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً

"আকস্মিকভাবেই তা তাদের ওপর আসবে।"[১৪৮]

مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ

(জিবরাইল আলাইহিস সালাম বললেন,) "কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত (আমি) জিজ্ঞাসকের (আপনার) চেয়ে অধিক জ্ঞাত নয় (কিয়ামত সম্পর্কে আপনার চেয়ে অধিক জ্ঞান আমার নেই, যে-মোটামুটি জ্ঞান আপনার আছে, সে-পরিমাণই আমার আছে)।"[১৪৯]

সহিহ মুসলিমে বর্ণিত একটি হাদিসে আছে—

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ –صلى الله عليه وسلم– يَقُولُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِشَهْرٍ : تَسْأَلُونِى عَنِ السَّاعَةِ وَإِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَأُقْسِمُ بِاللَّهِ مَا عَلَى الأَرْضِ مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ تَأْتِى عَلَيْهَا مِائَةُ سَنَةٍ.

জাবের বিন আবদুল্লাহ রা. বলেন, আমি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি তাঁর ওফাতের একমাস পূর্বে বলেছেন, 'তোমরা আমাকে জিজ্ঞেস করছো কিয়ামত কখন হবে? অথচ তা একমাত্র আল্লাহই জানেন। আমি আল্লাহর কসম করে বলছি, বর্তমানে (অর্থাৎ, আজকের দিনে) এই ভূপৃষ্ঠে যে-ব্যক্তিই বেঁচে আছে,

---

[১৪৬] সুরা যুখরুফ : আয়াত ৮৫।
[১৪৭] সুরা আনআম : আয়াত ৩১।
[১৪৮] সুরা আ'রাফ : আয়াত ১৮৭।
[১৪৯] সহিহ মুসলিম : হাদিস ১০২।

একশো বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর তাদের আর কেউই জীবিত থাকবে না।'[১৫০]

পবিত্র কুরআন ও সহিহ হাদিসসমূহ এমন কতগুলো আলামত বর্ণনা করেছে যা কিয়ামতের নিকটবর্তীকালে প্রকাশিত হবে। সেগুলোর মাধ্যমে কিয়ামত যে সন্নিকটে তা অনুধাবন করা যাবে। কিয়ামতের ওইসকল আলামতের মধ্যে অন্যতম প্রধান আলামত হলো হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর ঊর্ধ্বলোক থেকে পৃথিবীর বুকে অবতরণ। এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ :

মুসলমান ও নাসারাদের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ শুরু হবে। আর মুসলমানদের নেতৃত্ব ও ইমামত থাকবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বংশধরদের মধ্য থেকে মাহদি উপাধিযুক্ত একজন ব্যক্তির হাতে। এই ব্যাপক যুদ্ধ ও ফেতনার সময়েই পথভ্রষ্টকারী মাসিহ দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে। দাজ্জাল হবে ইহুদি বংশোদ্ভূত এবং তার চোখ থাকবে একটি। আল্লাহর কুদরতের কারিশমায় তার কপালে ك-ا-ف-ر অর্থাৎ 'কাফের' শব্দটি মুদ্রিত থাকবে। ঈমানদার বান্দাগণ তাদের ঈমানি বিচক্ষণতায় তা পড়তে পারবেন এবং তার دجل বা প্রতারণা থেকে সুরক্ষিত থাকবেন। এই দাজ্জাল প্রথমে নিজেকে খোদা বলে দাবি করবে এবং ভেলকিবাজদের মতো ভেলকি দেখিয়ে মানুষকে তার দিকে আকর্ষিত করবে। সে তার এই কর্মকৌশলে সফল না হয়ে কিছুকাল পরে নিজেকে পথপ্রদর্শক মাসিহ অর্থাৎ ইসা আলাইহিস সালাম হওয়ার বলে দাবি করবে। তার এই দাবিতে ইহুদিরা সামগ্রিকভাবে তার অনুসারী হয়ে পড়বে। তা এ-কারণে যে, ইহুদিরা পথপ্রদর্শক মাসিহ হযরত ইসা আলাইহিস সালামকে শূলিবিদ্ধ করে হত্যা করে ফেলার দাবি করেছিলো এবং আজ পর্যন্ত তারা পথপ্রদর্শক মাসিহর আগমনের অপেক্ষা করছে। এমনি অবস্থায় একদিন মুসলমানগণ সিরিয়ার দামেস্কের জামে মসজিদে প্রত্যুষে নামায আদায়ের জন্য সমবেত হবেন। নামাযের জন্য ইকামত শুরু হবে। আর প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদি (আলাইহিস সালাম) ইমামতির

---

[১৫০] সহিহ মুসলিম : হাদিস ৬৬৪৪।

জন্য জায়নামাযে পৌঁছবেন। এই সময়ে একটি আওয়াজ সবাইকে উৎকর্ণ করে তুলবে। মুসলমানগণ চোখ উঠিয়ে দেখবেন আকাশ সাদা মেঘে ছেয়ে গেছে। এর কিছুক্ষণ পরেই প্রত্যক্ষভাবে দেখা যাবে যে, হযরত ইসা আলাইহিস সালাম দুটি হলুদ বর্ণের চাদর পরিহিত অবস্থায় ফেরেশতাদের বাহুতে ভর দিয়ে ঊর্ধ্বলোক থেকে অবতরণ করছেন। ফেরেশতারা তাঁকে পূর্বদিকের মিনারার ওপর নামিয়ে দিয়ে চলে যাবেন। এইভাবে পুনরায় বিশ্বজগতের সঙ্গে হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর সম্পর্ক স্থাপিত হবে এবং তিনি স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে মসজিদের আঙ্গিনায় অবতরণের জন্য লোকজনকে মই আনতে বলবেন। তৎক্ষণাৎ তাঁর আদেশ পালিত হবে এবং তিনি মুসলমানদের সঙ্গে নামাযের কাতারে এসে দাঁড়াবেন। মুসলমানগণের ইমাম (প্রতিশ্রুত মাহদি) ইসা আলাইহিস সালাম-এর সম্মানার্থে পিছে সরে এসে দাঁড়াবেন এবং তাঁকে নামাযে ইমামতি করার জন্য অনুরোধ করবেন। ইসা আলাইহিস সালাম বলবেন, এই ইকামত দেয়া হয়েছে আপনার ইমামতির জন্য, সুতরাং আপনিই নামায পড়ান। নামায থেকে ফারেগ হওয়ার পর মুসলমানদের ইমামত (নেতৃত্ব) হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর হাতে চলে আসবে। তারপর তিনি অস্ত্র হাতে পথভ্রষ্টকারী মাসিহ দাজ্জালকে হত্যা করার উদ্দেশে বের হবেন। শহর-প্রাচীরের বাইরে লুদ নামক ফটকের সামনে তিনি দাজ্জালকে পাবেন। দাজ্জাল বুঝতে পারবে যে, তার ভেলকিবাজি ও প্রতারণা এবং তার জীবনের অবসান ঘটার সময় চলে এসেছে। ভয়ে সে পারদের মতো দ্রবীভূত হতে শুরু করবে। হযরত ইসা আলাইহিস সালাম এগিয়ে গিয়ে তাকে হত্যা করে ফেলবেন। দাজ্জালের সঙ্গীদের মধ্য থেকে যে-সকল ইহুদি নিহত হওয়া থেকে রক্ষা পাবে তারা এবং খ্রিস্টানরা সবাই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবে। তারা সবাই মাসিহে হেদায়েত (পথপ্রদর্শক মাসিহ) ইসা আলাইহিস সালাম-এর সত্যিকারের অনুসরণের জন্য মুসলমানদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলতে শুরু করবে। এর প্রভাব মুশরিক দলগুলোর ওপরও পড়বে। এইভাবে কিয়ামতের পূর্বকালে ইসলাম ছাড়া আর কোনো ধর্মই অবশিষ্ট থাকবে না।

এসব ঘটনার কিছুকাল পরে ইয়াজুজ ও মাজুজের দল বের হবে এবং আল্লাহ তাআলার নির্দেশ অনুসারে হযরত ইসা আলাইহিস সালাম

মুসলমানদেরকে তাদের ফেৎনা থেকে সুরক্ষিত রাখবেন। হযরত মাসিহ আলাইহিস সালাম-এর শাসনকাল হবে চল্লিশ বছর[১৫১]। সেই সময় তিনি বিবাহিত জীবন অতিবাহিত করবেন। তাঁর শাসনকালে পূর্ণ ইনসাফ, ন্যায়বিচার, বরকত ও জনকল্যাণের অবস্থা এমন হবে যে, ছাগল ও বাঘ এক ঘাটে পানি খাবে। অন্যায় ও পাপাচারের মূলোৎপাটিত হবে।[১৫২]

হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর ওফাত

চল্লিশ বছরব্যাপী শাসনকালের পর ইসা আলাইহিস সালাম ইন্তেকাল করবেন এবং রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পাশে সমাহিত হবেন। হযরত আবু হুরায়রাহ রা. থেকে বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদিসে আছে—

فَيَمْكُثُ أَرْبَعِينَ سَنَةً ثُمَّ يُتَوَفَّى وَيُصَلِّي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ وَيَدْفِنُونَهُ.

ইসা আলাইহিস সালাম এই পৃথিবীর বুকে চল্লিশ বছর জীবিত থেকে স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করবেন। মুসলমানগণ তাঁর জানাযার নামায পড়বেন এবং তাঁকে দাফন করবেন।'[১৫৩]

আর ইমাম তিরমিযি মুহাম্মদ বিন ইউসুফ বিন আবদুল্লাহ বিন সালাম-এর সূত্রে উত্তম সনদের সঙ্গে নিম্নলিখিত হাদিসটি বর্ণনা করেছেন—

مكتوب في التوراة صفة محمد وصفة عيسى ابن مريم يدفن معه.

[১৫১] সহিহ মুসলিমের হাদিসে রয়েছে যে, ইসা আলাইহিস সালাম-এর শাসনকাল হবে সাত বছর। হাফেযে হাদিস ইমাদুদ্দিন বিন কাসির রহ. বলেন, এই দুটি কথার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের উপায় এই যে, যখন ইসা আলাইহিস সালামকে উর্ধ্বলোকে উঠিয়ে নেয়া হয়েছিলো তখন তার বয়স ছিলো ৩৩ বছর এবং উর্ধ্বলোক থেকে অবতরণের পর তিনি আরো ৭ বছর জীবিত থাকবেন। এইভাবে মানবজগতে তাঁর পূর্ণ আয়ুষ্কাল হবে ৪০ বছর।

[১৫২] ইবনে আসাকির (আলি বিন হাসান বিন হিবাতুল্লাহ ইবনে আসাকির) কর্তৃক তাঁর ইতিহাসগ্রন্থ تاريخ دمشق الكبير-এ সহিহ হাদিসসমূহ থেকে গৃহীত।

[১৫৩] মুসনাদে আহমদ : হাদিস ৯৬৩২।

ইতোপূর্বে এই হাদিস পূর্ণাঙ্গ উদ্ধৃত করা হয়েছে। হাদিসটিকে ইবনে আবি শায়বা তাঁর মুসান্নাফে, ইমাম আহমদ তাঁর মুসনাদে, আবু দাউদ তাঁর সুনানে, ইবনে জারির তাঁর তাফসিরে, ইবনে হিব্বান তাঁর সহিহে হযরত আবু হুরায়রাহ রা. থেকে বর্ণনা করেছেন।

(আবদুল্লাহ বিন সালাম বলেন,) "তাওরাতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বৈশিষ্ট্য লিপিবদ্ধ আছে এবং ইসা আলাইহিস সালাম-এর বৈশিষ্ট্যও লিপিবদ্ধ আছে যে, তিনি তাঁর সঙ্গে সমাহিত হবেন।"[১৫৪]

আয়াত : وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا

সুরা মায়িদায় হযরত মাসিহ আলাইহিস সালাম-এর বিভিন্ন অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। তারপর তাঁরই আলোচনার সঙ্গে সুরার শেষাংশের সমাপ্তি ঘটেছে। এখানে আল্লাহ তাআলা প্রথমে কিয়ামতের ওই ঘটনার চিত্র অঙ্কন করেছেন যখন আম্বিয়ায়ে কেরাম (আলাইহিমুস সালাম) তাঁদের উম্মতদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবেন। তখন তাঁর অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে তাঁদের অজ্ঞতা প্রকাশ করে নিবেদন করবেন, হে আল্লাহ, আজকের দিনটি আপনি নির্ধারণ করেছেন এইজন্য যে, প্রতিটি ব্যাপারে বাস্তব অবস্থার প্রতি লক্ষ করে যথার্থ মীমাংসা শুনিয়ে দেয়া হবে। আর আমরা কেবল বাহ্যিক অবস্থার বিচারেই মীমাংসা করতে পারি। মানুষের অন্তর সমূহ ও প্রকৃত অবস্থা দর্শনকারী আপনি ছাড়া আর কেউ নেই। সুতরাং, আজ আমরা কী সাক্ষ্য দিতে পারি? আমরা তো কেবল এতটুকু বলতে পারি যে, আমরা কিছুই জানি না। আপনি যাবতীয় অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত এবং এ-কারণে আপনিই সবকিছু সম্যক অবগত আছেন। এ-বিষয়ে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে—

يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ

(سورة المائدة)

"স্মরণ করো, যেদিন আল্লাহ রাসুলগণকে একত্র করবেন এবং জিজ্ঞেস করবেন, 'তোমরা কী উত্তর পেয়েছিলে?" তারা বলবে, 'এই বিষয়ে আমাদের কোনো জ্ঞানই নেই; তুমিই তো অদৃশ্য সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত।" [সুরা মায়িদা : আয়াত ১০৯]

প্রকাশ থাকে যে, আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম-এর لَا عِلْمَ لَنَا 'আমাদের কোনো জ্ঞানই নেই' কথাটির ভিত্তি 'ইলমে হাকিকি' (মানুষের অন্তরের

---

[১৫৪] সুনানে তিরমিযি : হাদিস ৩৬১৭।

প্রকৃত অবস্থা-সম্পর্কিত জ্ঞান) নাকচ করার ওপর স্থাপিত হবে। কথাটির উদ্দেশ্য এটা হবে না যে, তাঁরা প্রকৃতপক্ষে তাঁদের উম্মতগণের জবাব সম্পর্কে অজ্ঞ—কারা ঈমান এনেছে আর কারা অস্বীকৃতি জানিয়েছে তা তাঁরা জানেন না। কেননা, জবাব প্রদানের উদ্দেশ্য যদি এটাই হয়ে থাকে, তবে 'আমাদের কোনো জ্ঞানই নেই' বলা প্রকাশ্য ভ্রান্তি এবং নবীগণের প্রতি এমন অশোভনীয় কাজের সম্পর্ক আরোপ করা অসম্ভব। সুতরাং, আম্বিয়ায়ে কেরামের এ-ধরনের জবাব উল্লিখিত ইলমে হাকিকি বা প্রকৃত অবস্থার প্রেক্ষিতেই হবে; বাহ্যিক ও প্রকাশ্য অবস্থার প্রেক্ষিতে নয়। বাহ্যিক অবস্থার ব্যাপারে তাঁদের সাক্ষ্য প্রদানের পক্ষে স্বয়ং পবিত্র কুরআনই ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী। কারণ, কুরআন একাধিক জায়গায় বলেছে যে, কিয়ামতের দিন আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম নিজ নিজ উম্মতের জন্য এই সাক্ষ্য প্রদান করবেন : 'আমরা তাদের কাছে আল্লাহর পয়গাম পৌঁছে দিয়েছিলাম।' উম্মতেরা আমাদের দাওয়াত কবুল করেছে বা প্রত্যাখ্যান করেছে বলেও তাঁরা সাক্ষ্য প্রদান করবেন। সুতরাং, এই দুটি জায়গায় লক্ষ রেখে বলা যাবে যে, আদব রক্ষার নিয়ম অনুসারে প্রথমে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম-এর এরূপই জবাব হবে যা সুরা মায়েদায় উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু যখন তাঁদের প্রতি মহান আল্লাহর এই নির্দেশ হবে যে, তাঁরা যেনো শুধু তাদের বাহ্যিক জ্ঞান অনুসারে সাক্ষ্য প্রদান করে, তখন তাঁরা সাক্ষ্য প্রদান করবেন। পবিত্র কুরআন এ-ব্যাপারে বলছে—

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا (سورة النساء)

'(কিয়ামতের দিন) যখন আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন সাক্ষী উপস্থিত করবো (তাদের নবীদেরকে ডাকবো, যাঁরা তাঁদের উম্মতদের যাবতীয় আমল ও অবস্থা সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবেন।) এবং তোমাকে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষীরূপে[১৫৫] উপস্থিত করবো তখন কী অবস্থা হবে?' [সুরা নিসা : আয়াত ৪১]

পবিত্র কুরআনে আরো বলা হয়েছে—

---

[১৫৫] কিয়ামতের দিন প্রত্যেক উম্মতের সাক্ষী হবেন তাদের নবী। আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হবেন সকল নবীর পক্ষে সাক্ষী।

وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِ
بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (سورة الزمر)

শ্ব তার প্রতিপালকের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হবে, আমলনামা পেশ করা ব এবং নবীগণকে ও সাক্ষীদেরকে উপস্থিত করা হবে এবং সকলের ধ্য ন্যায়বিচার করা হবে এবং তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না।" [সুরা ার : আয়াত ৬৯]

রত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে আম্বিয়া লাইহিমুস সালাম-এর لَا عِلْمَ لَنَا 'আমাদের কোনো জ্ঞানই নেই' থাটির তাফসির বর্ণিত হয়েছে—

وقال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: { يوم يجمع الله الرسل .... إ أنت علام الغيوب } يقولون للرب، عز وجل: لا علم لنا، إلا علم أنت أعلم منا.

ালি বিন আবু তালহা রা. হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু নহুমা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি يوم يجمع الله الرسل আয়াতটির ফসিরে বলেন, নবী ও রাসুলগণ (আলাইহিমুস সালাম) রাব্বুল লামিনের সামনে নিবেদন করবেন, আমাদের তো কোনো জ্ঞান নেই; ব যতটুকু জ্ঞান আছে, সে সম্পর্কে আপনি আমাদের চেয়ে ত্তমরূপেই অবগত আছেন।"

র শাইখুল মুহাক্কিকিন আল্লামা সাইয়িদ আনওয়ার শাহ কাশ্মিরি াহিমাহুল্লাহ) উল্লিখিত আয়াতে لَا عِلْمَ لَنَا বাক্যটিকে আম্বিয়ায়ে লামের ইলমে হাকিকি বা প্রকৃত জ্ঞান না থাকার অর্থে গ্রহণ করে ছেন—

টা সর্বজনস্বীকৃত ব্যাপর যে, একজন মানুষ—তিনি যে-কোনো স্তরের যে-কোনো শ্রেণিরই হোন না কেনো—অন্য মানুষ সম্পর্কে যা-কিছু নেন তা প্রকৃত জ্ঞানের বিচারে ধারণার চেয়ে অধিক 'জ্ঞানে'র স্তরে ছে না। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, نحن نحكم بالظواهر و الله متولى السر 'আমরা বাহ্যিক অবস্থাসমূহের প্রেক্ষিতে

মীমাংসা করতে পারি; আর গোপনীয় রহস্যাবলির তত্ত্বাবধায়ক তো একমাত্র আল্লাহ।' আরেকটি হাদিসে আছে, রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা আমার কাছে তোমাদের ঝগড়া-কলহ (মীমাংসার জন্য) নিয়ে আসো এবং তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ খুবই বাকপটু হয়ে থাকো। আর গায়েব সম্পর্কে আমার কোনো জ্ঞান নেই যে, প্রকৃত অবস্থাসমূহ জেনে যাবো। সুতরাং, যে-মীমাংসা আমি প্রদান করি তা বাহ্যিক অবস্থার প্রেক্ষিতেই প্রদান করে থাকি। অতএব, তোমাদের মনে রাখা উচিত, যে-ব্যক্তি বাকপটুতার তার ভাইয়ের সামান্যতম অংশও আত্মসাৎ করবে, সে নিঃসন্দেহে জাহান্নামের অংশই লাভ করলো।"[১৫৬]

পবিত্র কুরআন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদিস, সাহাবায়ে কেরামের বাণী, উলামায়ে কেরামের উক্তি সবকিছু এটাই স্পষ্ট করছে যে, এখানে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম-এর জবাব তাঁদের অজ্ঞতা প্রকাশ করছে না; বরং আদবের নিয়ম রক্ষার্থে হাকিকি ইলম বা প্রকৃত জ্ঞান না থাকার বিষয়টি প্রকাশ করছে।

মোটকথা, এখানে মূলত হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর ঘটনাটিরই আলোচনা চলছে, যা কিয়ামতের দিন ঘটবে। অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা তাঁকে তাঁর প্রতি নিজের অনুগ্রহসমূহ স্মরণ করিয়ে দেয়ার পর তাঁর উম্মত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন। আর ইসা আলাইহিস সালাম অবস্থার প্রেক্ষিতে জবাব দেবেন। কিন্তু পূর্বের আয়াতসমূহে অন্যান্য বিষয় উল্লেখ করা হয়েছিলো। ফলে তার থেকে পার্থক্য নির্ণয় করার জন্য ভূমিকা হিসেবে কিয়ামতের দিন ঘটিতব্য ওইসব সওয়াল-জওয়াবেরও উল্লেখ জরুরি হয়ে পড়লো যা সাধারণভাবে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামকে তাঁদের উম্মতদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। এ-কারণেও বিষয়টির উল্লেখ জরুরি ছিলো যে, পূর্বে আয়াতসমূহে হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর যে-জবাব উল্লেখ করা হয়েছে তার বর্ণনাশৈলীও আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম-এর জবাবের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখে। এ-বিষয়ে পবিত্র কুরআন বলছে—

---

[১৫৬] আকিদাতুল ইসলাম, পৃষ্ঠা ১৬৫।

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ () مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ () إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (سورة المائدة)

"স্মরণ করো, আল্লাহ যখন বলবেন, 'হে মারইয়াম-তনয় ইসা, তুমি কি লোকদেরকে বলেছো যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া আমাকে ও আমার জননীকে দুই ইলাহরূপে গ্রহণ করো?' সে বলবে, 'তুমিই মহিমান্বিত! যা বলার অধিকার আমার নেই তা বলা আমার পক্ষে শোভন নয়। যদি আমি তা বলতাম তবে তুমি তো তা জানতে। আমার অন্তরের কথা তো তুমি অবগত আছো, কিন্তু তোমার অন্তরের কথা আমি অবগত নই; তুমি তো অদৃশ্য সম্পর্কে সম্যক অবগত আছো। তুমি আমাকে যে-আদেশ দিয়েছো তা ছাড়া আমি তাদেরকে কিছুই বলি নি, তা এই : 'তোমরা আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহর ইবাদত করো এবং যতদিন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম ততদিন আমি ছিলাম তাদের কার্যকলাপের সাক্ষী; কিন্তু যখন তুমি আমাকে তুলে নিলে তখন তুমিই তো ছিলে তাদের কার্যকলাপের তত্ত্বাবধায়ক এবং তুমিই সর্ববিষয়ে সাক্ষী। তুমি যদি তাদেরকে শাস্তি দাও তবে তারা তো তোমারই বান্দা, (যা চান তাদের সঙ্গে তা করতে পারেন) আর যদি তাদেরকে ক্ষমা করো তবে তুমি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।" [সূরা মায়িদা : আয়াত ১১৬-১১৮]

হযরত ইসা আলাইহিস সালাম তাঁর জবাব দেয়ার পর আল্লাহ তাআলা বলবেন—

قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (سورة المائدة)

"আল্লাহ বলবেন, 'এই সেই দিন যেদিন সত্যবাদীরা তাদের সত্যতার জন্য উপকৃত হবে, তাদের জন্য আছে জান্নাত, যার পাদদেশে নদী

contents

প্রবাহিত, তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে; আল্লাহ তাদের প্রতি প্রসন্ন এবং তাঁরাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট; এ তো মহাসফলতা।" [সুরা মায়িদা : আয়াত ১১৯]

হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর জবাব একজন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ উচ্চমর্যাদাশীল নবীর শানের সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল। তিনি প্রথমে রাব্বুল ইজ্জতের দরবারে তাঁর অক্ষমতা প্রকাশ করে বলবেন, এটা কীভাবে সম্ভব ছিলো যে, আমি এমন অশোভন কথা বলি যা সম্পূর্ণরূপে সত্যের বিরোধী! سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ 'তুমিই মহিমান্বিত! যা বলার অধিকার আমার নেই তা বলা আমার পক্ষে শোভন নয়।' তারপর আদব রক্ষার্থে আল্লাহর প্রকৃত জ্ঞানের সামনে নিজের জ্ঞানকে তুচ্ছ ও অজ্ঞতাতুল্য বলে প্রকাশ করবেন, إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ 'যদি আমি তা বলতাম তবে তুমি তো তা জানতে। আমার অন্তরের কথা তো তুমি অবগত আছো, কিন্তু তোমার অন্তরের কথা আমি অবগত নই; তুমি তো অদৃশ্য সম্পর্কে সম্যক অবগত আছো।' তারপর তিনি কী কর্তব্য পালন করেছেন তার অবস্থা তুলে ধরে আরজ করবেন, مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ 'তুমি আমাকে যে-আদেশ দিয়েছো তা ব্যতীত আমি তাদেরকে কিছুই বলি নি, তা এই : 'তোমরা আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহর ইবাদত করো।' এরপর তিনি তাঁর উম্মত তাঁর সত্যের দাওয়াতের কী জবাব দিয়েছিলো সে-ব্যাপারেও বাহ্যিক বিষয়সমূহের সাক্ষ্যও এমনভাবে প্রকাশ করবেন, যাতে তাঁর সাক্ষ্য আল্লাহ তাআলার সাক্ষ্যের তুলনায় তুচ্ছ মনে হয়, وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ 'এবং যতদিন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম ততদিন আমি ছিলাম তাদের কার্যকলাপের সাক্ষী; কিন্তু যখন তুমি আমাকে তুলে নিলে তখন তুমিই তো ছিলে তাদের কার্যকলাপের তত্ত্বাবধায়ক এবং তুমিই সর্ববিষয়ে সাক্ষী।' তিনি জানেন যে, তাঁর উম্মতের মধ্যে অনুগত মুমিনও রয়েছে, অবাধ্যাচারী কাফেরও রয়েছে। তাদের শাস্তি প্রদান বা মার্জনার প্রর্থনা এমন ভঙ্গিতে করবেন, যাতে

একদিকে আল্লাহর নির্ধারিত কর্মফল বিধানের বিরোধিতাও হবে না এবং অপরদিকে উম্মতের সঙ্গে দয়া ও মমতার আবেগ যা কামনা করে তা-ও পূর্ণ হবে। তাই তিনি বলবেন, إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ 'তুমি যদি তাদেরকে শাস্তি দাও তবে তারা তো তোমারই বান্দা, আর যদি তাদেরকে ক্ষমা করো তবে তুমি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।'

হযরত ইসা আলাইহিস সালাম তাঁর নিবেদন বা জবাবের বিষয়বস্তু শেষ করার পর রাব্বুল আলামিন তাঁর ন্যায়বিচারের বিধানের ফয়সালা শুনিয়ে দেবেন। যাতে রহমত ও মাগফেরাতের উপযোগী লোকেরা নিরাশ হয়ে না পড়েন এবং অন্তরসমূহ আনন্দ ও প্রফুল্লতায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে এবং শাস্তির উপযুক্ত লোকেরা ভুল আশা পোষণ করতে না পারে। কুরআন যেমন বলছে— قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ 'আল্লাহ বলবেন, এই সেই দিন যেদিন সত্যবাদীরা তাদের সত্যতার জন্য উপকৃত হবে।'

এসব বিবরণের সারমর্ম এই যে, আলোচ্য আয়াতসমূহের পূর্বাপর সম্পর্ক স্পষ্ট করছে যে, এই ঘটনা কিয়ামতের দিন ঘটবে এবং তা হযরত ইসা আলাইহিস সালাম যখন উর্ধ্বলোকে উত্তোলিত হন তখন ঘটে নি। তা এ-কারণে যে, হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর (সওয়াল-জওয়াবের) এই ঘটনার সূচনা হয়েছে يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ আয়াত দ্বারা এবং তার সমাপ্তি ঘটেছে يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ আয়াত দ্বারা। সুতরাং তা কিয়ামতের দিন ব্যতীত আর কোনো দিনের জন্য প্রযোজ্য ও সত্য হতে পারে না। এবং এই একটিমাত্র অকাট্য বিষয় ছাড়া অন্যকিছুর সম্ভাবনারও মোটেই অবকাশ নেই।

উল্লিখিত বিবরণসমূহ এটাও প্রকাশ করছে যে, হযরত ইসা আলাইহিস সালাম তাঁর উম্মতের ঈমান আনা ও অস্বীকার করার অবস্থা সম্পর্কে অবগত থাকা সত্ত্বেও সুরা মায়িদার আয়াতসমূহে বর্ণিত প্রকাশভঙ্গি অবলম্বন করবেন এ-কারণে যে, অন্য নবী ও রাসুলগণও (আলাইহিমুস সালাম) ওই স্থানের নাজুক অবস্থায় রাব্বুল ইজ্জতের দরবারে চূড়ান্ত পর্যায়ের আদব রক্ষার্থে এই প্রকাশভঙ্গিই অবলম্বন করবেন।

হযরত ইসা আলাইহিস সালাম ও অন্য আম্বিয়া কেরাম আলাইহিমুস সালাম-এর জবাবপ্রদানে প্রকাশভঙ্গি একইরকম হওয়া সত্ত্বেও বিস্তারিত ও মোটামুটি বর্ণনার পার্থক্য শুধু এ-কারণে যে, আলোচ্য আয়াতগুলোর মূল লক্ষ্য হলো হযরত ইসা আলাইহিস সালাম, তাঁর উম্মতের ঈমান আনা ও অবিশ্বাস করা ও তার পরিণতি সম্পর্কে আলোচনা করা। আর অন্য আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম-এর উল্লেখ শুধু ঘটনার ভূমিকা হিসেবে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে।

উল্লিখিত বিশদ বিবরণ দ্বারা প্রকৃত অবস্থা যথার্থরূপে উন্মোচিত হওয়া সত্ত্বেও সাধারণ মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে মির্যা কাদিয়ানির খলিফা মিস্টার মুহাম্মদ আলি লাহোরি পবিত্র কুরআনের আয়াতগুলোর অর্থ যেভাবে বিকৃত করেছে তাও এখানে আলোচনাযোগ্য। সে বলে, সুরা মায়িদায় বর্ণিত হযরত ইসা আলাইহিস সালাম ও রাব্বুল আলামিনের মধ্যে এই প্রশ্নোত্তর-ভিত্তিক কথোপকথন হয়েছিলো ওই সময়, যখন ইসা আলাইহিস সালাম শিষ্যরা তাঁর মৃতদেহ হস্তগত করে চিকিৎসা দিয়ে তাঁকে সুস্থ করে তুলেছিলো। তারপর তিনি সিরিয়া থেকে পলায়ন করে মিসরে এবং মিসর থেকে কাশ্মিরে পৌঁছলেন। কাশ্মিরেই তিনি অপরিচিত ও নিরুদ্দেশ থেকে প্রাণ ত্যাগ করেন। মিস্টার লাহোরি তার এই দাবির পক্ষে দুটি প্রমাণ পেশ করেছে : তার একটি এই যে, وَإِذْ قَالَ اللّٰهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ আয়াতে إِذْ শব্দটি আরবি ভাষার ব্যাকরণ অনুযায়ী অতীতকালের জন্য ব্যবহৃত হয়, ভবিষ্যৎকালের জন্য ব্যবহৃত হয় না। দ্বিতীয় প্রমাণ এই যে, সাধারণ মুসলমানগণের আকিদা অনুসারে হযরত ইসা মাসিহ আলাইহিস সালাম-এর ইন্তেকাল না-ই হয়ে থাকে এবং তিনি কিয়ামতের পূর্বকালে পৃথিবীতে অবতরণ করেনই, তবে এটা জরুরি যে, তিনি তাঁর উম্মত (নাসারা জাতি)-এর হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর খোদা হওয়ার ও ত্রিত্ববাদের আকিদা পোষণ করার বিষয়টি অবগত আছেন। কেননা, নাসারা জাতি তাঁর উর্ধ্বলোকে উত্তোলিত হওয়ার আগ পর্যন্ত ত্রিত্ববাদের আকিদা পোষণ করতো না। যদি এরূপই হতো, (অর্থাৎ, ইসা আলাইহিস সালাম ইন্তেকাল না করতেন) তবে ইসা আলাইহিস সালাম-এর জবাব এই প্রকাশভঙ্গিতে হতো যাতে তাঁর অজ্ঞতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। (অর্থাৎ, তিনি ইন্তেকাল করেছেন বলেই এই প্রকাশভঙ্গিতে জবাব দিয়েছেন।)

মিস্টার লাহোরি পবিত্র কুরআনের অর্থের বিকৃতি সাধনের জন্য অগ্রসর হয়েছে হয়তো এ-কারণে যে, সে তার পথভ্রষ্টকারী মির্যা কাদিয়ানির মাসিহ হওয়ার দাবিকে শক্তিশালী করে এবং বিভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতামূলক কর্মকাণ্ড করে 'প্রকাশ্য ক্ষতি'র সরঞ্জাম প্রস্তুত করে। অথবা সে আরবি ভাষার ব্যাকরণ-বিষয়ে এতটাই অজ্ঞ যে, নাহুশাস্ত্রের সাধারণ ব্যবহারিক নিয়মাবলিও তার জানা নেই। তা ছাড়া কুরআন মাজিদের আয়াতসমূহের পূর্বাপর সম্পর্কেরও কোনো জ্ঞান তার নেই। তাকে মূর্খের মতো কেবল দাবি উত্থাপন করতেই দুঃসাহসী হতে দেখা যাচ্ছে।

আরবি ভাষার যেসব নিয়মাবলিতে إذْ ও إذا অব্যয় দুটির এই পার্থক্য বর্ণিত হয়েছে যে, إذْ যদি ভবিষ্যৎকালবাচক ক্রিয়ার সঙ্গেও আসে, তবু সে অতীতকালের অর্থ প্রদান করে এবং إذا যদি অতীতকালবাচক ক্রিয়ার সঙ্গেও আসে, তবু সে ভবিষ্যৎকালের অর্থ প্রদান করে, সেসব নিয়মাবলিতে মাআনি ও বালাগাতের (অলঙ্কারশাস্ত্রের) আলেমগণ বলেছেন, অনেক সময় এমনও হয় যে, অতীতকালের কোনো ঘটনাকে এমনভাবে উপস্থাপন করার জন্য, যেনো তা বর্তমান সময়ে ঘটছে, ভবিষ্যৎকালবাচক ক্রিয়ারূপ দ্বারা তা প্রকাশ করা হয়। অর্থাৎ, এর জন্য إذْ অব্যয়ের ব্যবহার বৈধ মনে করা হয়, এমনকি উত্তম মনে করা হয়। এমন ব্যবহারকে استحضار ও حكاية الحال বলা হয়। একইভাবে ভবিষ্যতে ঘটিতব্য কোনো ঘটনাকে—যার সংঘটন সম্পর্কে এই বিশ্বাস দেয়া হয় যে তা অবশ্যই ঘটবে এবং তার বিপরীত হওয়া অসম্ভব—অধিকাংশ সময় অতীতকালবাচক ক্রিয়ারূপ দ্বারা প্রকাশ করা উত্তম বলে বিবেচিত হয়। বরং ভাবপ্রকাশের অলঙ্কারের প্রেক্ষিতে একে জরুরি ও উপকারী বলে বিশ্বাস করা হয়। কেননা, এইভাবে সম্বোধিত ব্যক্তি ও শ্রোতার সামনে ভবিষ্যৎকালের ঘটনার এমনভাবে উপস্থিত হয়, যেনো তা ঘটে গিয়েছে। একেও استحضار-এর একটি অবস্থা মনে করা হয়। দূরে যাওয়ার দরকার কী, ভবিষ্যৎকালের জন্য إذْ অব্যয়টির ব্যবহার স্বয়ং কুরআন মাজিদেই অনেক জায়গায় প্রমাণিত রয়েছে।

সুরা আনআমে কিয়ামতের দিন পাপাচারীদের অবস্থা কীরূপ হবে তার চিত্র অঙ্কন করে বলা হয়েছে—

وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (سورة الأنعام)

"তুমি যদি দেখতে পেতে যখন তাদেরকে আগুনের পাশে দাঁড় করানো হবে এবং তারা বলবে, 'হায়! যদি আমাদের ফিরিয়ে দেয়া হতো তবে আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিদর্শনকে অস্বীকার করতাম না এবং আমরা মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।'" [সুরা আনআম : আয়াত ২৭]

আর এই সুরা আনআমেই কিয়ামতের দিন অপরাধীদের অবস্থা কেমন হবে তা উল্লেখ করে বলা হয়েছে—

وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (سورة الأنعام)

"তুমি যদি দেখতে পেতে তাদেরকে যখন তাদের প্রতিপালকের সামনে দাঁড় করানো হবে এবং তিনি বলবেন, 'এটা কি প্রকৃত সত্য নয়?' তারা বলবে, 'আমাদের প্রতিপালকের শপথ, নিশ্চয়ই সত্য।' তিনি বলবেন, 'তবে তোমরা যে-কুফরি করতে তার জন্য এখন তোমরা শাস্তি ভোগ করো।'" [সুরা আনআম : আয়াত ৩০]

আর ওই পাপীদেরই কিয়ামতের দিন কী অবস্থা হবে তার চিত্র সুরা সাবায় অঙ্কন করা হয়েছে এভাবে—

وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ () وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ

"যদি তুমি দেখতে যখন এরা ভীত-বিহ্বল হয়ে পড়বে, তখন এরা অব্যাহতি পাবে না এবং এরা নিকটস্থ স্থান থেকে ধৃত হবে, এবং এরা বলবে, আমরা ঈমান আনলাম'" [সুরা সাবা : আয়াত ৫১-৫২]

আর সুরা সাজদায় এ-বিষয়টিকে বলা প্রকাশ করা হয়েছে এভাবে—

وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ (سورة السجدة)

"হায়! তুমি যদি দেখতে যখন অপরাধীরা তাদের প্রতিপালকের সামনে অধোবদন হয়ে বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা দেখলাম ও

শুনলাম, এখন তুমি আমাদেরকে পুনরায় (পৃথিবীতে) প্রেরণ করো, আমরা সৎকর্ম করবো, আমরা তো দৃঢ় বিশ্বাসী।'" [সূরা সাজদা : আয়াত ১২]
উল্লিখিত স্থানগুলো এবং এ-জাতীয় আরো অনেক স্থান আছে যাতে ভবিষ্যৎকালের ঘটনাকে অতীতকালবাচক ক্রিয়ারূপ দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে এবং এই জন্য إِذْ অব্যয়টির ব্যবহার হিতকর মনে করা হয়েছে। সুতরাং, উল্লিখিত আয়াতসমূহে إذ وقفوا – قال – قالوا – إذ فزعوا – وأخذوا – إذ المجرمون ناكسوا ক্রিয়াগুলো অতীতকালবাচক শব্দ হয়েও ভবিষ্যৎকালের অর্থ প্রদান করছে, তেমনি وَإِذْ قَالَ اللّٰهُ يَا عِيسَى-এ إِذْ-এর ব্যবহারও ভবিষ্যৎকালের জন্য বুঝে নিন। আর যেভাবে এসকল স্থানের পূর্বাপর সম্পর্ক বুঝাচ্ছে যে, এসব ঘটনার সম্পর্ক কিয়ামত-দিবসের সঙ্গে স্থাপিত, তেমনি আলোচ্য (ইসা আলাইহিস সালাম-এর সওয়াল-জওয়াবের) আয়াতগুলোর পূর্বাপর সম্পর্কও প্রকাশ করছে যে, এই ঘটনার সম্পর্ক কিয়ামত-দিবসের সঙ্গে।

আরবি ভাষার ব্যাকরণের তথ্যনির্দেশক বিশ্লেষণের পর মিস্টার লাহোরির দ্বিতীয় প্রমাণটির প্রতি লক্ষ করুন। ওটিকে এর চেয়েও বেশি দুর্বল দেখতে পাবেন। কেননা, পূর্বের বিশ্লেষণ থেকে এ-বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, সুরা মায়িদার আলোচ্য আয়াতগুলোতে হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর জবাবের ভিত্তি কিছুতেই এর ওপর নয় যে, নিজের উম্মতের পথভ্রষ্টতা সম্পর্কে তাঁর কোনো জ্ঞান নেই এবং এজন্য তিনি অজ্ঞতা প্রকাশ করবেন। এই ওই আয়াতগুলোর প্রতি মনোনিবেশ করলে স্পষ্টভাবে দেখতে পাবেন যে, হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর আসল জবাব শুধু এতটুকু—

مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ

'তুমি আমাকে যে-আদেশ দিয়েছো তা ছাড়া আমি তাদেরকে কিছুই বলি নি, তা এই : তোমরা আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহর ইবাদত করো।'

আর এর আগের ও পরের বাক্যগুলোতে হয়তো জবাবের অবস্থানুরূপ ভূমিকা রয়েছে অথবা আল্লাহ তাআলার ক্ষমতা ও পরাক্রম এবং নিজের উপায়হীনতা ও অক্ষমতা, বরং দাসত্বের প্রকাশ রয়েছে। যাতে একজন

উচ্চমর্যাদাশীল নবীর শান অনুযায়ী মহান আল্লাহর সামনে সাক্ষ্য পেশ করা হয়েছে। এ ছাড়াও আমরা যদি মিস্টার লাহোরির এই বক্তব্য সঠিক বলে ধরে নিই যে, হযরত ইসা আলাইহিস সালাম উর্ধ্বলোকে উত্তোলিত হওয়ার আগ পর্যন্ত নাসারারা ত্রিত্ববাদের আকিদা পোষণ না করার কারণে তিনি তাদের আকিদা সম্পর্কে অজ্ঞতা প্রকাশ করবেন, তবে এই অবস্থায় আল্লাহ তাআলার নিম্নবর্ণিত প্রশ্নটির কী অর্থ হয়?—

أَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ

'তুমি কি লোকদেরকে বলেছো যে, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত আমাকে ও আমার জননীকে দুই ইলাহরূপে গ্রহণ করো?'

নাউযুবিল্লাহ, কথাটির উদ্দেশ্য কি এটা হয় না যে, আল্লাহ তাআলা হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর উম্মতের বিরুদ্ধে মিথ্যা দোষারোপ করছেন?

এর চেয়েও বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, মির্যা গোলাম কাদিয়ানি ও তার খলিফা মুহাম্মদ আলি লাহোরি একদিকে এসব কথা বলছে, আর অপরদিকে মির্যা কাদিয়ানি 'আয়নায়ে কামালাত' নামক পুস্তকে সম্পূর্ণ বিপরীত কথা বলেছে। সে বলেছে, 'যখন হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর আত্মা এটা জানতে পারলো এবং তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে তাঁর উম্মত কী করে শিরকে লিপ্ত হয়ে পড়লো, তখন ইসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ তাআলার কাছে এই প্রার্থনা করবেন, হে আল্লাহ, আপনি আমার সমরূপী নাযিল করুন, যাতে আমার উম্মত শিরক থেকে মুক্তি লাভ করে এবং একনিষ্ঠভাবে আপনারই ইবাদতকারী হয়ে যায়।' দেখুন, বক্তব্য দুটির মধ্যে পার্থক্য কতটুকু!

সত্য কথা এই যে, কাদিয়ানি ও লাহোরির তাফসিরের মানদণ্ড এই নয় যে, তারা কুরআনের আয়াতসমূহের মর্মার্থ কুরআনের ভাষাতেই শুনতে চায়। বরং তারা আগে থেকেই একটি বাতিল আকিদাকে আকিদা বলে প্রকাশ করে, তারপর তারই ছাঁচে কুরআনকে ঢেলে নিতে চায়। কিন্তু কুরআন যখন তার সমর্থন জানাতে অস্বীকৃতি জানায় তখন বিকৃতকরণের খড়্গ হাতে নিয়ে জোরপূর্বক কুরআনের ওপর জুলুম চালাতে চায়। কিন্তু তারা এ-কাজ করার সময় প্রকৃত সত্যকে বেমালুম ভুলে থাকে যে, কুরআন এই উম্মতের হেদায়েতের জন্য পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত ইমামুল

হুদা (হেদায়েতের ইমাম)। এ-কারণে কোনো ধর্মত্যাগী ও খোদাদ্রোহী কুরআনের অর্থকে বিকৃত করার জন্য যতই চেষ্টা করুক না কেনো, সে অবশ্যই ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। স্বয়ং কুরআনের ভাষাই তার আকিদা ও চিন্তাকে বাতিল করার জন্য মুখ খুলবে। 'মিথ্যাবাদীর স্মরণশক্তি নেই'— এই প্রবাদবাক্যটির প্রেক্ষিতে অধিকাংশ সময়েই সে নিজের পরস্পরবিরোধী বক্তব্যসমূহের বেড়াজালে ফেঁসে যাবে এবং নিজের মিথ্যা উক্তি ও মনগড়া তাফসিরের ওপর মোহর লাগিয়ে নেবে। যার জ্বলন্ত প্রমাণ এইমাত্র উপরে বর্ণিত হয়েছে।

আয়াত : فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ

হযরত ইসা মাসিহ আলাইহিস সালাম-এর উর্ধ্বলোকে উত্তোলিত হওয়া ও জীবিত থাকা-সম্পর্কিত পূর্ববর্তী আলোচনাসমূহে শব্দের অর্থ-বিশ্লেষণে যথেষ্ট আলোকপাত করা হয়েছে। আর সুরা মায়িদার উল্লিখিত আয়াতসমূহের তাফসিরের সবগুলো দিকই পরিষ্কার হয়ে গেছে। তবুও কুরআনের অলৌকিক অলঙ্কার ও বর্ণনাশৈলীর সূক্ষ্মতা সম্পর্কে ধারণা লাভ করার জন্য এই বিষয়েও কয়েক লাইন লিখে দেয়া সঙ্গত মনে হচ্ছে যে, কুরআন মাজিদ কেনো হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর পৃথিবীর বুকে অবস্থানকে مَا دُمْتُ فِيهِمْ এবং মানবজগৎ থেকে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়াকে تَوَفَّيْتَنِي শব্দে ব্যক্ত করেছে?

আগের পৃষ্ঠাগুলোতে আরবি ভাষা ও অলঙ্কারশাস্ত্রের বরাতে এটা তো প্রমাণিত হয়েছে যে, توفى শব্দের প্রকৃত অর্থ 'গ্রহণ করা' ও 'হস্তগত করা' এবং মৃত্যু অর্থেও শব্দটির ইঙ্গিতমূলক ব্যবহার হয় এবং ইঙ্গিতমূলক অর্থের মধ্যে প্রকৃত অর্থ সর্বদা সঙ্গেই সঙ্গেই থাকে। রূপকার্থে ব্যবহারের মতো এমনটা হয় না যে, প্রকৃত অর্থ থেকে ভিন্ন হয়ে এমন কোনো অর্থে ব্যবহৃত হয় যার জন্য শব্দটি তৈরি হয় নি। সুতরাং, হযরত ইসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে কুরআনের আকিদা যদি এমন হতো যে, তাঁর মৃত্যু ঘটে গেছে এবং সওয়াল-জওয়াবের এই বিষয়টি তাঁর মৃত্যুপূর্ব সময়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, কিয়ামতের দিনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়, তবে এখানে 'হায়াত' (জীবন) ও 'মাউত' (মৃত্যু)-এর মতো পরস্পরবিরোধী ও

বিপরীতার্থক শব্দের ব্যবহারই ছিলো ইলমে বালাগাত ও মাআনির (অলঙ্কারশাস্ত্রের) দাবি। যাতে স্পষ্ট হয়ে যেতো যে, সওয়াল-জওয়াবের ঘটনা মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তের। তারপর স্পষ্টভাবে 'মাউত' বা 'মৃত্যু' শব্দের উল্লেখ তার বিপরীতার্থক শব্দ 'হায়াত' বা 'জীবনে'র অন্বেষক হতো। কিন্তু কুরআন মাজিদ এই দুটি শব্দকে ব্যবহার না করে 'হায়াত' বা 'জীবনে'র স্থলে مَا دُمْتُ فِيهِمْ -কে এবং 'মাউত' বা 'মৃত্যু'র স্থলে تَوَفَّيْتَنِي-কে ব্যবহার করেছে। কুরআন এটা কেনো করেছে, কী উদ্দেশ্যে করেছে? কোনো হেকমত (প্রজ্ঞা) ও মুসলেহত (কল্যাণকামিতা) ছাড়াই কি কুরআন এটা করেছে? সংখ্যাগরিষ্ঠ উম্মতে মুহাম্মদি তো এসব প্রশ্নের একটি জবাবই রাখে এবং তা এই যে, পবিত্র কুরআন অন্যান্য স্থানের মতো এখানেও অলৌকিক বর্ণনাশৈলী অবলম্বন করেছে এবং এই দুটি শব্দের মধ্যে কুরআন হযরত ইসা মাসিহ আলাইহিস সালাম-এর জীবিত থাকা, জীবিত অবস্থায় আসমানে উত্তোলিত হওয়া, আসমান থেকে অবতরণ করা এবং স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করা—সবকিছুকে অন্তর্ভুক্ত করে দিতে চেয়েছে। যদি এখানে বলা হতো যে, ما حييت 'যতদিন আমি জীবিত ছিলাম' এবং فلما أمتني 'তারপর যখন আপনি আমাকে মৃত্যুদান করলেন', তখন তার উদ্দেশ্য হতো এই যে, হযরত ইসা আলাইহিস সালামও সাধারণ মানুষের অবস্থাবলির মতো জীবন ও মৃত্যুর দুটি স্তরই অতিক্রম করেছিলেন; জীবন ও মৃত্যু—এই দুটি অবস্থার মধ্যবর্তী সময়ে কোনো বিশেষ ঘটনা ঘটে নি। কিন্তু এটা প্রকৃত অবস্থার বিপরীত এবং তাঁর জীবন ও মৃত্যুর মধ্যবর্তী সময়ে দুটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর অতিবাহিত হয়ে থাকবে : ১. জীবিত অবস্থায় উর্ধ্বলোকে উত্তোলিত হওয়া এবং ২. পুনরায় আসমান থেকে পৃথিবীর বুকে অবতরণ করা। তাই একান্ত আবশ্যক হয়ে পড়লো 'হায়াত' বা 'জীবন' এবং 'মাউত' বা 'মৃত্যু'র স্থলে এমন দুটি শব্দ ব্যবহার করা যার দ্বারা উপরিউক্ত চারটি স্তরই বুঝা যেতে পারে। আর যেহেতু কয়েকটি জায়গায় অবস্থা অনুযায়ী এসব স্তরের বিশদ বিবরণ দেয়া হয়েছে, তাই বালাগাতের অলৌকিকতার দাবি অনুযায়ী এখানে সংক্ষিপ্তাকারে ওই বিষয়গুলো উল্লেখ করা হলো।

এটাই ছিলো প্রকৃত অবস্থার চিত্র যার ফলে কুরআন মাজিদ ما حيت-এর জায়গায় مَا دُمْتُ فِيهِمْ ব্যবহার করেছে, যাতে এই বাক্যটি সংক্ষিপ্ততার সঙ্গে হযরত ইসা মাসিহ আলাইহিস সালাম-এর জীবনের দুটি অংশকে অন্তর্ভুক্ত করে : জীবনের প্রথম থেকে শুরু করে উর্ধ্বলোকে উত্তোলিত হওয়ার অংশকেও এবং পুনরায় পৃথিবীতে অবতরণ করা থেকে শুরু করে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণের অংশকেও। একইভাবে কুরআন মাজিদ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي -এর বর্ণনাশৈলী অবলম্বন করেছে, যাতে এই বাক্যটিও প্রথম বাক্যটির (مَا دُمْتُ فِيهِمْ) মতো অবশিষ্ট দুটি স্তর বা অবস্থাকে নিজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নেয় : উর্ধ্বলোকে উত্তোলিত হওয়ার স্তর বা অবস্থাকেও এবং আসমান থেকে পুনরায় অবতরণের পর স্বাভাবিক মৃত্যুর স্তর বা অবস্থাকেও। কেননা, موت 'মাউত' দ্বারা তো কেবল একটি অর্থই প্রকাশ পেতে পারতো; কিন্তু توفى শব্দে একই সময়ে দুটি অর্থই বিদ্যমান : প্রকৃত অর্থের বিচারে কেবল 'গ্রহণ করা' বা 'হস্তগত করা' এবং ইঙ্গিতার্থের বিচারে 'গ্রহণ করা' বা 'হস্তগত করা'র সঙ্গে সঙ্গে 'মৃত্যু'র অর্থ। বিষয়টা ইতোপূর্বে আলোচিত ইঙ্গিতার্থ ও রূপকার্থের পার্থক্য দ্বারা জানা হয়েছে।

সারমর্ম এই যে, হযরত ইসা আলাইহিস সালাম নিবেদন করবেন, হে আল্লাহ, যে-সময়টুকু আমি তাদের মধ্যে অতিবাহিত করেছি, তার জন্য তো নিঃসন্দেহে আমি সাক্ষী রয়েছি; কিন্তু توفى-এর দীর্ঘ সময়ে আপনিই তাদের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। তা ছাড়া, আপনার সাক্ষ্য তো সকল অবস্থায় সকল সময়ে সবকিছুকে বেষ্টন করে আছে।

আলোচ্য বিষয়-সম্পর্কিত এই পুরো আলোচনা সংশ্লিষ্ট আয়াতগুলোর তাফসিরে নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কী বলেছেন সেদিকে দৃষ্টিপাত না করে অভিধান, অলঙ্কারশাস্ত্র ও বালাগাতের দৃষ্টিকোণ থেকে করা হয়েছে। অন্যথায় ওই আয়াতগুলোর তাফসিরে একজন মুমিন ব্যক্তির জন্য সহিহ মারফু হাদিসসমূহই যথেষ্ট, যেগুলোকে মুহাদ্দিসগণ বিশুদ্ধ সনদের সঙ্গে বর্ণনা করেছেন। যেমন, বিখ্যাত মুহাদ্দিস হাফেয ইবনে আসাকির রহ. আবু মুসা আশআরি রা.-এর

সনদে নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যে-হাদিসটি বর্ণনা করেছেন নিচে তার অনুবাদ দেয়া হলো—

"কিয়ামতের দিন সকল নবী ও রাসুল এবং তাঁদের উম্মতদের ডাকা হবে, হযরত ইসা আলাইহিস সালামকেও ডাকা হবে। আল্লাহ তাআলা প্রথমে তাঁর সামনে দুনিয়াতে তাঁকে যেসব অনুগ্রহ দান করা হয়েছিলো সেসব অনুগ্রহ গণনা করে স্মরণ করিয়ে দেবেন। হযরত ইসা আলাইহিস সালাম সেসব নেয়ামত ও অনুগ্রহকে স্বীকার করবেন। এরপর আল্লাহ তাআলা তাঁকে বলবেন, أَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ 'তুমি কি লোকদেরকে বলেছো যে, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত আমাকে ও আমার জননীকে দুই ইলাহরূপে গ্রহণ করো?' তখন হযরত ইসা আলাইহিস সালাম তা অস্বীকার করবেন। তারপর নাসারা জাতিকে ডাকা হবে এবং তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে। তারা মিথ্যা বর্ণনা দিয়ে বলবে, হ্যাঁ, ইসা আমাদেরকে এই শিক্ষাই দিয়েছিলেন। তাদের এ-কথা শুনে হযরত ইসা আলাইহিস সালাম ভীষণ ভীত হয়ে পড়বেন, তাঁর শরীরে কাঁপুনি শুরু হয়ে যাবে এবং আল্লাহ তাআলার ভয়ে ভীত হয়ে তাঁর দেহের প্রতিটি পশম আল্লাহর দরবারে সিজদায় পতিত হবে এবং এই সময়টাকে তাঁর কাছে হাজার বছরের সমান মনে হবে। অবশেষে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নাসারাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করা হবে এবং তাদের স্বকল্পিত ক্রুশ-পূজার রহস্য উন্মোচিত করে দেয়া হবে। তারপর তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার আদেশ প্রদান করা হবে।"[১৫৮]

বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইবনে আবি হাতেম রহ. হযরত আবু হুরায়রাহ রা. থেকে বিশুদ্ধ সনদের সঙ্গে একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন। তা এই—

"হযরত আবু হুরায়রাহ রা. বলেন, 'আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন যখন হযরত ইসা আলাইহিস সালামকে তাঁর উম্মত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন তখন ইসা আলাইহিস সালাম-এর অন্তরে নিজের পক্ষ থেকে জবাবও সৃষ্টি করে দেবেন।' এই জবাব সৃষ্টি করা প্রসঙ্গে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'আল্লাহ আল্লাহর পক্ষ থেকে হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর অন্তরে প্রেরণ করা হবে, ফলে

[১৫৮] তাফসিরে ইবনে কাসির, প্রথম খণ্ড, সুরা মায়িদা।

তিনি এই জবাব দেবেন— سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ
'তুমিই মহিমান্বিত! যা বলার অধিকার আমার নেই তা বলা আমার পক্ষে শোভন নয়।'''[১৫৯]

আর সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম শরিফে এবং সুনানসমূহে শাফাআত-সম্পর্কিত যে-হাদিসটি বর্ণিত ও বিখ্যাত আছে, তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, কিয়ামতের দিন যেভাবে সকল নবী ও রাসুলকে (আলাইহিমুস সালাম) নিজ নিজ উম্মত সম্পর্কে আল্লাহ তাআলার দরবারে জবাবদিহি করতে হবে এবং ব্যাপারটি ঘটার আগে তাঁরা ভীত ও উদ্বিগ্ন থাকবেন। হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-ও এ-সকল নবী-রাসুলের একজন হবেন। তাঁর অন্তরে এই শঙ্কা জেগে উঠবে যে, যখন তাঁকে তাঁর উম্মতের মুশরিকসুলভ বিদআত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে তখন আল্লাহ তাআলার দরবারে কী করে ওই জটিল জিজ্ঞাসা থেকে অব্যাহতি পাবেন। মোটকথা, সুরা মায়িদার আয়াতগুলোর যে-তাফসির সংখ্যাগরিষ্ঠ উম্মতে মুহাম্মদি থেকে বর্ণনা করা হয়েছে সেটাই সঠিক ও বিশুদ্ধ তাফসির। আর মির্যা কাদিয়ানি ও মিস্টার লাহোরির মনগড়া তাফসির খোদাদ্রোহিতা ও ধর্মদ্রোহিতার চেয়ে বেশি গুরুত্ব রাখে না।

হযরত ইসা মাসিহ আলাইহিস সালাম-এর সংশোধনমূলক দাওয়াত এবং বনি ইসরাইলের বহুধা বিভক্তি

পূর্বের আলোচনাগুলোতে আপনারা পাঠ করেছেন যে, আল্লাহ তাআলা ইসা আলাইহিস সালামকে ইঞ্জিল দান করেছিলেন। এই ইলহামি কিতাবটি মূলত তাওরাতেরই পরিপূরক ছিলো। অর্থাৎ, হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর শিক্ষার ভিত্তি তাওরাতের ওপরই প্রতিষ্ঠিত ছিলো; কিন্তু ইহুদিদের পথভ্রষ্টতা, ধর্মদ্রোহিতা ও আবাধ্যাচরণের কারণে যেসব সংশোধন জরুরি ছিলো, আল্লাহ তাআলা তা ইঞ্জিল আকারে হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর মারফতে তাদের সামনে পেশ করেছিলেন। হযরত ইসা মাসিহ আলাইহিস সালাম প্রেরিত হওয়ার পূর্বে ইহুদিদের আকিদা ও আমল সংক্রান্ত পথভ্রষ্টতার সীমাহীন পর্যায়ে

---

[১৫৯] তাফসিরে ইবনে কাসির, প্রথম খণ্ড, সুরা মায়িদা।

পৌঁছেছিলো এবং হযরত ইসা আলাইহিস সালাম প্রেরিত হয়ে সেসব ভ্রষ্টতার সংশোধনের জন্য পদক্ষেপ করেছিলেন, তারপরও কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বিষয় বিশেষভাবে সংশোধনযোগ্য ছিলো, যেগুলোর সংশোধনের জন্য হযরত ইসা মাসিহ আলাইহিস সালাম অত্যন্ত তৎপর ছিলেন।

১। ইহুদিদের একটি দল বলতো যে, মানুষের ভালো ও মন্দ কাজের ফল ও পরিণতি এই পৃথিবীতেই হয়ে যায়। আর কিয়ামত, আখেরাত, আখেরাতে শাস্তি ও পুরস্কার, হারশ-নাশর—এই বিষয়গুলো সবই ভ্রান্ত।

২। দ্বিতীয় দল এসব বিষয়কে সত্য বলে বিশ্বাস করলেও এই আকিদা পোষণ করতো যে, আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভের জন্য পার্থিব উপভোগ্য বস্তুসমূহ ও দুনিয়ার মানুষ থেকে দূরে থেকে সংসার-বিরাগের জীবন অবলম্বন করা একান্ত আবশ্যক। ফলে তারা বসতি থেকে দূরে খানকা ও কুঁড়েঘরসমূহে থাকতে পছন্দ করতো। কিন্তু এই দলটি হযরত ইসা মাসিহ আলাইহিস সালাম প্রেরিত হওয়ার কিছুকাল পূর্বে তাদের এই অবস্থানকে হারিয়ে ফেলেছিলো। তখন তাদেরকে সংসার-ত্যাগের অন্তরালে থেকে সংসারের যাবতীয় গর্হিত কাজে লিপ্ত হতে দেখা যাচ্ছিলো। তাদের বাহ্যিক আচার-আচরণ সংসারত্যাগীদের মতোই মনে হতো; কিন্তু আড়ালে-আবডালে তাদেরকে এমনসব কার্যকলাপ করতে দেখা যেতো, যেগুলো দেখে মদ্যপ ইতর লোকেরাও লজ্জায় চোখ বন্ধ করে ফেলতো। ইহুদিদের এই সম্প্রদায়কে ফ্রেসি বলা হতো।

৩। তৃতীয় দলটি ধর্মীয় আচার-সংস্কার ও পবিত্র উপসনাগৃহের (হাইকালের) সেবার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলো। কিন্তু তাদের অবস্থা দাঁড়িয়েছিলো এমন যে, যেসকল আচার ও সেবা আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে করা দরকার ছিলো এবং যেসব আমলের সুফলের ভিত্তি একনিষ্ঠতার ওপর স্থাপিত ছিলো, সেগুলোকে তারা ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে পরিণত করেছিলো এবং ভেট ও মান্নত না নিয়ে তারা কোনো আচার পালন ও উপসনাগৃহের (হাইকালের) সেবার জন্য পা উঠাতো না। এমনকি এসব পবিত্র আচার ও সেবার জন্য তারা তাওরাতের বিধান পর্যন্ত বিকৃত করে ফেলেছিলো। এদের নাম ছিলো কাহিন।

৪। চতুর্থ দলটির মধ্যে উল্লিখিত বিষয়গুলোর সমাবেশ ঘটেছিলো এবং তারা ধর্মের ইজারাদার। এই দলটি সাধারণ লোকদের মধ্যে ধীরে ধীরে

এই বিশ্বাস সৃষ্টি করে দিয়েছিলো যে, মতাদর্শ ও ধর্মের মূলনীতি ও আকিদাসমূহ কিছুই নয়; কিন্তু তারা যাদেরকে স্বীকৃতি দেবে তারা হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল করার ব্যাপারে স্বাধীন হয়ে যাবে। তারা ধর্মীয় বিধানসমূহে কম-বেশি পরিবর্তন করতে পারবে; যার জন্য ইচ্ছা বেহেশতের সনদ লিখে দেবে এবং যার জন্য ইচ্ছা দোযখের পরোয়ানা জারি করবে। আল্লাহ তাআলার দরবারে তারা যে-মীমাংসা দিয়েছে তা দৃঢ় ও অটল। মোটকথা, তারা বনি ইসরাইলের أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ। 'আল্লাহ ব্যতীত বিভিন্ন খোদা' সেজে বসেছিলো। আর তাওরাতের শব্দগত ও অর্থগত বিকৃতকরণে এরা এতটা দুঃসাহসী ছিলো যে, পার্থিব স্বার্থ অর্জনের জন্য তারা তাওরাতকে একটি পুঁজি বানিয়ে নিয়েছিলো এবং সাধারণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সন্তোষ অর্জনের জন্য নির্ধারিত মূল্যে বিনিময়ে ধর্মীয় বিধানকে পরিবর্তন করা তাদের ধর্মীয় কর্তব্যে পরিণত হয়েছিলো। এরা ছিলো 'আহবার' বা 'ফকিহ'।

এরাই ছিলো ওইসব দল এই এগুলোই ছিলো তাদের আকিদা-বিশ্বাস ও কার্যকলাপ, যাদের মধ্যে হযরত ইসা আলাইহিস সালাম প্রেরিত হয়েছিলেন। এদেরই বিশ্বাস ও কার্যকলাপের সংশোধনের জন্য তাঁকে প্রেরণ করা হয়েছিলো। তিনি প্রথমে প্রতিটি দলের বাতিল আকিদা ও কর্মকাণ্ড পরীক্ষা করে দেখলেন। দয়া ও মমতার সঙ্গে তাদের দোষ-ত্রুটিসমূহের সমালোচনা করলেন। তাদের অবস্থা সংশোধনের জন্য উৎসাহ দিলেন। তাদের বিশ্বাস ও চিন্তা এবং তাদের কার্যকলাপের অপিবত্রতাসমূহ দূর করে তাদের সম্পর্ক বিশ্বজগতের স্রষ্টা এক-অদ্বিতীয় সত্তার সঙ্গে পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা ব্যয় করে যেতে লাগলেন। কিন্তু ওই হতভাগারা তাদের অপকর্মগুলোর সংশোধন করতে একেবারে অস্বীকৃতি জানিয়ে দিলো। শুধু তা-ই নয়, তারা তাঁকে পথভ্রষ্টকারী মাসিহ বলে আখ্যায়িত করলো এবং তাঁর সত্যের দাওয়াত ও হেদায়েতের শত্রুতা করে ও তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে তাঁর প্রাণনাশের চেষ্টায় লেগে গেলো।

ইঞ্জিল চতুষ্টয়

হযরত ইসা মাসিহ আলাইহিস সালাম-এর ওপর যে-ইঞ্জিল নাযিল হয়েছিলো, বর্তমানে খ্রিস্টানদের কাছে প্রাপ্ত চারটি ইঞ্জিল কি ঠিক তা-ই? না-কি এগুলো হযরত মাসিহ আলাইহিস সালাম-এর পরে খ্রিস্টানদের রচিত? এ-ব্যাপারে নাসারা উলামাসহ সকল উলামায়ে কেরামের ঐকমত্য রয়েছে যে, এই চারটি ইঞ্জিলের মধ্যে কোনো-একটি ইঞ্জিলও হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর ইঞ্জিল নয় এবং তার অনুবাদও নয়। কিন্তু বর্তমানে বিদ্যমান চারটি ইঞ্জিল সম্পর্কে খ্রিস্টানরা কী বলে এবং সমালোচকদের অভিমত কী—এ-বিষয়টি বিশদ আলোচনার দাবি রাখে। এটা সর্বজনস্বীকৃত বিষয় যে, বিদ্যমান চার ইঞ্জিলের ব্যাপারে নাসারাদের কাছে এমন কোনো সনদ বা প্রমাণ নেই যার ভিত্তিতে তারা বলতে পারে যে, সেগুলোর বর্ণনার ধারা বা সেগুলোর সংকলন ও বিন্যাসের ধারা হযরত ইসা মাসিহ আলাইহিস সালাম বা তাঁর শিষ্যমণ্ডলী (হাওয়ারিগণ) পর্যন্ত পৌঁছেছে। বিষয়টির পক্ষে তাদের কাছে ধর্মীয় সনদও নেই, ঐতিহাসিক দলিল-প্রমাণও নেই। বরং তার বিপরীতে স্বয়ং খ্রিস্টধর্মের ইতিহাস এ-ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করছে যে, খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দী থেকে নিয়ে খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম অংশ পর্যন্ত খ্রিস্টানদের মধ্যে একুশটিরও বেশি ইঞ্জিলকে ইলহামি বা আসমানি ইঞ্জিল বলে বিশ্বাস করা হতো এবং সেগুলো প্রচলিত ও অনুসৃত ছিলো। কিন্তু ৩২৫ খ্রিস্টাব্দে নাইসিয়ার প্রথম কাউন্সিল (First Council of Nicaea)[১৬৩] একুশটি থেকে মাত্র চারটি ইঞ্জিলকে মনোনীত করে অবশিষ্ট সবগুলো পরিত্যাজ্য ঘোষণা করে। অত্যন্ত বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, কাউন্সিলের এই নির্বাচন কোনো ঐতিহাসিক বা জ্ঞানগত ভিত্তিতে হয় নি; বরং এক ধরনের ফাল বা সূক্ষ্ম অনুমান ও লক্ষণ দাঁড় করানো হয়েছিলো এবং এই অনুমানকে ঐশ্বরিক ইঙ্গিত বলে ধরে নেয়া হয়েছিলো। এই একুশটিরও বেশি ইঞ্জিলের মধ্যে কয়েকটিকে ইউরোপের প্রাচীন গ্রন্থাগারগুলোতে পাওয়া গেছে। যেমন, উনবিংশ শতাব্দীতে ভ্যাটিকান সিটির বিখ্যাত গ্রন্থাগারে কাউন্সিল অব নাইসিয়া কর্তৃক পরিত্যাজ্য ইঞ্জিলগুলোর একটি কপি পাওয়া গেছে, এতে বিদ্যমান ইঞ্জিল চারটির চেয়ে অনেককিছু অতিরিক্ত পাওয়া গেছে। বিদ্যমান ইঞ্জিলগুলোর মধ্যে সেন্ট লুকের

---

[১৬৩] ৩২৫ খ্রিস্টাব্দের ২০ মে থেকে ১৯ জুন এই কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়েছিলো।

ইঞ্জিলে বিশেষভাবে হযরত মাসিহ আলাইহিস সালাম-এর জন্মবৃত্তান্ত বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে কুরআন মাজিদ সুরা মারইয়ামে এই ঘটনাকে যেভাবে মারইয়াম আলাইহিস সালাম-এর জন্মলাভ ও পবিত্র উপাসনাগৃহে (হাইকালে) লালিত-পালিত হওয়ার আলোচনা থেকে শুরু করেছে, সেন্ট লুকের ইঞ্জিলেও তার উল্লেখ নেই, অবশিষ্ট ইঞ্জিল তিনটিতেও তার উল্লেখ নেই। কিন্তু ভ্যাটিকানের গ্রন্থাগারে প্রাপ্ত কপিতে এই ঘটনাকে ঠিক সুরা মারইয়ামে উল্লেখিত ঘটনার অনুরূপ বর্ণনা করা হয়েছে।[১৬১]

একইভাবে ষোড়শ শতাব্দীতে রোমের বিখ্যাত পোপ পঞ্চম সিক্সটাস (Pope Sixtus V.) প্রাচীন গ্রন্থাগারে আরো একটি পরিত্যাজ্য ইঞ্জিলের কপি পাওয়া গেছে। এটির নাম বারনাবাসের ইঞ্জিল (The Gospel of Barnabas)। পোপ পঞ্চম সিক্সটাসের ঘনিষ্ঠ লাট রোমান ক্যাথলিক ধর্মগুরু ফ্রা ম্যারিনো (Fra Marino) এই কপিটি পাঠ করে পোপের অনুমতি ছাড়াই গ্রন্থাগার থেকে নিয়ে যান।[১৬২] এতে খাতিমুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে অনেক স্পষ্ট ও পরিষ্কার সুসংবাদ ছিলো। এমনকি 'আহমদ' নামটির উল্লেখ পর্যন্ত ছিলো। তা ছাড়া এতে হযরত মাসিহ আলাইহিস সালাম-এর খোদা হওয়ার বিরোধী আকিদার শিক্ষা পাওয়া যাচ্ছিলো। এ-কারণে ওই লাট পাদরি মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন। ইদানীং কালে মিসরের আল্লামা সাইয়িদ রশিদ রেযা (রহিমাহুল্লাহ) The Gospel of Barnabas-এর আরবি অনুবাদ করেছেন এবং আল-মানার প্রেস থেকে প্রকাশ করেছেন। এই গ্রন্থটি প্রণিধানযোগ্য। ড. সাআদাহ গ্রন্থটির ভূমিকায় জ্ঞানগর্ভ বিশ্লেষণ প্রদান করেছেন। তাতে তিনি উল্লেখ করেছেন, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নবুওতপ্রাপ্তির পূর্বে খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষের দিকে খ্রিস্টানদের (রোমান ক্যাথলিক) পোপ প্রথম সেন্ট গেল্যাসিয়াস (Pope Saint Gelasius I)[১৬৩]-এর পক্ষ থেকে

---

[১৬১] তরজুমানুল কুরআন, দ্বিতীয় খণ্ড।

[১৬২] ফ্রা ম্যারিনো ১৫৯০ সালে The Gospel of Barnabas আবিষ্কার করেন এবং এটি পাঠ করে তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।

[১৬৩] পোপ প্রথম সেন্ট গেল্যাসিয়াস ১৯ নভেম্বর, ৪৯৬ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ১ মার্চ, ৪৯২ খ্রিস্টাব্দ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত খ্রিস্টানদের পোপ ছিলেন।

গির্জাসমূহের নামে যে-ঐতিহাসিক নির্দেশনামা প্রেরণ করা হয়েছিলো তা থেকে এই ইঞ্জিলটির সন্ধান মেলে। এই নির্দেশনামায় ওইসব কিতাবের (ইঞ্জিলের) উল্লেখও ছিলো যেগুলোর পঠন ও পাঠন খ্রিস্টানদের জন্য নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছিলো। এতে বারনাবাসের ইঞ্জিলের নামও অন্তর্ভুক্ত ছিলো।

তা ছাড়া ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞগণ আজ স্বীকার করছেন যে, হযরত ইসা মাসিহ আলাইহিস সালাম-এর পরে প্রথম তিন শতাব্দীতে একশোটিরও বেশি ইঞ্জিল পাওয়া যেতো। তার মধ্যে শুধু চারটি রেখে বাকি সবকটিকে পরিত্যাজ্য ঘোষণা করা হয়েছিলো এবং গির্জার সিদ্ধান্ত অনুসারে এগুলোর পাঠ নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছিলো। তাই ধীরে ধীরে এগুলোর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে পড়েছিলো। কথিত আছে যে, এই পরিত্যাজ্য কপিগুলোর মধ্যে ইগিনটিশ-এর ইঞ্জিলও ছিলো, যা আজ বিলুপ্ত।

তা ছাড়া এ-বিষয়টিও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য সেন্ট পলের যে-পত্ররাশির ওপর বর্তমান খ্রিস্টধর্মের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত, সেগুলো পাঠ করলে জায়গায় জায়গায় এই সন্ধান মেলে যে, সেগুলো মানুষকে সতর্ক করছে ও ভীতি প্রদর্শন করছে যে, তারা যেনো হযরত ইসা মাসিহ আলাইহিস সালাম ছাড়া অন্য লোকদের প্রতি সম্পর্কিত যে-ইঞ্জিলগুলো সেগুলোর প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে। কেননা, আমাকে রুহুল কুদ্স এরই জন্য নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমি যেনো মাসিহ-এর ইঞ্জিলের হেফাযত করি, সেটিকেই আদর্শ বানিয়ে নিই এবং তারই শিক্ষাকে সমগ্র খ্রিস্টানজগতে ছড়িয়ে দিই। নিম্নলিখিত বাক্যগুলো দ্বারা স্পষ্ট হচ্ছে যে, তাঁর মতে মাসিহ-এর ইঞ্জিল খ্রিস্টানদের কাছে পরিত্যাক্ত হয়ে পড়েছিলো এবং পরবর্তীকালের সূত্রহীন ইঞ্জিলগুলো ব্যাপক সমাদর লাভ করেছিলো। সেগুলোর মধ্যে ওই চারটি ইঞ্জিলও ছিলো যেগুলোকে নাইসিয়ার প্রথম কাউন্সিল অনুমান ও লক্ষণের দ্বারা বিশুদ্ধ বলে মেনে নিয়েছিলো।

এখন বিদ্যমান ইঞ্জিল চারটির অবস্থাও শুনুন। মনে করা হয় এদের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন ম্যাথুর ইঞ্জিল (Gospel of Matthew)। তা সত্ত্বেও নাসারাদের মধ্যে প্রাচীন ধর্মবেত্তাগণ ঐকমত্যের সঙ্গে এবং বর্তমান যুগের সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মবেত্তা এই মত পোষণ করেন যে, বর্তমানে বিদ্যমান ম্যাথুর ইঞ্জিল আসল নয়, বরং এটি আসল ম্যাথুর ইঞ্জিলের অনুবাদ। কারণ আসল ম্যাথুর ইঞ্জিল হিব্রু ভাষায় লিখিত ছিলো, যা

বিলুপ্ত ও বিনষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু এটি কি মূল ম্যাথুর ইঞ্জিলের অনুবাদ না তাতে বিকৃত-সাধন হয়েছে—এ-ব্যাপারে কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। এমনকি তাতে অনুবাদকের নাম পর্যন্ত জানা যায় নি এবং কোন্ যুগে সেটি অনূদিত হয়েছে তারও সন্ধান মেলে নি।

প্রসিদ্ধ খ্রিস্টান ধর্মবেত্তা জরজেস যাবিন আল-ফাতুহি লেবাননি তাঁর কিতাবে বর্ণনা করেছেন যে, ম্যাথু তাঁর ইঞ্জিলটি ৩৯ খ্রিস্টাব্দে বাইতুল মুকাদ্দাসে বসে হিব্রু ভাষায় রচনা করেছিলেন। আর ধর্মগুরু ইরুনিমুস বলেছেন, উসপিউস তাঁর ইতিহাসগ্রন্থে লিখেছেন যে, ম্যাথুর ইঞ্জিলের গ্রিক অনুবাদ আসল নয়। বানিতুস যখন ভারতবর্ষে গিয়ে খ্রিস্টধর্ম প্রচার করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছিলেন তখন তিনি হিব্রু ভাষায় লিখিত ম্যাথুর ইঞ্জিলকে কায়সার গ্রন্থাগারে সুরক্ষিত দেখেছিলেন। কিন্তু এই কপিটি বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিলো এবং বলা যায় না ম্যাথুর ইঞ্জিলের গ্রিক ভাষার বর্তমান অনুবাদকে কোন্ যুগে কোন্ ব্যক্তি পরিচিত করে তুললো।[১৬৪]

দ্বিতীয় ইঞ্জিলটি মার্কের (Gospel of Mark)। এ-সম্পর্কে বিখ্যাত খ্রিস্টান ধর্মবেত্তা পিটার্স ফরমাজ আল-ইয়াসুয়ি (بطرس فرماج اليسوعی) তাঁর গ্রন্থ مروج الأخيار في تراجم الأبرار-এ মার্কের জীবনকথা লিখতে গিয়ে বলেছেন, ইনি বংশগত দিক থেকে ইহুদি লাওয়ি ছিলেন এবং হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর সঙ্গী (হাওয়ারি) পিটার্সের শিষ্য ছিলেন। রোমানরা খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করার পর তাদের অনুরোধে সাড়া দিয়ে তিনি এই ইঞ্জিল রচনা করেন। মার্ক হযরত ইসা আলাইহিস সালামকে খোদা বলে বিশ্বাস করতেন না এবং তিনি তার ইঞ্জিলে ওই অংশটাও গ্রহণ করেন নি যাতে ইসা আলাইহিস সালাম পিটার্সের প্রশংসা করেছেন। মার্ক ৬৮ খ্রিস্টাব্দে আলেকজান্দ্রিয়ার কারাগারে নিহত হন। মূর্তিপূজকেরা তাঁকে হত্যা করে।[১৬৫] আর খ্রিস্টানজগতে এ-ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে যে, মার্কের ইঞ্জিল কবে রচিত হয়েছিলো। যেমন, আল-ফারিক প্রণেতা আবদুর রহমান আল-বাজাহ مرشد الطالبين إلى الكتاب

---

[১৬৪] الفارق بين المخلوق و الخالق, আবদুর রহমান আল-বাজাহ জি যাদাহ রহ., প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২০, বৈরুতে মুদ্রিত জরজেস যাবিন আল-ফাতুহি লেবাননির গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত।

[১৬৫] কাসাসুল আম্বিয়া, আবদুন ওয়াহ্হাব নাজ্জার মিসরি।

القدس الثمين-এর ১৭০ বরাত দিয়ে উদ্ধৃত করেছেন যে, খ্রিস্টান ধর্মবেত্তাদের ধারণা এই যে, পিটার্সের তত্ত্বাবধানে ১৬০ খ্রিস্টাব্দে এই ইঞ্জিল রচিত হয়।[১৬৬]

তৃতীয় ইঞ্জিল হলো সেন্ট লুকের ইঞ্জিল (Gospel of Luke)। খ্রিস্টান ধর্মবেত্তাদের মধ্যে ম্যাথুর ইঞ্জিল সম্পর্কে যে-পরিমাণ মতভেদ রয়েছে তার চেয়েও বেশি মতভেদ রয়েছে সেন্ট লুকের ইঞ্জিলের বিশুদ্ধতা ও অশুদ্ধতা সম্পর্কে। আল-ফারিক প্রণেতা সেন্ট লুকের ইঞ্জিল সম্পর্কে খ্রিস্টান ধর্মবেত্তাদেরই বক্তব্যসমূহ উদ্ধৃত করেছেন এবং প্রমাণ করেছেন যে, এটি ইলহামি বা আসমানি কিতাব নয়। খ্রিস্টান ধর্মবেত্তাগণ বলেন, মিস্টার গডল তাঁর ঐশ্বরিক পুস্তিকায় দাবি করেছেন যে, সেন্ট লুকের ইঞ্জিলটি ইলহামি বা ঐশী নয়। তার কারণ এই যে, স্বয়ং লুক তাঁর ইঞ্জিলের শুরুতে লিখেছেন যে, তিনি সাওফিলুসের সঙ্গে চিঠিপত্র আদান-প্রদানের ভিত্তিতে এই ইঞ্জিল লিখেছেন। সাওফিলুস মার্ককে সম্বোধন করে লিখেছেন, 'মাসিহ আলাইহিস সালাম-এর বাণীসমূহ যাঁরা নিজ চোখে দেখেছেন, তাঁরা আমাদের কাছে তাঁর বাণীগুলো যেভাবে পৌঁছিয়েছেন, সেগুলোকে অনেক মানুষ আমাদের কাছ থেকে বর্ণনা করছেন। এজন্য আমি জরুরি মনে করি যে, আমি নিজেই সেগুলোকে সঠিক পন্থায় একত্র করে দেবো। যেনো তোমরা প্রকৃত সত্য অবগত হতে পারো।' এই কথা পরিষ্কারভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, মার্ক হযরত মাসিহ আলাইহিস সালাম-এর যুগ পান নি। আর খ্রিস্টান ধর্মবেত্তাগণ এটাও বর্ণনা করেছেন যে, মার্কের ইঞ্জিল লুকের ইঞ্জিলের পর অস্তিত্ব লাভ করেছে এবং পিটার্স ও সেন্ট পলের মৃত্যুর পর রচনা করা হয়েছে।[১৬৭]

আসল কথা এই যে, লুক আন্তাকিয়া শহরে চিকিৎসা করতেন। তিনি ইসা মাসিহ আলাইহিস সালামকে দেখেন নি। সেন্ট পল থেকে তিনি খ্রিস্টধর্মের শিক্ষা লাভ করেছেন। সেন্ট পল সম্পর্কে এ-বিষয়টি যথার্থভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি প্রকৃতপক্ষে গোঁড়া ইহুদি ছিলেন এবং খ্রিস্টধর্মের ভীষণ শত্রু ছিলেন। তিনি নাসারাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে

---

[১৬৬] الفارق بين المخلوق و الخالق, আবদুর রহমান আল-বাজাহ জি যাদাহ রহ., প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩১৬।

[১৬৭] কাসাসুল আম্বিয়া, আবদুল ওয়াহ্হাব নাজ্জার মিসরি, পৃষ্ঠা ৪৭৭-৪৭৯।

তাঁর শত্রুতামূলক প্রচেষ্টা ব্যয় করছিলেন। কিন্তু তিনি দেখলেন যে, তাঁর সবধরনের বিরোধিতা ও প্রতিরোধ সত্ত্বেও খ্রিস্টধর্ম উত্তরোত্তর উৎকর্ষ লাভ করছে এবং তাঁর প্রতিরোধে প্রতিরুদ্ধ হচ্ছে না। তখন তিনি ইহুদিসুলভ প্রতারণা ও চক্রান্তের আশ্রয় নিলেন। তিনি ঘোষণা করলেন, 'একটি অলৌকিক কাণ্ড ঘটে গেছে। আমি সুস্থ অবস্থায় ছিলাম। অকস্মাৎ এমনভাবে মাটিতে পড়ে গেলাম যেভাবে মল্লযুদ্ধে কেউ কাউকে ভূমিতে আছড়ে ফেলে। এই অবস্থায় হযরত মাসিহ আলাইহিস সালাম আমাকে স্পর্শ করলেন এবং আমাকে কঠোরভাবে ধমক দিয়ে বললেন, ভবিষ্যতে তুমি কখনো আমার অনুসারীদের বিরুদ্ধে কোনো ধরনের তৎপরতায় লিপ্ত হবে না। আমি তৎক্ষণাৎ হযরত মাসিহ আলাইহিস সালাম-এর প্রতি ঈমান আনলাম। ফলে আমি খ্রিস্টানজগতের সেবার জন্য তাঁর নির্দেশপ্রাপ্ত হলাম। তিনি আমাকে নির্দেশ দিলেন যে, আমি যেনো মানুষকে ইঞ্জিলের সুসংবাদ শুনিয়ে দিই এবং সেটিকে অনুসরণের জন্য তাদেরকে উদ্দীপ্ত করি।' সেন্ট পল এরপর ধীরে ধীরে গির্জার ওপর আধিপত্য বিস্তার করলেন এবং খ্রিস্টধর্মের মৌলিক সত্যগুলোর বিলুপ্তি ঘটিয়ে দিয়ে নতুন নতুন জিনিসের আমদানি করলেন এবং খ্রিস্টধর্মকে মন্দ কার্যকলাপের সমষ্টি বানিয়ে ছাড়লেন। হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর খোদা হওয়া, ত্রিত্ববাদ, ইসা আলাইহিস সালাম-এর আল্লাহর পুত্র হওয়া এবং কাফ্‌ফারার (প্রায়শ্চিত্তের) বিদআত (অভিনব বিষয়) আবিষ্কার করে খ্রিস্টধর্মকে শির্‌কমূলক ধর্মে রূপান্তরিত করে দিলেন। তাদের জন্য মদ, মৃত জন্তু, শূকর—সবকিছু বৈধ করে দিলেন। এটাই ওই খ্রিস্টধর্ম, সেন্ট পলের প্রচেষ্টায় আজ যা গোটা বিশ্বের কাছে পরিচিত।

এরপরও কি কেউ বলতে পারে যে, সেন্ট পলের শিষ্য লুকের ইঞ্জিল ইলহামি বা ঐশী ইঞ্জিল। আর জেরোমে (Jerome) বলেন, নাসারা সম্প্রদায়ের কতিপয় প্রাচীন ধর্মবেত্তার মত এই যে, লুকের ইঞ্জিলের প্রথম দুটি অধ্যায় ইলহামি নয়, তিনি নিজে তা সংযুক্ত করেছেন। কারণ মারসিউন উপদলের হাতে থাকা কপিটিতে এই দুটি অধ্যায় নেই। আর বিখ্যাত খ্রিস্টান ধর্মবেত্তা আকহারুন (!کهارن) লিখেছেন, লুকের ইঞ্জিলের দ্বাবিংশ অধ্যায়ের ৪৩-৪৭ সংখ্যক আয়াত তাঁর নিজের পক্ষ

থেকে সংযুক্ত।' তিনি আরো বলেন, 'মুজিযা বা অলৌকিক কাণ্ড সম্পর্কে যে-বর্ণনা দেয়া হয়েছে তাতে মিথ্যা ভাষণ ও কবিসুলভ অতিরঞ্জনের ব্যাপার ঘটেছে। এটা খুব সম্ভব লেখকের পক্ষ থেকে সংযুক্তি। কিন্তু এখন মিথ্যা থেকে সত্যকে বেছে নেয়া চরম কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।' আর কলিমিশাস লিখেছেন, 'ম্যাথু ও মার্কের ইঞ্জিল দুটিতে অনেক জায়গায় পরস্পরবিরোধী ও দ্বন্দ্বমূলক ঘটনাবলি রয়েছে; কিন্তু যে-ব্যাপারগুলো ইঞ্জিল দুটি ঐকমত্যে পৌঁছেছে সে-বিষয়গুলো লুকের ইঞ্জিলের বর্ণনার প্রেক্ষিতে প্রাধান্য লাভ করেছে।'[১৬৮] আর এটা স্পষ্ট বিষয় যে, লুকের ইঞ্জিলে বিশটিরও বেশি জায়গায় ম্যাথুর ইঞ্জিলের চেয়ে অতিরিক্ত বর্ণনা রয়েছে। আর মার্কের ইঞ্জিলের চেয়ে তা আরো অনেক বেশি।[১৬৯] এ-সকল প্রমাণ থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, লুকের ইঞ্জিল কোনোভাবেই ইলহামি বা ঐশী নয় এবং তা ইসা আলাইহিস সালাম-এর কোনো শিষ্যের রচনা নয়।

চতুর্থ ইঞ্জিল হলো ইউহান্নার ইঞ্জিল (Gospel of Jhon)। এই ইঞ্জিলের ব্যাপারে নাসারাদের বিশ্বাস এই যে, এটি হযরত ইসা মাসিহ আলাইহিস সালাম-এর প্রিয় শিষ্য ইউহান্না যাবাদি রচনা করেছেন। ইউহান্নার পিতার নাম ছিলো যাবাদি সাইয়াদ। জালিলের অন্তর্গত বাইতে সাইদা নাম স্থানে ইউহান্নার জন্ম হয় এবং তিনি হযরত ইসা মাসিহ আলাইহিস সালাম-এর হাওয়ারি বা শিষ্য হওয়ার মর্যাদা লাভ করেন। নাসারাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ বারোজন হাওয়ারির মধ্যে ইউহান্নাই সবচেয়ে বেশি পবিত্রতা ও মর্যাদা লাভ করেছিলেন। জরজেস যাবিন আল-ফাতুহি লেবাননি লিখেছেন, 'যে-যুগে শিরনিতুস ও বাইনুস এবং তাদের দল নিজেদের আকিদা প্রচার করছিলেন যে, ইসা আলাইহিস সালাম-এর খোদা হওয়ার আকিদা ভ্রান্ত; তিনি মানুষ ছিলেন এবং হযরত মারইয়াম আলাইহিস সালাম-এর গর্ভে জন্মলাভ করেছিলেন, হযরত মারইয়াম আলাইহিস সালাম-এর পূর্বে তাঁর অস্তিত্ব ছিলো না, সে-যুগে ৯৬ খ্রিস্টাব্দে পাদরি ও লাট পাদরিদের পরামর্শসভা বসলো এবং তাঁরা ইউহান্না কাছে উপস্থিত হয়ে এই আবদেন জানালো, 'আপনি ইসা আলাইহিস সালাম-এর বাণীসমূহ

---

[১৬৮] কাসাসুল আম্বিয়া, আবদুল ওয়াহ্হাব নাজ্জার মিসরি, পৃষ্ঠা ৪৭৭।
[১৬৯] প্রাগুক্ত।

লিপিবদ্ধ করুন। যেসব বিষয় অন্যান্য ইঞ্জিলে পাওয়া গেছে, সেগুলো ছাড়া আপনার যা জানা আছে আপনি তা-ই লিপিবদ্ধ করুন। বিশেষ করে হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর খোদা হওয়ার বিষয়টি অবশ্যই লিখুন, যাতে শিরনিতুস ও অন্যদের দলের বিরুদ্ধে আমাদের হাত শক্তিশালী হয়।' তখন ইউহান্না তাদের আবেদন উপেক্ষা করতে পারলেন না এবং এই ইঞ্জিল লিপিবদ্ধ করলেন।[১৭০] কিন্তু তা সত্ত্বেও খ্রিস্টান ধর্মবেত্তাগণকে ইউহান্নার ইঞ্জিলের রচনাকাল নিয়ে মতভেদ করতে দেখা যাচ্ছে। কেউ বলেন, এটি ৬৫ খ্রিস্টাব্দে লিপিবদ্ধ হয়েছে, কেউ বলে এটি লিপিবদ্ধ হয়েছে ৯৬ খ্রিস্টাব্দে, আবার কেউ এটি ৯৮ খ্রিস্টাব্দে লিপিবদ্ধ হয়েছে বলে বর্ণনা করেছেন।

তবে তাঁদের তুলনায় এমন খ্রিস্টান ধর্মবেত্তার সংখ্যা কম নয় যাঁরা দাবি করছেন যে, ইউহান্নার ইঞ্জিল কখনোই হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর হাওয়ারি বা শিষ্য ইউহান্না কর্তৃক রচিত নয়। দ্য ক্যাথলিক হ্যালাল্ড (The Catholic Herald)[১৭১]-এর সপ্তম ভল্যুমে প্রফেসর লন থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, 'ইউহান্নার ইঞ্জিল প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আলেকজান্দ্রিয়ার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের একজন ছাত্র কর্তৃক রচিত।' বারটস নিদার লিখেছেন, 'ইউহান্নার ইঞ্জিল ও ইউহান্নার পত্রসমূহের কোনো একটিও হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর হাওয়ারি বা শিষ্যের রচনা নয়। বরং দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম দিকে কোনো এক ব্যক্তি এই ইঞ্জিল রচনা করে ইউহান্নার নামে চালিয়ে দেয়, যাতে জনমণ্ডলীর মধ্যে তা গ্রহণযোগ্যতা ও প্রসিদ্ধি পায়।' আল-ফারিক প্রণেতা বলেন, 'বিখ্যাত খ্রিস্টান ধর্মবেত্তা ক্রটিস বর্ণনা করেছেন যে, এই ইঞ্জিলে প্রথমে ছিলো বিশটি অধ্যায়, পরে ইউহান্না ইন্তেকাল করার পর আফাসের গির্জা তাতে একুশতম অধ্যায় সংযুক্ত করে দেয়।'[১৭২] এসব উদ্ধৃতি থেকে এ-বিষয়টি খুব ভালোভাবে স্পষ্ট হচ্ছে যে, ইউহান্নার ইঞ্জিল নামে পরিচিত ইঞ্জিলটি (হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর) হওয়ারি ইউহান্নার ইঞ্জিল নয়; বরং

---

[১৭০] কাসাসুল আম্বিয়া, আবদুল ওয়াহ্হাব নাজ্জার মিসরি, পৃষ্ঠা ৪৭৭।

[১৭১] একটি রোমান ক্যাথলিক ম্যাগাজিন।

[১৭২] الفارق بين المخلوق و الخالق, আবদুর রহমান আল-বাজাহ জি যাদাহ রহ., প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৪১-৩৪২।

কেউ তা রচনা করে ইউহান্নার নামে চালিয়ে দিয়েছে, যাতে ইসা আলাইহিস সালাম-এর খোদা হওয়ার যে-বিশ্বাস গির্জাপতিরা পোষণ করে সেই বিশ্বাসের শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং এই বিশ্বাস সংশোধনের জন্য খ্রিস্টানজগৎ থেকে সময়ে সময়ে যে-আওয়াজ উঠতো তা স্তব্ধ হয়ে যায়।

ইঞ্জিল চতুষ্টয় সম্পর্কে উল্লিখিত সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা ছাড়াও সেগুলো ইলহামি বা ঐশী না হওয়ার আরো দুটি স্পষ্ট দলিল রয়েছে। তার একটি এই যে, চারটি ইঞ্জিলেই হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর জীবনের ঘটনাবলির বিবরণ রয়েছে। এমনকি নাসারাদের অনুমান অনুযায়ী হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর গ্রেপ্তার হওয়া, শূলিবিদ্ধ হওয়া, নিহত হওয়া, মৃত্যুর পর জীবিত হওয়া এবং বিষয়টি তাঁর শিষ্যদের কাছে প্রকাশ পাওয়া ইত্যাদি অবস্থার বর্ণনা পর্যন্ত রয়েছে। সুতরাং এসব ইঞ্জিল হযরত ইসা মাসিহ আলাইহিস সালাম-এর ইঞ্জিল হতো বা তার অংশ হতো, তবে সেগুলোতে এসব বিষয়ের উল্লেখ থাকার মোটেই কথা ছিলো না। আর এসব ঘটনা হযরত মাসিহ আলাইহিস সালাম-এর শিষ্যবৃন্দ সংকলন করতেন এবং তা একটি ঐতিহাসিক গ্রন্থের মর্যাদা পেতো; কিতাবুল্লাহ বা আসমানি কিতাব বলে অভিহিত হওয়ার যোগ্য হতো না।

দ্বিতীয় দলিল এই যে, যেভাবে ইঞ্জিলগুলোর রচয়িতাদের নিয়ে মতভেদ রয়েছে, তেমনি ইঞ্জিল চারটিতে বর্ণিত ঘটনা ও কাহিনিতে পরস্পরবিরোধিতা ও কঠিন মতদ্বন্দ্ব রয়েছে। অর্থাৎ, কিছু কিছু মুজিযা ও অভিনব ঘটনা কোনো ইঞ্জিলে পাওয়া গেলেও অন্য ইঞ্জিলগুলোতে তার ইঙ্গিত পর্যন্ত পাওয়া যায় না। আবার, কোনো ইঞ্জিলে একটি ঘটনা যেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, অন্য ইঞ্জিলে তা কিছুটা কম-বেশি করে এমনভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, প্রথম ইঞ্জিলের বর্ণনায় আর এটির বর্ণনায় স্পষ্ট ব্যবধান ও তারতম্য দেখা দিয়েছে। যেমন, হযরত ইসা মাসিহ আলাইহিস সালাম-এর শূলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনাটিকে ইঞ্জিল চতুষ্টয়ে বিরোধপূর্ণ বক্তব্যের সঙ্গে বর্ণনা করা হয়েছে।

এটাও কম বিস্ময়কর ব্যাপার নয় যে, এই ইঞ্জিল চারটি যে যে ভাষায় রূপান্তরিত হয়েছে, সে সে ভাষায় ইঞ্জিলগুলোর মূলপাঠ এবং শব্দ ও বাক্যের সংরক্ষণ ও স্থায়িত্বে ভ্রূক্ষেপই করা হয় নি। বরং একই ভাষায় অনূদিত ইঞ্জিলগুলোর বিভিন্ন সংস্করণ ও প্রকাশনায় অনেক অনেক শব্দ ও বাক্যে পরিবর্তন ও হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটেছে। বিশেষ করে যেখানে খ্রিস্টান

ধর্মবেত্তা ও মুসলমান আলেমগণের মধ্যে (ইঞ্জিল চতুষ্টয়ে উল্লেখিত) সুসংবাদের প্রেক্ষিতে এই আলোচনা এসেছে যে, সেসব সুসংবাদের উদ্দেশ্য কি খাতিমুল আম্বিয়া মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম না ইসা মাসিহ আলাইহিস সালাম না অন্যকোনো নবী, সেখানে পরিবর্তন ও হ্রাস-বৃদ্ধি বেশি পরিমাণে ঘটেছে। তা ছাড়া যেসব জায়গায় হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর খোদা হওয়ার স্পষ্ট বর্ণনার মধ্যে ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়, সেই জায়গাগুলোকে মশকের স্লেট বানিয়ে নেয়া হয়েছে। ইঞ্জিল চতুষ্টয়ের শব্দগত ও অর্থগত বিকৃতি এবং বর্ণনার পরস্পরবিরোধিতার বিস্তারিত বিবরণ ও বিশদ আলোচনা খোলা দৃষ্টিতে পাঠ করতে চাইলে তার জন্য বিশেষভাবে রয়েছে মাওলানা রহমতুল্লাহ বিন খলিলুর রহমান কিরানবি রহ. কর্তৃক রচিত 'ইযহারুল হক' (إظهار الحق), আল্লামা ইবনে কায়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ রহ. কর্তৃক রচিত 'হিদায়াতুল হায়ারি ফি আজবিবাতিল ইয়াহুদি ওয়ান নাসারা' (هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى), আবদুর রহমান আল-বাজাহ জি যাদাহ রহ. কর্তৃক রচিত 'আল-ফারিকু বাইনাল খালিকি ওয়াল মাখলুকি' (الفارق بين المخلوق و الخالق) এবং মাওলানা আলে নবী আমরুবি রহ. কর্তৃক রচিত 'ইযাহারে হক' (اظہار حق)।

মোটকথা, ইঞ্জিল চতুষ্টয় ইলহামি বা আসমানি ইঞ্জিল নয়। এগুলো ইলহামি হওয়ার ব্যাপারে কোনো বর্ণনাগত প্রমাণও নেই এবং ঐতিহাসিক প্রমাণও নেই। সেগুলোর রচয়িতা সম্পর্কেও অকাট্যভাবে বা নিশ্চিতরূপে কোনোকিছু জানা যায় না এবং তাদের রচনাকালও নির্দিষ্ট নয়। বরং তার বিপরীতে সেন্ট পলের বক্তব্যরাশি, ইঞ্জিলগুলোর ঐতিহাসিক অবস্থা, বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্যাবলির পারস্পরিক বিরোধিতা ও বৈপরীত্য এ-বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করছে যে, এই ইঞ্জিলগুলো হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর ইঞ্জিল বা তার অংশ নয় এবং ইসা আলাইহিস সালাম-এর ইঞ্জিল সর্বপ্রথম নাসারাদেরই হাতে শব্দগত ও অর্থগত পরিবর্তন ও বিকৃতির শিকারে পরিণত হয় এবং তারপর ধীরে ধীরে তা বিলুপ্তি ঘটেছে। বিদ্যমান ইঞ্জিল চারটির কোনোটিই আসল ইঞ্জিল নয়; বরং গ্রিক ভাষায় অনূদিত এবং গ্রিক থেকে অন্যান্য ভাষায় অনূদিত, যা

বরাবরই পরিবর্তন ও বিকৃতি এবং হ্রাস-বৃদ্ধির শিকার হয়ে আসছে। শুধু এটাই নয় যে, এই চারটি ইঞ্জিল হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর ইঞ্জিল নয়; বরং জ্ঞানগত, ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় দলিল দ্বারা সেগুলো হযরত মাসিহ আলাইহিস সালাম-এর শিষ্যবৃন্দের রচনা বলেও প্রমাণিত নয়; বরং সেগুলো পরবর্তীকালের অন্য রচয়িতাদের রচনা। অবশ্য এসব অনুবাদে উপদেশ ও নসিহত এবং শিক্ষা ও প্রজ্ঞার ক্ষেত্রে এমন একটি অংশ রয়েছে যা অবশ্যই হযরত ইসা মাসিহ আলাইহিস সালাম-এর মূল্যবান বাণীসমূহ থেকে গৃহীত। তাই নকলের মধ্যে কোনো কোনো সময় আসলের ঝলক দেখা যায়।

কুরআন এবং ইঞ্জিল

পবিত্র কুরআনের মৌলিক শিক্ষা এই যে, আল্লাহ তাআলা যেমন এক-অদ্বিতীয়, তেমনি তাঁর সত্যতাও এক-অদ্বিতীয়। তিনি কখনো কোনো বিশেষ জাতি, বিশেষ গোষ্ঠী বা বিশেষ গোত্রের উত্তরাধিকারমূলক স্বত্বরূপে থাকেন নি। প্রতিটি জাতিতে ও প্রতিটি দেশে আল্লাহর সত্য ও হেদায়েতের পয়গাম একই অনুভূতি ও ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে তাঁর সত্য নবীগণের বা তাঁদের প্রতিনিধিদের সাহায্যে জগতের জন্য সবসময় সরলপথের আহ্বানকারী ও ঘোষণাকারী থেকেছে। সেই পয়গামের নামই 'সিরাতে মুস্তাকিম' ও 'ইসলাম'। কুরআন মাজিদ এই ভুলে-যাওয়া শিক্ষাকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য এসেছে এবং কুরআন সর্বশেষ পয়গাম, যা বিগত যাবতীয় ধর্মের সত্যতাকে নিজের মধ্যে ধারণ করে মানবজগতের হেদায়েত ও পথপ্রদর্শনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। সুতরাং, কুরআনকে অস্বীকার করা মানে আল্লাহর যাবতীয় সত্যকে অস্বীকার করা। এই মৌলিক শিক্ষার প্রেক্ষিতেই পবিত্র কুরআন হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর মাহাত্ম্যকে অনুমোদন করেছে এবং স্বীকার করেছে যে, নিঃসন্দেহে ইলহামি কিতাব ও আল্লাহ-প্রদত্ত কিতাব। কিন্তু তার সঙ্গে জায়গায় জায়গায় এটাও বলে দিয়েছে যে, আহলে কিতাবের (ইহুদি ও নাসারাদের) আলেমগণ ইঞ্জিলের সত্য শিক্ষাকে বিলুপ্ত করে দিয়েছে, পরিবর্তিত করে ফেলেছে এবং সবদিক থেকে বিকৃত করে ফেলেছে এবং এইভাবে ইঞ্জিলের শিক্ষাকে শিরক ও কুফরির শিক্ষা

বানিয়ে ছেড়েছে। কুরআন আবার কোনো কোনো জায়গায় আহলে কিতাবকে তাওরাত ও ইঞ্জিলের শিক্ষার বিপরীতে কার্যকলাপ করার জন্য দোষী সাব্যস্ত করে বিদ্যমান তাওরাত ও ইঞ্জিলের বরাত দিচ্ছে। এ থেকে বুঝা যায়, পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময় তাওরাত ও ইঞ্জিলের মূলকপি—যদিও বিকৃত অবস্থায় থাকুক না কেনো—বিদ্যমান ছিলো। তখনই এই কিতাব দুটি শাব্দিক ও অর্থগত উভয় প্রকারের বিকৃতিকরণের শিকার হয়ে এতটা বিকৃত হয়ে পড়েছিলো যে, কিতাব দুটি মুসা আলাইহিস সালাম-এর তাওরাত ও ইসা আলাইহিস সালাম-এর ইঞ্জিল হিসেবে অভিহিত হওয়ার উপযুক্ত ছিলো না।

পবিত্র কুরআন তাওরাত ও ইঞ্জিলের মাহাত্ম্য এবং আহলে কিতাবদের হাতে তাদের পরিবর্তন ও বিকৃতি-সাধন—উভয়টিকেই স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছে। তাওরাত ও ইঞ্জিল-সম্পর্কিত কুরআনের আয়াতগুলো নিচে পেশ করা হলো—

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ () مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ

"(হে মুহাম্মদ,) তিনি সত্যসহ তোমার প্রতি কিতাব (কুরআন) অবতীর্ণ করেছেন, যা তার পূর্বের কিতাবের (তাওরাত ও ইঞ্জিলের) সমর্থক। আর তিনি অবতীর্ণ করেছেন তাওরাত ও ইঞ্জিল ইতোপূর্বে মানজাতির জন্য হেদায়েতস্বরূপ; আর তিনি ফুরকান (সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী) অবতীর্ণ করেছেন।" [সুরা আলে ইমরান : আয়াত ৩-৪]

وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ (سورة آل عمران)

"তিনি তাঁকে শিক্ষা দেন কিতাব, হেকমত, তাওরাত ও ইঞ্জিল।" [সুরা আলে ইমরান : আয়াত ৪৮]

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (سورة آل عمران)

"হে কিতাবিগণ, ইবরাহিম সম্পর্কে তোমরা কেনো তর্ক করো, অথচ তাওরাত ও ইঞ্জিল তো তার পরেই নাযিল হয়েছিলো। কেনো তোমরা বোঝো না?" [সুরা আলে ইমরান : আয়াত ৬৫]

وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ () وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (سورة المائدة)

"মারইয়াম-তনয় ইসাকে তার পূর্বে অবতীর্ণ তাওরাতের সমর্থকরূপে তাদের পেছনে প্রেরণ করেছিলাম এবং তার পূর্বে অবতীর্ণ তাওরাতের সমর্থকরূপে ও মুত্তাকিদের জন্য পথনির্দেশ ও উপদেশরূপে তাঁকে (ইসা আলাইহিস সালামকে) ইঞ্জিল দিয়েছিলাম; তাতে ছিলো পথের নির্দেশ ও আলো। ইঞ্জিলের অনুসারীরা যেনো তাতে আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে বিধান দেয়। আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না, তারাই ফাসিক।" [সুরা মায়িদা : আয়াত ৪৬-৪৭]

وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ (سورة المائدة)

"তারা যদি তাওরাত, ইঞ্জিল ও তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা প্রতিষ্ঠিত করতো (যদি বিকৃতি-সাধনের দ্বারা সেগুলোকে পরিবর্তিত না করতো), তা হলে তারা তাদের পদতল ও উপর থেকে (সচ্ছল ও নিশ্চিন্তভাবে) আহার লাভ করতো। তাদের মধ্যে একদল রয়েছে যারা মধ্যপন্থী; কিন্তু তাদের অধিকাংশ যা করে তা নিকৃষ্ট।" [সুরা মায়িদা : আয়াত ৬৬]

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ

"(হে মুহাম্মদ,) বলো, হে কিতাবিগণ, তাওরাত, ইঞ্জিল ও যা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি নাযিল হয়েছে তোমরা তা প্রতিষ্ঠিত না করা পর্যন্ত তোমাদের কোনো ভিত্তিই নেই।" [সূরা মায়িদা : আয়াত ৬৮]

وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ

"(হে ইসা,) তোমাকে কিতাব, হিকমত[১৭৩], তাওরাত ও ইঞ্জিল শিক্ষা দিয়েছিলাম।" [সূরা মায়িদা : আয়াত ১১০]

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ

"যারা অনুসরণ করে বার্তাবাহক উম্মী নবীর, যার উল্লেখ তাওরাত ও ইঞ্জিল—যা তাদের কাছে আছে তাতে লিপিবদ্ধ পায়।" [সূরা আ'রাফ : আয়াত ১৫৭]

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (سورة التوبة)

"নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের কাছ থেকে তাদের জীবন ও সম্পদ ক্রয় করে নিয়েছেন, তাদের জন্য জান্নাত আছে এর বিনিময়ে। তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, নিধন করে ও নিহত হয়। তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনে এই সম্পর্কে তাদের দৃঢ় প্রতিশ্রুতি রয়েছে। নিজ প্রতিজ্ঞা পালনে আল্লাহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কে আছে? তোমরা যে-সওদা করেছো সেই সওদার জন্য আনন্দিত হও এবং ওটাই তো মহাসাফল্য।" [সূরা তাওবা : আয়াত ১১১]

---

[১৭৩] যাবতীয় বিষয়বস্তুকে সঠিক জ্ঞান দ্বারা জানাকে হিকমত বলে।

মোটকথা, এসব প্রশংসা ও ফজিলত সেই তাওরাত ও সেই ইঞ্জিলের যেগুলো হযরত মুসা আলাইহিস সালাম-এর তাওরাত এবং হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর ইঞ্জিলরূপে অভিহিত হওয়ার যোগ্য এবং যেগুলো প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর কিতাব ছিলো। কিন্তু ইহুদি ও নাসারা জাতি এই আসমানি কিতাবগুলোর সঙ্গে কী আচরণ করেছে, তার অবস্থাও কুরআনের ভাষাতেই শুনুন—

أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (سورة البقرة)

"তোমরা (মুসলিমগণ) কি এই আশা করো যে, তারা তোমাদের কথায় ঈমান আনবে—যখন তাদের একদল আল্লাহর বাণী শ্রবণ করে, এরপর তারা তা বিকৃত করে, অথচ তারা জানে।" [সুরা বাকারা : আয়াত ৭৫]

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ (سورة البقرة)

"সুতরাং দুর্ভোগ তাদের জন্য যারা নিজ হাতে কিতাব রচনা করে এবং তুচ্ছ মূল্য প্রাপ্তির জন্য বলে, 'এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে।' তাদের হাত যা রচনা করেছে তার জন্য শাস্তি তাদের এবং যা তারা উপার্জন করেছে তার জন্য শাস্তি তাদের।" [সুরা বাকারা : আয়াত ৭৯]

يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ

"(ইহুদিদের মধ্যে কতিপয় লোক) কথাগুলোকে স্থানচ্যুত করে বিকৃত করে।" [সুরা নিসা : আয়াত ৪৬]

এগুলো ছাড়াও, তুচ্ছ মূল্যে আল্লাহ তাআলার আয়াতসমূহকে বিক্রি করা প্রসঙ্গে সুরা বাকারা, সুরা আলে ইমরান, সুরা নিসা ও সুরা তাওবার মধ্যে অনেক আয়াত বিদ্যমান। আয়াতগুলোর সারমর্ম এই যে, ইহুদি ও নাসারারা দুইভাবেই তাওরাত ও ইঞ্জিল বিক্রি করতো : শব্দ পরিবর্তন করে এবং অর্থকে বিকৃত করে। যেনো সোনা ও রুপার জন্য লালায়িত হয়ে সাধারণ ও বিশিষ্ট লোকদের মর্জিমতো আল্লাহর কিতাবের আয়াতসমূহের শাব্দিক ও অর্থগত বিকৃতি-সাধন করা সেগুলোকে বিক্রি

করারই নামান্তর। এই চেয়ে দুর্ভাগ্যের কাজ দ্বিতীয়টি নেই। এই কাজ সবসময়ই লানত ও অভিশাপের কারণ।

ইঞ্জিল এবং ইসা আলাইহিস সালাম-এর হাওয়ারিগণ

মুফাস্সিরগণ সাধারণত বলে থাকেন যে, حواري শব্দটি থেকে حور নির্গত হয়েছে। এর অর্থ কাপড়ের শুভ্রতা। কাপড় ধোয়ার পর যখন তা সাদা ও শুভ্র হয়ে যায় তখন আরবি ভাষাভাষীরা বলেন, حار الثوب(কাপড় শুভ্র হয়েছে)। আর ধোপাকে বলা হয় حواري (হাওয়ারি) এবং حواري-এর বহুবচন حواريون। এই অর্থের প্রেক্ষিতে হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর অনুসারী ও শিষ্যদের হাওয়ারি বলা হতো এ-কারণে যে, তাঁদের অধিকাংশই ধোপা বা জেলে সম্প্রদায়ের ছিলেন। অথবা এ-কারণে যে, ধোপা যেভাবে ময়লা কাপড় পরিষ্কার করে, তেমনি হাওয়ারিগণও হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর শিক্ষা দ্বারা মানুষের অন্তরসমূহ আলোকিত করে তুলতেন। হাওয়ারি শব্দের অর্থ সহায়তাকারী, সাহায্যকারী ও উপদেশদাতাও হয়। আবদুল ওয়াহ্হাব নাজ্জার বলেন, নাসারগণ হযরত ইসা মাসিহ আলাইহিস সালাম-এর হাওয়ারিগণকে তাঁর শিষ্য বলে থাকে। এটা অমূলক নয়। কারণ তার একটা ভিত্তি আছে। তা এই যে, মূলের বিবেচনায় حبور একটি হিব্রু শব্দ। শব্দটির অর্থ শিষ্য বা শাগরেদ। আর حبور-এর বহুবচন حبوريم। এই حبوريم-ই আরবি ভাষায় এসে حواري ও حوارين-এর রূপ পরিগ্রহ করেছে।

হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর হাওয়ারিগণ সম্পর্কে ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু কুরআন মাজিদ কেবল حواريون বলেই সংক্ষিপ্তভাবে তাঁদের উল্লেখ করেছে। তাঁদের কারো নাম উল্লেখ করে নি। ইঞ্জিল অবশ্য তাদের নামও উল্লেখ করেছে এবং সংখ্যা। যেমন, ম্যাথুর ইঞ্জিলে প্রথম অধ্যায়ে বারোজন শিষ্যের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। আর বিদ্যমান ইঞ্জিল চতুষ্টয় থেকে খারিজকৃত বারনাবাসের ইঞ্জিলের চতুর্দশ অধ্যায়েও এই সংখ্যাই উল্লেখ করা হয়েছে। অবশ্য কয়েকটি

নামের ব্যাপারে মতানৈক্য দেখা যায়। নিম্নবর্ণিত নকশা থেকে তা বুঝা যাবে :

ম্যাথুর ইঞ্জিল		বারনাবাসের ইঞ্জিল	
সংখ্যা	নাম	সংখ্যা	নাম
১.	সিমন পিটার (সামআন) বিন ইউনা, আন্দ্রউসের ভাই	১.	পিটার আস-সাইয়্যাদ (সামআন)
২.	আন্দ্রউস (আন্দ্রে) বিন ইউনা, সিমনের ভাই	২.	আন্দ্রউস (আন্দ্রে)
৩.	ইয়াকুব বিন যাবাদি	৩.	বারনাবাস
৪.	ইউহান্না বিন যাবাদি (ইয়াকুবের ভাই)	৪.	ইয়াকুব বিন যাবাদি
৫.	ফিলিপ্স	৫.	ইউহান্না বিন যাবাদি
৬.	বারসু লামাউস	৬.	ফিলিপ্স
৭.	তুমা	৭.	বারসু লামাউস
৮.	ম্যাথু আল-ইশার	৮.	তাদাউস
৯.	ইয়াকুব বিন হালাফি	৯.	ইয়াকুব বিন হালাফি
১০.	লিবাদুস (উপাধি : তাদাউস)	১০.	ইয়াহুদা
১১.	সামআন আল-কানুবি	১১.	ম্যাথু আল-ইশার
১২.	ইয়াহুদা আসখার ইউতি	১১.	ইয়াহুদা আসখার ইউতি

[কাসাসুল আম্বিয়া, আবদুল ওয়াহ্হাব নাজ্জার মিসরি, পৃষ্ঠা ৪৮২।]

ইঞ্জিল দুটিতে মাত্র দুটি নামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ম্যাথুর ইঞ্জিলে তুমা ও সামআন আল-কানুবি রয়েছে আর বারনাবাসের ইঞ্জিলে তাদের বদলে ভিন্ন দুইজনের নাম রয়েছে : স্বয়ং বারনাবাস ও তাদাউস। কোন্ ইঞ্জিলের কথা সঠিক তা নির্ণয় করা কঠিন। কিন্তু প্রমাণের আলোকে খুব সহজে বলা যায় যে, গির্জার কাউন্সিল প্রমাণ ও সনদ ব্যতিরেকেই বারনাবাস ও তাঁর সঙ্গী তাদাউসের নাম মঞ্জুর করে দিয়েছে শুধু এ-বিষয়ের প্রেক্ষিতে যে, তাঁদের বর্ণনাসমূহের ভিত্তি হযরত ইসা আলাইহিস

সালাম-এর খোদা হওয়ার ও কাফ্ফারার আকিদার বিরুদ্ধে সত্যিকার খ্রিস্টধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলো। তা ছাড়া তাঁদের বর্ণনাসমূহ গির্জাপতিরা সেন্ট পলের প্রবর্তিত ও বিকৃত খ্রিস্টধর্মের যে-বিশ্বাস লালন করতো এবং এখনো করছে তার বিরোধী ছিলো। কিন্তু বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, বারনাবাসের নাম বর্তমান খ্রিস্টধর্মে হওয়ারিদের তালিকা থেকে খারিজ মনে করা হয়েও তাঁর নাম ওই দূতগণের তালিকায় আজো বিদ্যমান আছে, যাঁরা রাজ্যগুলোতে আল্লাহ তাআলার রাজত্ব ঘোষণা করেছিলেন এবং খ্রিস্টধর্মের প্রচার-প্রসারের দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

হযরত ইসা আলাইহিস সালাম এবং বর্তমান খ্রিস্টধর্ম

হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর শিক্ষার সারমর্ম ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। তিনি আল্লাহ তাআলার সত্য নবী, সত্য ও সততার প্রতি আহ্বানকারী, সুস্পষ্ট সত্যধর্মের পথপ্রদর্শক ও প্রচারক ছিলেন। আল্লাহর সকল সত্য নবীর মতো তাঁর শিক্ষাও সৃষ্টির শুরু থেকে প্রচারিত সত্য ও সততার সমর্থক ছিলো, যুগের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক প্রয়োজনীয়তার বৈপ্লবিক পরিবর্তনশীলতার অবস্থা-অনুরূপ ছিলো এবং ইঞ্জিলের আকারে সংশোধন ও বিপ্লবের আহ্বানকারী ছিলো। খাঁটি একত্ববাদ, সৃষ্টিকর্তার পরিচয়লাভে সৃষ্টিকর্তার সঙ্গেই উপায়হীন নৈকট্য, ভালোবাসা, স্নেহ, মমতা, দয়া, ক্ষমা, নৈতিক ও চারিত্রিক উন্নতি তাঁর পবিত্র শিক্ষার সারমর্ম ছিলো। কিন্তু মানবজাতির মনোবিপ্লবের ইতিহাসে এর চেয়ে বিস্ময়কর ও আশ্চর্যজনক ব্যাপার আর কিছুই নেই যে, বর্তমান খ্রিস্টধর্ম হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর পবিত্র শিক্ষার নামে একত্ববাদের জায়গায় ত্রিত্ববাদ, আল্লাহর পরিচয় লাভের জন্য পুত্রত্বের আকিদা, মুক্তির জন্য ইলম ও আমলের একনিষ্ঠতার স্থলে প্রায়শ্চিত্তে বিশ্বাস ইত্যাদি মূর্খতাপ্রসূত ও মুশরিকসুলভ অভিনব আকিদাসমূহের প্রচার ও প্রসারে তৎপর রয়েছে।

ত্রিত্ববাদ

পিটার্স বুস্তানি কর্তৃক রচিত বিশ্বকোষ দায়িরাতুল মাআরিফ-এ এ-ব্যাপারে খ্রিস্টীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। তার

সারমর্ম এই যে, খ্রিস্টধর্ম সর্বপ্রথম ত্রিত্ববাদের নাম শুনেছে সেন্টদের যুগে; এর আগে এই আকিদাটির সঙ্গে খ্রিস্টধর্মের কোনোভাবেই পরিচয় ছিলো না। সেন্ট পল থেকে সেন্টদের যুগ শুরু হয়। সেন্ট পলই ওই মহাপুরুষ যাঁর কল্যাণে খ্রিস্টধর্ম নবজন্ম লাভ করে এবং যাঁর ইহুদিত্ব গোঁড়ামির ফলে খ্রিস্টধর্মের সত্যতা ও তাওহিদের আকিদাকে মূর্তিপূজা ও শিরকের সঙ্গে মিশ্রিত করে সফলতার শ্বাস ফেলেছে। এই আকিদা মূলত মূর্তিপূজামূলক দর্শনের তত্ত্বের ওপর দাঁড়িয়ে আছে এবং এটি মূর্তিপূজামূলক আকিদা 'অবতারে'রই প্রতিধ্বনি। ত্রিত্ববাদের ভিত্তি এই তত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত যে, আল্লাহ তাআলার সত্তা ও গুণাবলি মানবাকৃতি ধারণ পৃথিবীর বুকে উপস্থিত হতে পারে। যেনো এই আকিদা হিলানিসন ও গনুসতিনিন-এর দার্শনিক বিশ্বাসরাশির সংযোজনে প্রস্তুত একটি মোদক। প্রাচীনকালের ইতিহাস থেকে সন্ধান মেলে যে, খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে আন্তাকিয়ার বিশপ থিউফিলুস সর্বপ্রথম ত্রিত্ববাদের ধারণা প্রকাশ করতে গিয়ে গ্রিক 'সারইয়াস' শব্দটি ব্যবহার করেন। তারপর তারতিল্য়ানুস নামের অন্য একজন বিশপ সমউচ্চারিত 'তিরনিতিয়াস' শব্দটি আবিষ্কার করেন। এই গ্রিক শব্দটিই বর্তমান খ্রিস্টধর্মের আকিদা সালুস (তাসলিস)-এর সমার্থবোধক। যদি এই বিষয়টির স্বরূপটাকে আরো গভীর দৃষ্টিতে দেখার চেষ্টা করা হয়, তবে ঐতিহাসিক তথ্যাবলির মাধ্যমে স্পষ্টরূপে দেখা যাবে যে, সালুস বা ত্রিত্ববাদের আকিদা মূলত খ্রিস্টধর্ম ও মূর্তিপূজার সংমিশ্রণের ফল, যা খ্রিস্টধর্মের প্রাবল্য ও মূর্তিপূজার দুর্বলতার কারণে ঘটেছে। বিশেষ করে মিসরের মূর্তিপূজকরা খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করার পর ত্রিত্ববাদের আকিদার বিকাশ ও উন্নতি সাধন করেছিলো এবং দার্শনিক তত্ত্বালোচনার সঙ্গে একে জ্ঞানগর্ভ আলোচনায় পরিণত করেছিলো। খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করার পর মূর্তিপূজকদের ওপর তার যে-প্রভাব পড়েছিলো তার একটি গুরুত্বপূর্ণ ফল ছিলো এই যে, অতীতের মূর্তিপূজাকে বর্তমানের খ্রিস্টধর্মের সঙ্গে সমন্বিত করে দেয়ার একটা সার্বক্ষণিত আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা মূর্তিপূজকদের মধ্যে তৈরি হয়েছিলো, যাতে পুরনো ও নতুন উভয় ধর্মের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক অটুট থাকে। মাওলানা আবুল কালাম আযাদ বলেন, আলেকজান্দ্রিয়ার দর্শন-

প্রভাবিত সেরাপিস[১৭৪]-চিন্তা থেকে ত্রিসত্তাবিশিষ্ট একত্ববাদের মূল গ্রহণ করা হয়েছে। আর আইসিসের[১৭৫] স্থানটি দেয়া হয়েছে হযরত মারইয়াম আলাইহিস সালামকে আর হোরাসের[১৭৬] স্থানটি দেয়া হয় হযরত ইসা আলাইহিস সালামকে। এই গ্রিক-মিসরীয় দর্শনঘটিত মূর্তিপূজার প্রভাবে বর্তমান খ্রিস্টধর্মে হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর খোদা হওয়া ও তির খোদার আকিদা গির্জা কর্তৃক গৃহীত আকিদায় পরিণত হয়েছে।

ত্রিত্ববাদের আকিদা যখন তার শৈশব যাপন করছিলো তখন খ্রিস্টান ধর্মবেত্তাদের মধ্যে তা প্রত্যাখ্যান করা ও গ্রহণ করা নিয়ে ভীষণ তর্কযুদ্ধ শুরু হয়েছিলো। নিকাদের কাউন্সিলে, পূর্বাঞ্চলীয় গির্জাসমূহে এবং সাধারণ ও বিশেষ বৈঠকসমূহে এ-ব্যাপারে তর্ক-বিতর্ক দীর্ঘ থেকে ধীর্ঘতর হতে শুরু করলো তখন গির্জা সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলো যে, ত্রিত্ববাদের ব্যাপারটি সত্য এবং তার বিরোধিতা করা ধর্মদ্রোহিতা। ত্রিত্ববাদের বিরোধী ধর্মদ্রোহী দলগুলোর মধ্যে বিখ্যাত হলো 'আবুনিয়্যূন'-এর দল। এই দল বলে, হযরত ইসা আলাইহিস সালাম কেবল মানুষই ছিলেন। দ্বিতীয় দল 'সাবিলিয়্যূন'। তারা বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ তাআলা অদ্বিতীয় সত্তা। আর পিতা, পুত্র ও রুহুদ কুদ্স (পবিত্র আত্মা) সেই সত্তারই বিভিন্ন অবস্থা। এই অবস্থাগুলো আল্লাহ তাআলার অদ্বিতীয় সত্তার ওপর প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। তৃতীয় দল

---

[১৭৪] গ্রিক-মিসরি দেবতাকে বলা হয় Serapis বা Sarapis। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে সেরাপিস-প্রথার উদ্ভব ঘটে। সেরাপিস দেবতার মূর্তি ফ্রান্সের ল্যুভর জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে।

[১৭৫] আইসিস (Isis) প্রাচীন মিসরীয় ধর্মবিশ্বাসে মাতৃত্ব, যাদু ও উর্বরতার দেবী। মূলত মিসরীয় ধর্মবিশ্বাসের দেবী হলেও আইসিসের উপাসনা প্রাচীন মিসরের বাইরে গ্রিক-রোমান বিশ্বেও ছড়িয়ে পড়েছিলো। আদর্শ মা, স্ত্রী, প্রকৃতি ও যাদুর পৃষ্ঠপোষক হিসেবে আইসিসের উপাসনা করা হতো। মিসরীয় পুরাণ অনুসারে আইসিস হোরাসের মা। আইসিসকে চিত্রিত করা হয় সিংহাসনাকৃতির মুকুট পরিহিতা নারী হিসেবে, কখনো তার পাখির মতো ডানাও দেখানো হয়।

[১৭৬] হোরাস প্রাচীন মিসরীয় ধর্মের অন্যতম প্রাচীন ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দেবতা। তিনি আকাশ, প্রতিশোধ, প্রতিরক্ষা ও যুদ্ধের দেবতা ছিলেন। হোরাস বিভিন্ন সময়ে প্রাচীন মিসরীয়দের জাতীয় পৃষ্ঠপোষক দেবতা হিসেবে গণ্য হতেন। সাধারণত তাঁকে একটি বাজপাখির মস্তকবিশিষ্ট পুরুষ মূর্তিরূপে কল্পনা করা হতো। তাঁর লাল ও সাদা রঙের মুকুটটি সমগ্র মিসর রাজ্যের ওপর তাঁর আধিপত্যের প্রতীক ছিলো।

'আরইউসিয়্যন'। তাদের বিশ্বাস এই যে, হযরত ইসা মাসিহ আলাইহিস সালাম আল্লাহ তাআলার পুত্র হলেও তিনি পিতার মতো অনাদি ও অনন্ত নন; বরং তিনি ঊর্ধ্বজগৎ ও নিম্নজগতের পূর্বে পিতার সৃষ্টিক্রিয়ার দ্বারা সৃষ্ট হয়েছেন। এ-কারণে তিনি পিতা থেকে নিম্নস্তরের এবং পিতার অসীম ক্ষমতা ও প্রতাপের সামনে অক্ষম ও বিনীত। চতুর্থ দল 'মাকদুনিয়্যন'। তারা বলে, পিতা ও পুত্র দুজনই ভিন্ন ভিন্ন মৌলিক সত্তা। আর রুহুল কুদ্স সত্তা নয়, সৃষ্ট জীব।

গির্জা এই চারটি দলকে এবং এ-জাতীয় অন্যান্য দলকে ধর্মদ্রোহী সাব্যস্ত করে ঘোষণা প্রদান করে। ৩২৫ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত নিকাদের কাউন্সিল এবং ৩৮১ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত কনস্টান্টিনোপল কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ত্রিত্ববাদকে খ্রিস্টধর্মের আকিদার ভিত্তি বলে মেনে নেয়া হয় এবং এই দুই কাউন্সিল মীমাংসা প্রদান করে যে, পিতা, পুত্র ও রুহুল কুদ্স (পবিত্র আত্মা) তিনটিই ভিন্ন ভিন্ন মৌল-সত্তা। আর অদৃশ্যের জগতে তিনটির একত্ব বা একক সত্তা হলো খোদা। যেনো এইভাবে গণিত ও জ্যামিতিশাস্ত্রের অকাট্য ও অনস্বীকার্য স্পষ্ট সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অথবা বলতে পারেন প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিরুদ্ধে মেনে নেয়া হয়েছে যে, 'এক'ই তিন এবং 'তিন'ই এক এবং এটাও বলা হয়েছে যে, পুত্র অনাদিকালেই পিতা থেকে জন্মলাভ করেছেন এবং অনাদিকালেই পিতা থেকে রুহুল কুদ্সের (পবিত্র আত্মার) উদ্ভব ঘটেছে। এরপর ৫৮৯ খ্রিস্টাব্দে টলেডোর (Toledo/طليطلة) কাউন্সিল এই সংশোধন-প্রস্তাব অনুমোদন করিয়ে নিয়েছে যে, রুহুল কুদ্সের উদ্ভব কেবল পিতা থেকে ঘটে নি; বরং পিতা ও পুত্র উভয়ের দ্বারা ঘটেছে। ল্যাটিন গির্জা এই সংশোধনকে বিনাদ্বিধায় মেনে নিয়েছে এবং গির্জার আকিদা সাব্যস্ত করেছে। গ্রিক গির্জা প্রথমে নীরব ভূমিকা অবলম্বন করলো; কিন্তু পরে এই সংশোধনকে 'অভিনব উদ্ভাবন' সাব্যস্ত করে তা মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানালো। তাদের পারস্পরিক বিরোধ এতটা চরম পর্যায়ে পৌঁছলো যে, গ্রিক গির্জা ও ক্যাথলিক ল্যাটিন গির্জার মধ্যে কখনোই ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয় নি।

ত্রিত্ববাদের এই বিশ্বাস খ্রিস্টধর্মের শিরায় শিরায় এমনভাবে প্রবেশ করেছে যে, খ্রিস্টধর্মের প্রধান দুটি দল রোমান ক্যাথলিক এবং

প্রোটেস্টানদের মধ্যে কঠিন মৌলগত মতভেদ থাকা সত্ত্বেও মৌলিকভাবে (ত্রিত্ববাদের ক্ষেত্রে) তাদের মধ্যে ঐক্যই রয়েছে। শুধু তা-ই নয়, তার চেয়েও বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, কিং লুথারের কিং এবং সংশোধনপ্রিয় গির্জাগুলোও এক দীর্ঘকাল পর্যন্ত ক্যাথলিক বিশ্বাসকেই কোনো ধরনের সংশোধন ও সংস্কার ছাড়াই আকিদা হিসেবে মেনেছে। অবশ্য খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে লাহুতি উপদলের অধিকাংশ সদস্য এবং কয়েকটি নতুন উপদল—সুসিনিয়ায়ি, জার্মান, একত্ববাদী ও উমুমিয়্যিন—এই আকিদাকে কিতাব-বিরুদ্ধ ও যুক্তিবিরোধী বলে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে।[১৭৭]

এটাই হলো খ্রিস্টধর্মে ত্রিত্ববাদের আকিদার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এই ইতিহাস থেকে যে-সত্য উদ্ভাসিত হয়ে তা এই যে, মূর্তিপূজামূলক কল্পনা থেকে উদ্ভূত এই ধর্মদ্রোহিতা ও মুশরিকসুলভ বিদআদের (ত্রিত্ববাদের আকিদা) মধ্যেই খ্রিস্টধর্মের সত্যতা-ধ্বংসের রহস্য গুপ্ত রয়েছে।

ত্রিত্ববাদের আকিদা কী জিনিস এবং পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার প্রকাশের বাস্তব সত্য কী—এ-বিষয়টি খ্রিস্টধর্মের সেইসব আলোচনার অন্তর্গত যাদের চূড়ান্ত কোনো জবাব কখনোই মেলে নি। বিষয়টিকে যতই পরিষ্কার ও স্পষ্ট করার চেষ্টা করা হয়েছে ততই তালগোল পাকিয়ে গেছে এবং জটিল হয়ে উঠেছে। ফল এই দাঁড়িয়েছে যে, যে-আকিদা খ্রিস্টধর্মের ভিত্তিগত ও মৌলিক মর্যাদা রাখতো তা ধাঁধা হয়েই থেকে গেলো। প্রাচীন ও আধুনিক খ্রিস্ট ধর্মবেত্তাদের বলতে হলো যে, ত্রিত্ববাদের মধ্যে একত্ববাদ রয়েছে এবং একত্ববাদের মধ্যে রয়েছে ত্রিত্ববাদ। এটা ধর্মের এমন একটা বিষয় যার সমাধান দুনিয়াতে হতে পারে না। পরকালে পৌঁছেই এই আকিদার সমাধান ও মীমাংসা হবে। তাই এখানে এই আকিদাকে বুদ্ধি ও জ্ঞান দ্বারা বোঝার চেষ্টা করা পণ্ডশ্রমমাত্র। বরং ভালো আকিদার সঙ্গে একে গ্রহণ করে নেয়াই মুক্তির পথ। যেমন, উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে বিখ্যাত খ্রিস্টান ধর্মবেত্তা

---

[১৭৭] দায়িরাতুল মাআরিফ, পিটার্স বুস্তানি, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩০৬, 'সালুস' ভুক্তি।

পাদরি ড. ফানডার ميزان الحق তাঁর গ্রন্থে[১৭৮] এ-বিষয়টিই প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন।

তারপরও এই মূর্তিপূজাপ্রসূত দর্শনের যেসব ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে, সেগুলোকে সংক্ষেপে এভাবে বুঝে নিতে হবে যে, আমরা যে-বস্তুজগতে বাস করছি তাকে 'আলমে নাসুত' বলা হয়। আর ঊর্ধ্বজগৎ, যার সম্পর্ক অদৃশ্য জগতের সঙ্গে, তা এবং তার বাইরে যে-জগৎ, যেখানে জমিন নেই, সময়ের প্রবাহ নেই, স্থান নেই, স্থানীয় নেই, যেখানে সবকিছুই আছে, কিন্তু বস্তুজগতের ঊর্ধ্বে, যাবতীয় উপরের উপরে, তার নাম 'আলমে লাহুত'। যখন ঊর্ধ্ব ও অধঃ এবং উচ্চ ও নীচ কিছুই ছিলো না এবং অনাদিকালের ব্যাপকতায় সময় একটি অর্থহীন শব্দ ছিলো, তখন তিনটি মূল বা আসল ছিলো : পিতা, পুত্র ও রুহুল কুদ্‌স। এই তিনটি মূল বা আসলের প্রকৃত নাম খোদা। রোমান ক্যাথলিক খ্রিস্টান, প্রোটেস্টান খ্রিস্টান এবং তাদের থেকে ভিন্ন পূর্বাঞ্চলীয় গির্জাভিত্তিক খ্রিস্টান—এই তিনটি দলই এ-ব্যাপারে একমত এবং এ-বিষয়টিকে খ্রিস্টধর্মের আত্মা বলে বিশ্বাস করে থাকে। তারা অত্যন্ত দুঃসাহসিকতার সঙ্গে দাবি করে যে, পবিত্র কিতাবের স্পষ্ট বর্ণনা এ-কথাই ঘোষণা করছে।

যুগের এই বিস্ময়কর আকিদা নতুন নতুন বিশ্বাস ও চিন্তাধারা উদ্ভাবনের এই পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, তা অধ্যয়ন করলে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণের অনেক উপকরণ পাওয়া যায়। বড় বড় ধর্মীয় কাউন্সিল, বড় বড় গির্জার বিশপগণ ও পোপগণ এই আকিদার ব্যাখ্যায় বিস্ময়কর ও অচিন্ত্যনীয় আলোচনার সূত্রপাত ঘটিয়েছেন : প্রথম মূল তথা পিতা থেকে কীভাবে দ্বিতীয় মূল তথা পুত্র জন্মলাভ করলো এবং তারপর পিতা থেকে বা পিতা ও পুত্র উভয় থেকে কীভাবে তৃতীয় মূল তথা পবিত্র আত্মার উদ্ভব ঘটলো বা কীভাবে তার অস্তিত্ব আত্মপ্রকাশ করলো; তিন সত্তা বা মূলের পারস্পরিক সম্পর্ক কী এবং তাদের ভিন্ন ভিন্ন উপাধি ও গুণাবলি কী, যা একটি মূলকে অপর মূল থেকে পৃথক করছে; তারা যখন ত্রিত্বে পরিণত

---

[১৭৮] গ্রন্থটির তিনটি খণ্ড : ১. ميزان الحق : لا تحريف في التوراة و الإنجيل; ২. ميزان الحق : كيف نخلص أيها الناس; ৩. ميزان الحق : كيف نعرف الدين الحق।

হয় তখন তার স্বরূপ, গুণাবলি ও উপাধির কী অবস্থা; যাঁকে আমরা খোদা বলি তাঁর মধ্যে তিনটি মূল সমানভাবে সম্পৃক্ত আছে না-কি একটি পূর্ণভাবে আর বাকি দুটি আংশিকভাবে আছে এবং আংশিকভাবে সম্পকৃত হলে তা কীভাবে?—ইত্যাদি। মোটকথা, মহান আল্লাহ তাআলার পবিত্র ও নিষ্কলুষ সত্তাকে (নাউযুবিল্লাহ) যেভাবে কুমারের চাকার ওপর রেখে মাটির পাত্র মনে করে ইচ্ছামত তাকে গড়ে নিয়েছে এবং যেভাবে খালেস তাওহিদ ও খাঁটি একত্ববাদকে ধ্বংস ও বরবাদ করে শিরক ও হ্রাস-বৃদ্ধির নতুন ছাঁচ তৈরি করেছে, পৃথিবীর ধর্ম ও ধর্মাদর্শের ইতিহাসে এমন ধর্মীয় পরিবর্তন ও অরাজকতা আকাশের চোখ কখনো দেখে নি, আকাশের কান কখনো শোনে নি।

إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ

কতই না বিস্ময়কর ব্যাপার এটা!

পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ, তারপর একত্ববাদ থেকে ত্রিত্ববাদ ও ত্রিত্ববাদ থেকে একত্ববাদের বিস্ময়কর বিবরণ একটি গোলক ধাঁধা। যার কোনো সমাধান চোখে পড়ে না। আর বক্তাই যখন শাব্দিক ব্যাখ্যা ছাড়া প্রকৃত সত্য বুঝতে অক্ষম তখন শ্রোতারা আর কী ছাই বুঝতে পারবে।

পিতা

ত্রিত্ববাদের তিনটি মূলের মধ্যে 'পিতা' প্রথম মূল। এই মূল থেকেই দ্বিতীয় মূলের উদ্ভব ঘটেছে। আলমে লাহুতে প্রথম মূল কখনো দ্বিতীয় ও তৃতীয় মূল থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না। কিন্তু খ্রিস্টধর্মের উপদলগুলোর মধ্যে অধিকাংশা দলই গির্জার সাধারণ শিক্ষা অনুযায়ী বলে থাকে যে, আলমে লাহুতের একত্বে তিনটি মূলেরই মর্যাদা সমান। কারো ওপর কারো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। আর আরইউসি উপদল বলে, এমন নয়; বরং দ্বিতীয় মূল তথা পুত্র প্রথম মূল তথা পিতার মতো অনাদি নয়। তবে তা ঊর্ধ্ব ও নিম্নজগতের অস্তিত্বলাভের অজ্ঞাতকাল পূর্বে প্রথম মূল থেকে জন্মলাভ করেছে। সুতরাং পুত্রের মর্যাদা পিতার পরে এবং পিতা থেকে কম। আর মাকদুনি উপদল বলে, মূল মাত্র দুটি : পিতা এবং পুত্র। এবং রুহুল

কুদ্‌স (পবিত্র আত্মা) তাদের দ্বারা সৃষ্ট। আর ফেরেশতাদের মধ্যে একজন ফেরেশতা এমন আছেন যিনি আল্লাহ তাআলার সকল ফেরেশতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। টলেডোর (Toledo/طليطلة) কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত এই যে, রুহুল কুদ্‌স পিতা ও পুত্র উভয় থেকে নির্গত হয়েছে অথবা উভয়ের দ্বারা অস্তিত্বপ্রাপ্ত হয়েছে। কিন্তু কনস্টান্টিনোপল কাউন্সিল বলছে, রুহুল কুদ্‌স কেবল পিতা থেকেই অস্তিত্ব লাভ করেছে। প্রাচীন ও আধুনিক দলগুলোর মধ্যে একটি বিরাট দল হযরত মারইয়াম আলাইহিস সালামকে তৃতীয় মূল বলে বিশ্বাস করে এবং তারা রুহুল কুদ্‌স (পবিত্র আত্মা)-এর মূল তিনটির একটি হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করে।

পুত্র

একে আরবি ভাষায় ابن (ইবনুন), ফরাসি ভাষায় 'ফি', ইংরেজি ভাষায় Son আর উর্দু ভাষায় 'বেটা' বলা হয়। পুত্র ওই মানবাকৃতিকে বলা হয় যা নারী ও পুরুষের যৌনক্রিয়ার ফলে উদ্ভূত হয়। কিন্তু ত্রিত্ববাদের বিশ্বাস অনুযায়ী আলমে লাহুতে পুত্র পিতা থেকে পৃথকও নয় এবং জন্মও হয়েছে। কারো কারো মতে তার জন্ম অনাদি ও অনন্ত এবং কারো কারো মতে তার জন্ম আদি ও অন্ত। তারা আরো বলে, যখন পিতার অভিপ্রায়ের সিদ্ধান্ত হলো তখন দ্বিতীয় মূল তথা পুত্র বস্তুজগতে (আলমে নাসুতে) হযরত মারইয়াম আলাইহিস সালাম-এর গর্ভে জন্মলাভ করেন এবং মাসিহ নাম ধারণ করেন। কেউ কেউ এমন দাবি করে যে, স্বয়ং পিতাই পুত্ররূপ ধারণ করে বস্তুজগতে মারইয়ামের গর্ভ থেকে জন্মলাভ করেছেন এবং মাসিহের আকৃতি পরিচিতি লাভ করেছেন। মজার ব্যাপার এই যে, কারো কারো মতে প্রথম মূল তথা পিতার ওপর দ্বিতীয় মূল তথা পুত্রের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে।

রুহুল কুদ্‌স বা পবিত্র আত্মা

একইভাবে রুহুল কুদ্‌স বা পবিত্র আত্মা সম্পর্কে ভীষণ মতযুদ্ধ রয়েছে। কেউ কেউ বলে যে, তা কোনো মূলই নয়, সুতরাং অদৃশ্য জগতে তার খোদাত্ব নেই। যেমন, আরইউসি উপদল ও মাকদুনি উপদল বলে যে, তিনি আল্লাহ তাআলার ফেরেশতাদের মধ্যে একজন ফেরেশতা এবং

তিনি তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে মর্যাদাবান। আর মারাতুইয়াসুন উপদল বলে, রুহুল কুদ্‌স একটি রূপক শব্দ। আল্লাহ তাআলার কার্যাবলির ক্ষেত্রে রূপকার্থে তার প্রয়োগ হয়ে থাকে। এ ছাড়া পৃথকভাবে এর কোনো সত্তা নেই। এ-কারণে এই মত পোষণকারীদের 'মাজাযিয়্যুন' বলা হয়। আধুনিক খ্রিস্টান ধর্মবেত্তাদের মধ্যে ক্লার্ক বলেন, বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টে ও নিউ টেস্টমেন্টে কোনো একটি জায়গাতেও পবিত্র আত্মাকে খোদাত্বের মর্যাদা প্রদান করা হয় নি। মাকদুনি উপদল রুহুল কুস্‌সের খোদা হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করে দৃঢ়তার সঙ্গে এই বক্তব্য প্রদান করেছে যে, খোদাত্বে মৌলে যদি রুহুল কুদ্‌সের আদৌ দখল থাকতো, তবে সে হয় জন্মপ্রাপ্ত হতো অথবা অজন্মপ্রাপ্ত হতো। যদি জন্মপ্রাপ্ত হয়ে থাকে তবে তার মধ্যে আর পুত্রের মধ্যে কী পার্থক্য থাকলো? আর যদি অজন্মপ্রাপ্ত হয়ে থাকে তবে তার মধ্যে ও পিতার মধ্যে কী ভিন্নতা থাকলো?

উল্লিখিত পক্ষগুলোর বিপরীতে অন্য দলগুলো বলে, রুহুল কুদ্‌স বা পবিত্র আত্মাও খোদাত্বের অধিকারী। বুসিয়্যু রুমানি বলেন, 'পবিত্র আত্মার উদ্ভব ঘটেছে পিতা ও পুত্র উভয় থেকে; সে তাদের মূল সত্তা থেকে হয়েছে এবং তাদের উভয়ের সঙ্গে আলমে লাহুতের একত্বে সে খোদা।' আর আশনাসাইয়ুস বলেন, 'রুহুল কুদ্‌স বা পবিত্র আত্মার খোদাত্ব অবশ্য-স্বীকার্য। আসমানি কিতাবসমূহে 'রুহ' শব্দের ক্ষেত্রে 'ইলাহ' শব্দের প্রয়োগ এবং 'ইলাহ' শব্দের ক্ষেত্রে 'রুহ' শব্দের প্রয়োগ প্রমাণিত ও সর্বজনস্বীকৃত। রুহের সঙ্গে এমনসব বিষয়কে সম্পর্কিত করা হয়েছে যার সম্পর্ক আল্লাহ তাআলার মহান সত্তা ছাড়া আর কারো সঙ্গে নেই। যেমন, সত্তার পবিত্র থাকা এবং যাবতীয় তথ্য অবগত থাকা ইত্যাদি। এই আকিদার চর্চা প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। যেমন তা ওয়াসওয়ালজিয়ার কবিতা থেকে প্রমাণিত হচ্ছে এবং এই কবিতা যে প্রাচীনকালে সংকলিত হয়েছে সে-ব্যাপারে সবাই একমত। এতে রুহুল কুদ্‌স বা পবিত্র আত্মার খোদাত্বের স্বীকৃতি বিদ্যমান।' আর মোন্টি লেফেলো পিটার্স রুহুল কুদ্‌সের খোদাত্বের অস্বীকৃতিকে সমালোচনাবাণে বিদ্ধ করেছেন এবং বলেছেন, 'নাসারা জাতির কাছে প্রকৃত খোদার একত্ব ত্রিত্ববাদের মধ্যে নিহিত থাকার বিষয়টি সর্বজনস্বীকৃত সত্য। রুহুল কুদ্‌সকে খোদাত্ব থেকে খারিজ করে দেয়ার কোনো অর্থ থাকতে

পারে না।' আর মাকদুনি উপদলের বক্তব্যকে খণ্ডন করে মারাসনিয়ুস বলেন, 'আসমানি কিতাবসমূহে রুহুল কুদ্সকে 'পুত্র' বলা হয় নি; তার ক্ষেত্রে বরং 'রুহুল আব' (পিতার আত্মা) ও 'রুহুল ইবন' (পুত্রের আত্মা) শব্দ দুটির প্রয়োগ দেখা যায়। সুতরাং রুহুল কুদ্সকে 'পিতা' বা 'পুত্র' বলা শুদ্ধ হতে পারে না এবং তাকে খোদাত্ব থেকে বের করে দিয়ে সৃষ্টজীব বলাও সঠিক হতে পারে না। আর এসব দার্শনিক তত্ত্বালোচনা থেকে রুহুল কুদ্সের প্রকৃত সত্য অনুধাবন করা মানুষের ক্ষমতার বাইরে। অবশ্য আমরা এতটুকু বলতে পারি যে, শুধু জন্মপ্রাপ্ত হওয়াই পিতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একক পন্থা নয়; বরং নির্গত ও আবির্ভূত হওয়াও আরেকটি পন্থা হতে পারে। কিন্তু আমরা মানবজগতে জন্মপ্রাপ্ত হওয়া এবং নির্গত ও আবির্ভূত হওয়ার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে সক্ষম নই। তবে এটা অবশ্যই বলা যায় যে, 'পিতা'র সঙ্গে জন্মলাভ ও আবির্ভূত হওয়ার অনাদি, অনন্ত ও অনিবার্য সম্পর্ক বিদ্যমান। সুতরাং, আমাদের জন্য কিছুতেই সঙ্গত হবে না প্রাচীন দার্শনিকদের (গ্রিক দার্শনিকদের) মতো 'রুহুল কুদ্স' ও 'পিতা'র মধ্যে সূক্ষ্ম দার্শনিক তত্ত্বালোচনার মাধ্যমে ওইসব আকিদা ও বিশ্বাস মেনে নিই যা তাঁরা খোদা তাআলা থেকে রুহসমূহের (আত্মাসমূহের) নির্গত হওয়ার ব্যাপারে আবিষ্কার করেছেন।'

এসবের সঙ্গে ওইসব মতভেদও লক্ষ্যণীয় যা ইতোপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ, কতিপয় গির্জা এই মত প্রকাশ করেছে যে, প্রথম মূল (পিতা) থেকেই । অন্য কতিপয় গির্জা বলে, রুহুল কুদ্সের আবির্ভাব ঘটেছে পিতা ও পুত্র উভয় মূল থেকে। এই মতভেদও খ্রিস্টান দল ও উপদলগুলোর মধ্যে কঠিন তর্ক-বিতর্কের কারণ হয়েছে। কেননা, ৩৮১ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত কনস্টান্টিনোপলের কাউন্সিল মানশুরে ঈমানি বা বিশ্বাসাবলির প্রজ্ঞাপন প্রকাশ করেছিলো যে, রুহুল কুদ্সের আবির্ভাব একমাত্র পিতা থেকেই ঘটেছে। এই আকিদা দীর্ঘকাল পর্যন্ত খ্রিস্টানজগতে প্রচলিত ছিলো। কিন্তু ৪৪৭ খ্রিস্টাব্দে প্রথমে স্পেনের গির্জা, তারপর ফ্রান্সের গির্জা, তারপর রোমান-ল্যাটিন গির্জাগুলো এই সংশোধনীকে তাদের আকিদার অংশ করে নিয়েছে যে, প্রথম মূল 'পিতা' ও দ্বিতীয় মূল 'পুত্র' উভয় থেকেই রুহুল কুদ্সের আবির্ভাব ঘটেছে।

খ্রিস্টান ধর্মবেত্তাগণ বলেন, প্রকৃতপক্ষে ৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম পূর্বাঞ্চলীয় দার্শনিক পেত্রার্ক ফুতিউস এই আলোচনার সূত্রপাত ঘটিয়েছেন। তার কারণ এই যে, তাঁর ও তাঁর দলের অভিপ্রায় ছিলো কোনো-না-কোনোভাবে পূবাঞ্চলের (গ্রিক) গির্জাগুলোকে পশ্চিমাঞ্চলের (রোমান) গির্জাগুলোর প্রভাবমুক্ত ও পৃথক করা এবং উভয় অঞ্চলের গির্জাগুলোর মধ্যকার ঐক্যকে বিনষ্ট করা। এই অভিপ্রায়কে সমর্থন ও শক্তি প্রদানের জন্য ১০৪৩ খ্রিস্টাব্দে প্রাধান আর্চ বিশপ পেত্রার্ক মিখাইল খুব দ্রুত এই আকিদার প্রচার-প্রসার শুরু করেন। এভাবে কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত এসব মতানৈক্য পূর্বাঞ্চলীয় ও পশ্চিমাঞ্চলীয় গির্জাগুলোর মধ্যকার কলহকে স্থায়ী করলো। উভয় অঞ্চলের গির্জাগুলো একে অন্যের ওপর এই দোষারোপ করতে থাকলো যে, বিরোধী গির্জাগুলো খ্রিস্টধর্মে খোদাদ্রোহিতা ও অভিনব বিশ্বাসের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে সত্য খ্রিস্টধর্মকে বিলুপ্ত করে দিয়েছে। সাধারণভাবে রোমান ক্যাথলিক খ্রিস্টান ও প্রোটেস্টান খ্রিস্টানদের মধ্যে এবং বিশেষভাবে গির্জাসমূহের উপদলগুলোর মধ্যে কলহ-বিবাদের এই ধারা ওই যুগে চরম পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিলো এবং তারা পরস্পরকে ভয়ঙ্কর রক্তপাত ও পাশবিক অত্যাচারের নরকে পরিণত করেছিলো। আর সে-যুগে ইসলাম তার আকিদাসমূহের সরলতা ও নেক আমলের পবিত্রতা এবং ইলম ও আমলে আধ্যাত্মিকতার উদ্ভাসের ফলে 'ব্যাপক নিরাপত্তা' ও 'রহমতে'র উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়ে উঠেছিলো।

অন্ধকার যুগ এবং গির্জাসমূহের সংশোধনের আওয়াজ

তখন ছিলো সেই যুগ যখন খ্রিস্টানদের ধর্মীয় গির্জাগুলো সাধারণ ও অতি সাধারণ মতভেদকে কেন্দ্র করে পোপের শাসন ও পোপের অনুসারীদের শাসনের মাধ্যমে এক দল আরেক দলের শিরশ্ছেদ ও মৃত্যুদণ্ডের ঘোষণা দিতো। তারা হাজার হাজার ও লাখ লাখ মানুষকে ভয়ঙ্কর নির্যাতনে পীড়িত করে হত্যা করে ফেলতো। এ-কারণে ইতিহাসবিদগণ ইতিহাসের এই অধ্যায়কে অন্ধকার যুগ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

কুরআন হযরত ইসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে যে-তত্ত্ব ও সত্য প্রকাশ করেছে, পোপ ও গির্জার প্রতাপ খ্রিস্টানদেরকে দীর্ঘকাল পর্যন্ত সেদিকে

মনোযোগ প্রদান করতে না দিলেও কুরআনের সত্যের আওয়াজ প্রভাব সৃষ্টি না করে থাকে নি। এর বিস্তারিত বিবরণ খাতিমুল আম্বিয়া মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জীবনচরিতে উল্লেখ করা হবে। এখানে শুধু এতটুকু ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য যে, রোমান ক্যাথলিক খ্রিস্টান ও প্রোটেস্টান খ্রিস্টান এবং অন্য উপদলগুলো কোনোরূপ দ্বিধা ছাড়াই সেন্ট পল কর্তৃক প্রবর্তিত বিকৃতিকে (ত্রিত্ববাদকে) খ্রিস্টধর্মের মৌলিক আকিদারূপে মেনে নিয়েছিলো। কতিপয় ক্ষুদ্র দল বা কতিপয় ব্যক্তি ত্রিত্ববাদের বিরুদ্ধে আওয়াজ উঁচু করলেও সেই আওয়াজ ধীরে ধীরে দমিত হয়ে পড়েছে। যেমন, ৩২৫ খ্রিস্টাব্দে ও ৩৮১ খ্রিস্টাব্দে যথাক্রমে নিকাদের কাউন্সিল ও কনস্টান্টিনোপলের কাউন্সিল যখন ত্রিত্ববাদকে খ্রিস্টধর্মের মৌলিক আকিদা বলে সাব্যস্ত করলো তখন 'আবওয়ারিয়্যুন' সম্প্রদায় পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করলো যে, হযরত ইসা মাসিহ আলাইহিস সালাম একজন মানুষমাত্র; তাঁর খোদাত্বের কোনো সম্পর্ক নেই। আর 'সাবলিইয়্যুন' উপদল বলেছে যে, তিনটি সত্তা তিনটি ভিন্ন ভিন্ন মূল নয়; বরং তা ওয়াহদাতে লাহুতের বা লাহুতের একত্বের বিভিন্ন আকৃতি বা প্রকাশ, যাকে আল্লাহ তাআলা কেবল নিজের একক সত্তার জন্য প্রয়োগ করে থাকেন। তারপরও ওই সময় পর্যন্ত পোপ ও গির্জার সিদ্ধান্তকে আল্লাহর সিদ্ধান্ত বলে মনে করা হতো এবং বিশপ ও পাদরিদের أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ 'আল্লাহ ব্যতীত বিভিন্ন খোদা' বলে বিশ্বাস করা হতো। এ-কারণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপদল ও ব্যক্তিবিশেষের সংশোধনবাদকে খোদাদ্রোহিতা আখ্যায়িত করে দমিত করে দেয়া হয়েছিলো। কিন্তু যখন ক্রুসেডের লড়াইসমূহ খ্রিস্টানদেরকে মুসলমানদের অতি কাছাকাছি হওয়ার সুযোগ করে দিলো এবং খ্রিস্টানরা ইসলামের বিশ্বাসগত ও কর্মগত শৃঙ্খলার অনেক চিত্র প্রত্যক্ষ করলো এবং তাদের কাছে ইসলাম সম্পর্কে বিশপ ও পাদরিদের বিষোদ্গার, মিথ্যাচার ও ভ্রান্ত বক্তব্য প্রকাশ পেতে শুরু করলো, তখন তাদের মধ্যেও স্বাধীন চিন্তা উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো এবং তাদের মধ্যে অন্ধ-বিশ্বাসের শৃঙ্খলকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলার প্রেরণা জাগ্রত হলো। এ-ব্যাপারে কিং লুথারের আহ্বান প্রথম সত্য-উচ্চারণ ছিলো, যিনি অসীম সাহসিকতার সঙ্গে أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ—এক আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য বাতিল ও মিথ্যা

উপাস্যকে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানালেন। কিন্তু আপনারা এ-কথা শুনে বিস্ময়বোধ করবেন যে, কিং লুথারের সত্য-উচ্চারণের বিরুদ্ধে পোপের পক্ষ থেকে খোদাদ্রোহিতা ও ধর্মদ্রোহিতাসহ যেসব দোষ চাপানো হয়েছিলো তার মধ্যে প্রধান দোষারোপ ছিলো এটা যে, এই ব্যক্তি ভেতরে ভেতরে 'মুসলমান' হয়ে পড়েছে এবং পোপের বিরুদ্ধে তা সত্য-উচ্চারণ কুরআনেরই প্রতিধ্বনি।

এটাই ছিলো সংশোধনের আওয়াজ, যা নিঃসন্দেহে ইসলামের 'চিন্তা ও অনুধাবনে'র আহ্বানে প্রভাবিত হয়ে ধীরে ধীরে গির্জার সংশোধনের নামে খ্রিস্টানজগতে গুঞ্জরিত হয়ে উঠেছিলো এবং চারদিকে অগ্নিশিখার মতো দৃষ্টিগোচর হচ্ছিলো। এসব সংশোধনের মধ্যে একটি সংশোধন-চিন্তা এটাও ছিলো যে, ত্রিত্ববাদের আকিদা পবিত্র গ্রন্থ (নিউ টেস্টামেন্ট)-এর সম্পূর্ণ বিপরীত। ফলে খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে প্রাচীন লাহুতি উপদলের সবাই, নাসতুরি উপদলের দলীয় সিদ্ধান্ত এবং নতুন উপদলগুলোর মধ্যে সুসিনিয়ানিয়্যুন, জার্মানিয়্যুন, মুওয়াহ্হিদুন, উমুমিয়্যুন এবং অন্যান্য উপদল গির্জার শিক্ষার বিরুদ্ধে ধর্মীয় বিপ্লব ঘোষণা করে পরিষ্কাভাবে বলে দিলো যে, ত্রিত্ববাদের আকিদা কিতাব ও যুক্তি উভয়েরই বিরোধী এবং মেনে নেয়ার অযোগ্য। সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মীয় গোঁড়ামি তাদেরকে ইসলাম ধর্মের অনুসারী হওয়া থেকে নিবৃত্ত রাখলেও তারা ত্রিত্ববাদের আকিদার বিভিন্ন চেহারা ও আকৃতির বিশ্লেষণ প্রদান করতে শুরু করলো এবং এসব বিশ্লেষণ ত্রিত্ববাদের আকিদাকে ভ্রান্ত সাব্যস্ত করে আল্লাহ তাআলার একত্বের পবিত্র অঙ্কুরোদ্‌গম করতে লাগলো। যেমন, সুইডেনবার্গ বললেন, তিনটি মূল—'পিতা', 'পুত্র' ও 'রুহুল কুদ্‌স'-এর সম্পর্ক হযরত মাসিহ আলাইহিস সালাম-এর সত্তা ব্যতীত (আল্লাহ তাআলার) একত্বের সত্তার সঙ্গে নয় (শুধু মাসিহ আলাইহিস সালাম-এর সত্তার সঙ্গেই জড়িত)। অর্থাৎ, হযরত মাসিহ আলাইহিস সালাম-এর সত্তা তার লাহুতি স্বভাবের প্রেক্ষিতে 'পিতা' এবং আলমে নাসুতে বা মানবজগতে মানবাকৃতিবিশিষ্ট হওয়ার কারণে 'পুত্র' ও 'দ্বিতীয় মূল'। আর তা থেকেই রুহুল কুদসের আবির্ভাব ঘটেছে, এ-কারণে তৃতীয় মূল 'রুহ' বা 'আত্মা'। মোটকথা, ত্রিমূলের সম্পর্ক কেবল মাসিহ আলাইহিস সালাম-এর সঙ্গেই (অন্যকারো সঙ্গে নয়)।

জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট বলেন, ত্রিত্ববাদের আকিদার অর্থ এই নয় যে, 'পিতা', 'পুত্র' ও 'রুহুল কুদ্স'---এই তিন সত্তা; বরং তা আলমে লাহুতে বা অদৃশ্য জগতে মহান আল্লাহর তিনটি মৌলিক গুণের প্রতি ইঙ্গিত, যা তাঁর অন্য যাবতীয় গুণ ও বৈশিষ্ট্যের উৎস ও উৎপত্তিস্থল হওয়ার মর্যাদা রাখে। মৌলিক গুণ তিনটি এই : কুদরত (পিতা), হেকমত (পুত্র) এবং মুহাব্বাত (রুহ)। অথবা ত্রিত্ববাদের দ্বারা আল্লাহ তাআলার তিনটি মৌলিক কর্মের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যেগুলোকে সৃষ্টি, সুরক্ষা ও নিয়ন্ত্রণ নামে আখ্যায়িত করা যায়।

আর হ্যাকান ও শিলং এই চিন্তার ব্যাপক প্রসার ঘটিয়েছেন যে, ত্রিত্ববাদের আকিদা অন্যান্য সত্য বিষয়ের মতো কোনো সত্য বিষয়ই নয়। এটি নিছক একটি কাল্পনিক মতাদর্শ। তাঁদের কথার উদ্দেশ্য এই যে, সত্য বলতে যা বোঝায় তা হলো মহান আল্লাহর সত্তা একক ও সমকক্ষহীন। আর হযরত মাসিহ আলাইহিস সালাম তাঁর সৃষ্ট বান্দা। কিন্তু সাধারণ কল্পনা ও অনুমানে যখন আমরা অদৃশ্য জগতের দিকে উড়তে থাকি তখন আমাদের কল্পনা এই মানবজগতে খোদা, মাসিহ ও রুহুল কুদ্সকে 'পিতা, 'পুত্র' ও 'রুহ' শব্দে বিশ্লেষিত করে থাকে এবং এদের পারস্পরিক সম্পর্ককে ত্রিমূলের মর্যাদায় কেন্দ্রীভূত দেখতে পায়। যুক্তিবাদী, লুথারপন্থী, একত্ববাদী, জার্মান দলগুলো ছাড়াও অনেক মানুষ আছে যারা সাবলিয়্যুন উপদলের আকিদা অবলম্বন করে একটি বিশাল দলে রূপ নিচ্ছে।

এসব ব্যাপার সত্ত্বেও এ-কথা অস্বীকার করা যাবে না যে, ইউরোপে পুনর্জাগরণের যুগেও সাধারণভাবে সমস্ত গির্জাই ত্রিত্ববাদের আকিদায় বিশ্বাসী থেকেছে। তাদের কাছে ত্রিত্ববাদের ব্যাখ্যা তা-ই যা খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে কতিপয় ধর্মীয় কাউন্সিল কর্তৃক প্রদান করা হয়েছে এবং যা নিঃসন্দেহে প্রকাশ্য শির্ক, এবং একত্ববাদের সম্পূর্ণ বিরোধী।

পবিত্র কুরআন ও ত্রিত্ববাদের আকিদা

পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময় সাধারণ খ্রিস্টান সমাজ যে-কয়টি বড় বড় দলে বিভক্ত ছিলো, তাদের ত্রিত্বাবাদ-সম্পর্কিত আকিদা ভিন্ন ভিন্ন ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলো। তাদের এক দল বলতো, মাসিহ

আলাইহিস সালাম-ই স্বয়ং খোদা (নাউযুবিল্লাহ) এবং খোদাই মাসিহ আলাইহিস সালাম-এর রূপ ধারণ করে পৃথিবীতে আগমন করেছেন। দ্বিতীয় দল বলে, মাসিহ আলাইহিস সালাম আল্লাহর পুত্র (নাউযুবিল্লাহ)। তৃতীয় দল বলে, একত্বের রহস্য ত্রিত্বে নিহিত রয়েছে—পিতা, পুত্র ও মারইয়াম। এই তৃতীয় দলের মধ্যে দুটি ভাগ ছিলো। দ্বিতীয় ভাগ হযরত মারইয়াম আলাইহিস সালাম-এর স্থলে রুহুল কুদ্স বা পবিত্র আত্মাকে তৃতীয় মূল বলেছে। মোটকথা, তারা হযরত ইসা মাসিহ আলাইহিস সালামকে ত্রিমূলের মধ্যে তৃতীয় মূল বলে বিশ্বাস করতো। এ-কারণে পবিত্র কুরআন সত্য-ঘোষণার ক্ষেত্রে উল্লিখিতি দল তিনটিকে ভিন্ন ভিন্নভাবে সম্বোধন করেছে এবং একসঙ্গেও সম্বোধন করেছে। খ্রিস্টানজগতের সামনে দলিল-প্রমাণের আলোকে এ-বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, এ-ব্যাপারে সত্য পথ একটিই এবং কেবল একটিই : ইসা মাসিহ আলাইহিস সালাম হযরত মারইয়াম আলাইহিস সালাম-এর গর্ভ থেকে জন্মপ্রাপ্ত একজন মানুষ এবং আল্লাহ তাআলার সত্য নবী ও রাসুল। এ-কথা ছাড়া পথভ্রষ্ট ও বাতিলপন্থীরা যা-কিছু বলে থাকে তা সম্পূর্ণভাবে মিথ্যা ও বাতিল। তা যত খর্বকরণমূলকই হোন না কেনো। যেমন ইহুদিদের আকিদা— (নাউযুবিল্লাহ) হযরত ইসা মাসিহ আলাইহিস সালাম প্রতারক ও ভেলকিবাজ ছিলেন। অথবা যেমন খ্রিস্টানদের আকিদা—তিনি খোদা বা খোদার পুত্র বা ত্রিত্বের তৃতীয়। পবিত্র কুরআন শুধু নাসারাদের মতবাদকে খণ্ডন করার দিকটিই উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ করে নি; বরং হযরত মাসিহ আলাইহিস সালাম-এর মাহাত্ম্য ও উচ্চ মর্যাদার মূল রহস্য কী এবং তিনি আল্লাহ তাআলার সান্নিধ্য কতটুকু লাভ করেছেন, সে-ব্যাপারেও যথেষ্ট আলোকপাত করেছে। যাতে ইহুদিদের আকিদারও খণ্ডন হয় এবং বাড়াবাড়ি ও খর্বকরণ থেকে স্পষ্টভাবে সত্য পথটি প্রকাশ পায়।

হযরত ইসা মাসিহ আলাইহিস সালাম আল্লাহর সান্নিধ্যপ্রাপ্ত ও মনোনীত রাসুল

কুরআন মাজিদ তাঁর সম্পর্কে বিভিন্ন সুরায় যেসব বক্তব্য পেশ করেছে তা নিম্নরূপ—

قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا () وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا () وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا () وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا (سورة مريم)

"সে বললো, 'আমি তো আল্লাহর বান্দা। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন[১৭৯], আমাকে নবী বানিয়েছেন, যেখানেই আমি থাকি না কেনো তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন, তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যতদিন জীবিত থাকি ততদিন সালাত ও যাকাত আদায় করতে—আর আমাকে আমার মাতার প্রতি অনুগত করেছেন এবং তিনি আমাকে করেন নি উদ্ধত ও হতভাগ্য; আমার প্রতি শান্তি যেদিন আমি জন্মলাভ করেছি, যেদিন আমার মৃত্যু হবে এবং যেদিন জীবিত অবস্থায় আমি উত্থিত হবো।'" [সুরা মারইয়াম : আয়াত ৩১-৩৩]

إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ () وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنكُم مَّلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ () وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ (سورة الزخرف)

"সে তো ছিলো আমারই এক বান্দা, যাকে আমি অনুগ্রহ করেছিলাম এবং করেছিলাম বনি ইসরাইলের জন্য দৃষ্টান্ত। আমি ইচ্ছা করলে তোমাদের মধ্য থেকে (বা তোমাদের পরিবর্তে) ফেরেশতা সৃষ্টি করতে পারতাম, যারা পৃথিবীতে উত্তরাধিকারী হতো। ইসা তো কিয়ামতের নিশ্চিত নিদর্শন; সুতরাং তোমরা কিয়ামতে সন্দেহ করো না এবং আমাকে অনুসরণ করো। এটাই সরল পথ।" [সুরা যুখরুফ : আয়াত ৫৯-৬১]

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ

"স্মরণ করো, মারইয়াম-তনয় ইসা বলেছিলো, 'হে বনি ইসরাইল, আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর রাসুল এবং আমার পূর্ব থেকে তোমাদের কাছে

[১৭৯] তখনো কিতাব দেয়া হয় নি; তবে কিতাব যে দেয়া হবে এটা তাঁকে জানানো

যে-তাওরাত রয়েছে আমি তার সমর্থক এবং আমার পরে আহমদ[১৮০] নামে যে-রাসুল আসবে আমি তার সুসংবাদদাতা।'" [সুরা সাফ্ফ : আয়াত ৬]

হযরত মাসিহ আলাইহিস সালাম আল্লাহও নন, আল্লাহর পুত্রও নন

এ-বিষয়ে কুরআনের বিভিন্ন সুরায় যা বলা হয়েছে তা নিম্নরূপ—

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (سورة المائدة)

"যারা বলে, 'মারইয়াম-তনয় মাসিহই আল্লাহ', তারা তো কুফরি করেছেই। (হে মুহাম্মদ,) বলো, 'আল্লাহ যদি মারইয়াম-তনয় মাসিহ, তাঁর জননী ও দুনিয়ার সবাইকে ধ্বংস করতে ইচ্ছা করেন তবে তাঁকে বাধা দেয়ার শক্তি কার আছে?' আসমান ও জামিনের এবং এদের মধ্যে যা-কিছু আছে তার সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই। তিনি যা ইচ্ছা করেন সৃষ্টি করেন এবং আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।" [সুরা মায়িদা : আয়াত ১৭]

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ (سورة المائدة)

"যারা বলে, 'আল্লাহই মারইয়াম-তনয় মাসিহ', তারা তো কুফরি করেছেই। অথচ মাসিহ বলেছিলো, 'হে বনি ইসরাইল, তোমরা আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহর ইবাদত করো।' কেউ আল্লাহর শরিক (নির্ধারিত) করলে আল্লাহ তার জন্য অবশ্যই জান্নাত নিষিদ্ধ করবেন এবং তার আবাস জাহান্নাম। জালিমদের জন্য কোনো সাহায্যকারী নেই।" [সুরা মায়িদা : আয়াত ৭২]

---

[১৮০] হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অপর নাম আহমদ।

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ (سورة البقرة)

"এবং তারা বলে, 'আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন।' তিনি অতি পবিত্র। বরং আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব আল্লাহরই। সবকিছু তাঁরই একান্ত অনুগত।' [সূরা বাকারা : আয়াত ১১৬]

إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (سورة آل عمران)

"আল্লাহর কাছে নিশ্চয় ইসার দৃষ্টান্ত আদমের দৃষ্টান্তসদৃশ। তিনি তাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছিলেন; তারপর তাকে বলেছিলেন, 'হও', ফলে সে হয়ে গেলো।" [সূরা আলে ইমরান : আয়াত ৫৯]

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا (سورة النساء)

"হে কিতাবিগণ (ইহুদি ও নাসারা), তোমাদের দীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না এবং আল্লাহ সম্পর্কে সত্য ব্যতীত বলো না। মারইয়াম-তনয় ইসা মাসিহ তো আল্লাহর রাসুল ও তাঁর বাণী,[১৮১] যা তিনি মারইয়ামের কাছে প্রেরণ করেছিলেন, এবং তাঁর আদেশ[১৮২]। সুতরাং তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলে ঈমান আনো এবং বলো না 'তিন!'[১৮৩] নিবৃত্ত হও, তা (নিবৃত্তি) তোমাদের জন্য কল্যাণকর হবে। আল্লাহ তো একমাত্র ইলাহ;

---

[১৮১] كلمة অর্থ মানুষ যা বলে। এই বিশেষ জায়গায় এ-কথাটির অর্থ মারইয়ামের পুত্র-সম্ভাবনা।

[১৮২] রুহ অর্থ আত্মা ও আদেশ। জীবের ক্ষেত্রে এর অর্থ আত্মা আর আল্লাহর ক্ষেত্রে এর অর্থ আদেশ। যেমন : روح الله অর্থ আল্লাহর আদেশ।

[১৮৩] তাদের মতে, খোদা, ইসা, জিবরাইল (মতান্তরে জননী মারইয়াম)—এই তিন মাবুদ। এরূপ তিন মাবুদ বলার শিরক থেকে নিবৃত্ত হয়ে তাওহিদে বিশ্বাসী হলে তাদের জন্য কল্যাণকর হবে।

তাঁর সন্তান হবে—তিনি তা থেকে পবিত্র। আকাশমণ্ডলীতে যা-কিছু আছে ও জমিনে যা-কিছু আছে সব আল্লাহরই; কর্ম-বিধানে আল্লাহই যথেষ্ট।" [সূরা নিসা : আয়াত ১৭১]

بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (سورة الأنعام)

"তিনি আসমান ও জমিনের স্রষ্টা, তাঁর সন্তান হবে কীরূপে? তাঁর তো কোনো স্ত্রী নেই। তিনিই তো সমস্ত-কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেক বস্তু সম্পর্কে তিনিই সবিশেষ অবহিত।" [সূরা আনআম : আয়াত ১০১]

مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ (سورة المائدة)

"মারইয়াম তনয় মাসিহ তো কেবল একজন রাসুল। তার পূর্বে অনেক রাসুল গত হয়েছে এবং তার মা সত্যনিষ্ঠ ছিলো। তারা উভয়ে খাদ্যাহার করতো।" [সূরা মায়িদা : আয়াত ৭৫]

لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا (سورة النساء)

"মাসিহ আল্লাহর বান্দা হওয়াকে কখনো হেয় জ্ঞান করে না, এবং ঘনিষ্ঠ ফেরেশতাগণও করে না। আর কেউ তাঁর ইবাদতকে হেয় জ্ঞান করলে এবং অহঙ্কার করলে তিনি অবশ্যই তাদের সবাইকে তাঁর কাছে একত্র করবেন। (অর্থাৎ, যাবতীয় আমলের পুরস্কার ও শাস্তি প্রদানের দিন সবার প্রকৃত অবস্থা উন্মোচিত হয়ে পড়বে।)" [সূরা নিসা : আয়াত ১৭২]

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ (سورة التوبة)

contents

"ইহুদিরা বলে, 'উযায়র আল্লাহর পুত্র',[১৮৪] এবং খ্রিস্টানরা বলে, 'মাসিহ আল্লাহর পুত্র।' এটা তাদের মুখের কথা। পূর্বে যারা কুফরি করেছিলো, ওরা তাদের মতো কথা বলে। আল্লাহ ওদের ধ্বংস করুন। আর কোন্ দিকে ওদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে!" [সুরা তাওবা : আয়াত ৩০]

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ () اللَّهُ الصَّمَدُ () لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ () وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

(سورة الإخلاص)

"বলো, 'তিনিই আল্লাহ, এক-অদ্বিতীয়, আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী; তিনি কাউকে জন্ম দেন নি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয় নি, এবং তাঁর সমতুল্য কেউই নেই।'" [সুরা ইখলাস : আয়াত ১-৪]

পবিত্র কুরআন এ-ক্ষেত্রে নিজের সত্যতা এবং মানুষের আকিদা ও আমলের সংশোধনে যে-দালিলিক ও স্পষ্ট ঘোষণা প্রদান করেছে তা উপলব্ধি করার সঙ্গে সঙ্গে এ-বিষয়টিও মনোযোগের দাবি রাখে যে, পবিত্র কিতাবকে (ইঞ্জিলকে) পরিবর্তিত ও বিকৃত করে ফেলার পর আজ তা যে-অবস্থায় ও যে-আকারে বিদ্যমান, তা কোনো-এক স্থানেও ত্রিত্ববাদের এই আকিদার সন্ধান দিচ্ছে না। যার বিশদ বিবরণ ও ব্যাখ্যা একটু আগেই খ্রিস্টান মনীষী, ধর্মীয় উপদেষ্টা ও গির্জাসমূহ(-এর প্রতিনিধিদের) থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে এবং কোনো ধরনের অপব্যাখ্যা ছাড়াই জায়গায় জায়গায় হযরত মাসিহ আলাইহিস সালাম-এর জবানে আল্লাহ তাআলাকে 'পিতা' এবং নিজেকে 'পুত্র' প্রকাশ করা হয়েছে। এর জন্য আর কোনো প্রমাণ স্পষ্ট ও পরিষ্কারভাবে বিদ্যমান নেই। সুতরাং, আমরা যদি এ-বিষয়টি থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিই যে, এসব ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ বিকৃতি ও মূর্তিপূজার ধারণা থেকে উদ্ভূত এবং যদি কথার কথা ধরেও নিই যে, মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত সত্য আসমানি ইঞ্জিলেও এ-ধরনের বর্ণনা উপস্থিত ছিলো, তারপরও নাসারা জাতির ত্রিত্ববাদের আকিদা কোনোভাবেই সঠিক প্রমাণিত হয় না। কেননা, ابن

[১৮৪] ইহুদিদের মধ্যে একটি সম্প্রদায় এই আকিদা পোষণ করতো। তাদেরকে উযায়রি বলা হতো। কেউ কেউ বলেন, বর্তমানেও এদের বংশধর কোনো কোনো অঞ্চলে বিদ্যমান।

বা 'পুত্র' শব্দটি প্রকৃত অর্থের প্রেক্ষিতে ওই ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়, যিনি কারো ঔরস থেকে বা কারো গর্ভ থেকে শুক্রবীজ দ্বারা জন্মলাভ করেছেন। তবুও ভাষার ব্যবহার ও ভাষাগোষ্ঠীর পারস্পরিক কথাবার্তা সাক্ষ্য প্রদান করছে যে, শব্দটি কখনো কখনো রূপক অর্থে, কখনো কখনো উপমা ও তুলনা বুঝাতে এবং কখনো অন্যান্য অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন, একজন বয়োঃবৃদ্ধ ব্যক্তি তার চেয়ে কম বয়সের মানুষকে 'বেটা' বলে সম্বোধন করেন। বাদশাহ তাঁর প্রজাবৃন্দকে 'সন্তান' বলে সম্বোধন করেন। শিক্ষক তাঁর ছাত্রদেরকে 'বেটা' বা 'বৎস' বলে সম্বোধন করেন। গুরুও তাঁর শিষ্যকে 'বৎস' বা 'আত্মিক সন্তান' বলে থাকেন। কোনো ব্যক্তি যদি কোনো বিদ্যায়, কোনো শাস্ত্রে বা শিল্পে পারদর্শী ও বিশেষজ্ঞ হন অথবা ওই বিষয়ে গভীরভাবে সাধনা করেন, তবে তাঁকে ইঙ্গিতার্থে ওই বিদ্যা বা শাস্ত্রের বা শিল্পের পুত্র বলে আখ্যায়িত করা হয় এবং বলা হয় ابن الفلسفة – ابن القانون – ابن الحدادة (দর্শনের বরপুত্র, আইনের বরপুত্র, লৌহকর্মের পুত্র)। কেউ যদি বৈষয়িক উন্নতির পেছনে ছোটে এবং লোভ-লালসায় সীমা ছাড়িয়ে যায় তবে বলা হয় ابن الدنانير ও ابن الدراهيم (দিনারের পুত্র ও দিরহামের পুত্র)। আর মুসাফিরকে বলা হয় ابن السبيل। কোনো প্রসিদ্ধ ব্যক্তিকে ابن جلا, কোনো দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে ابن ليله, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তাহীন ব্যক্তিকে ابن يومه ও পার্থিব দিক থেকে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিকে ابن الوقت বলা হয়। যার মধ্যে কোনো গুণ উৎকর্ষের সঙ্গে বিদ্যমান, এমন গুণসম্পন্ন ব্যক্তিকে ওই গুণের সঙ্গে সম্পর্কিত করে স্মরণ করা হয়। যেমন 'উষা'কে বলা হয় ابن ذكاء। আর এসব উদাহরণ থেকেও অধিক গ্রাহ্য ব্যাপার এই যে, বনি ইসারইল বংশে নবীগণ (আলাইহিমুস সালাম) তাঁদের উম্মতদেরকে পুত্র ও সন্তান বলে সম্বোধন করতেন।

أَب বা 'পিতা' শব্দের প্রয়োগ ও ব্যবহার সম্পর্কেও এই একই কথা বলা যায়। একজন অল্পবয়স্ক ব্যক্তি তাঁর চেয়ে বয়োঃবৃদ্ধকে, একজন মুখাপেক্ষী ব্যক্তি তাঁর মুরব্বিকে, একজন ছাত্র তাঁর শিক্ষককে, একজন শিষ্য তাঁর গুরুকে, উম্মত তাদের নবী ও রাসুলকে أَب বা পিতা বলে সম্বোধন করেন এবং এটিকে গৌরবের বিষয় বলে মনে করেন। আর

জানা কথা যে, এই জাতীয় ব্যবহার রূপকার্থে, ইঙ্গিতার্থে ও উপমার্থে হয়ে থাকে। একইভাবে তুলনারহিত বক্তা বা খতিবকে أبو الكلام, গুণবান লেখক ও রচয়িতাকে أبو القلم, অভিজ্ঞ সমালোচককে أبو النظر, ভীষণ ও ভয়ঙ্কর বস্তুকে أبو الهول, দানশীল ব্যক্তিকে أبو النجاد, কৃষিকাজে অভিজ্ঞ লোককে أبو الفلاحة, শিল্প ও পেশায় বিচক্ষণ ব্যক্তিকে أبو الصنع অহরহ বলা হয়ে থাকে।

সুতরাং এসব শব্দের এসব ব্যবহারের প্রতি লক্ষ করে বলা যেতে পারে যে, পবিত্র কিতাবে (ইঞ্জিলে) এক-অদ্বিতীয় সত্তা আল্লাহ তাআলার জন্য أَب বা 'পিতা' শব্দের প্রয়োগ প্রকৃত মাবুদ (উপাস্য) অর্থে এবং হযরত মাসিহ আলাইহিস সালাম-এর জন্য ابن বা 'পুত্র' শব্দটির প্রয়োগ আল্লাহ তাআলার প্রিয়ভাজন ও মনোনীত বান্দা অর্থে করা হয়েছে। অর্থাৎ, যেভাবে পিতা ও পুত্রের মধ্যে ভালোবাসা ও স্নেহের বন্ধন দৃঢ় ও শক্তিশালী হয়ে থাকে। তার চেয়েও বহুগুণ দৃঢ় ও শক্তিশালী স্নেহ ও ভালোবাসার বন্ধন আল্লাহ তাআলা ও তাঁর পবিত্র নবী ইসা মাসিহ আলাইহিস সালাম-এর মধ্যে রয়েছে। একটি সহিহ হাদিসে নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রূপকার্থ ব্যবহার করে বলেছেন, اَلْخَلْقُ كُلُّهُمْ عِيَالُ الله 'যাবতীয় সৃষ্টি আল্লাহর পরিবার।'[১৮৫]

অতএব, পারস্পরিক কথাবার্তা ও ভাষার ব্যবহারিক নিয়মাবলির প্রতি লক্ষ না করে أَب বা 'পিতা' শব্দটি এবং ابن বা 'পুত্র' শব্দটির এমন অর্থ ও উদ্দেশ্য গ্রহণ করা যা প্রকাশ্য শিরকের সমার্থবোধক হয়,—বরং তার চেয়েও বেশি জঘন্যতা ও নিকৃষ্টতার সঙ্গে আল্লাহর তাআলার সত্তাকে তিনটি 'মূল' দ্বারা গঠিত বলে প্রকাশ করা হয় এবং আল্লাহকে খণ্ডিত অংশ বানানো হয়—কোনোভাবেই বৈধ হতে পারে না। এটা প্রকাশ্য জুলুম ও শিরকের জন্য উঠেপড়ে লাগা। (تعالى الله علوا كبيرا : আল্লাহ সবকিছুর ঊর্ধ্বে, পাকপবিত্র ও মহামহিম।) বিশেষ করে এমন অবস্থায় যখন ইঞ্জিলসমূহের মধ্যেই ইসা মাসিহ আলাইহিস সালাম আল্লাহ তাআলার সৃষ্ট মানুষ হওয়ার পক্ষে স্পষ্ট দলিল-প্রমাণ বিদ্যমান। যেমন, ইউহান্নার

---

[১৮৫] দেখুন : জামিউল আহাদিস, জালালুদ্দিন সুয়ুতি।

ইঞ্জিলে হযরত ইসা আলাইহিস সালাম-এর এই বাণী উল্লেখ করা হয়েছে—

"আমি তোমাদেরকে সত্য সত্যই বলছি, তোমরা আসমানকে উন্মোচিত অবস্থায় এবং আল্লাহর ফেরেশতাগণকে উপরের দিকে যেতে এবং আদম-সন্তান (মাসিহ)-এর উপর অবতরণ করতে দেখবে।"[১৮৬]

আর ত্রয়োদশ অধ্যায়ে তিনি স্পষ্টভাবে নিজেকে আল্লাহর প্রেরিত রাসুল বলছেন—

"আমি তোমাদেরকে সত্য বলছি, চাকর কখনো তার মনিবের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হয় না এবং রাসুলও কখনো তার প্রেরণকারীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ হয় না।"

আর চতুর্থ অধ্যায়ে বলা হয়েছে—

"কেননা, স্বয়ং ইয়াসু (হযরত ইসা আলাইহিস সালাম) সাক্ষ্য প্রদান করেছেন যে, নবীরা নিজ মাতৃভূমিতে সম্মানপ্রাপ্ত হয় না।"

এবং তৃতীয় অধ্যায়ে বলা হয়েছে—

"আর আসমানের উপরে আরোহণ করে নি, তবে ওই ব্যক্তি ছাড়া যিনি আসমান থেকে অবতরণ করবে। অর্থাৎ, আদম-সন্তান (ইসা), যিনি আসমানে রয়েছেন।"

এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ে রয়েছে—

"সুতরাং, তিনি যে-মুজিযা (নিদর্শন) প্রদর্শন করেছেন, লোকেরা (বনি ইসরাইল) তা দেখে বলতে লাগলো, যে-নবী দুনিয়ার বুকে আগম্য ছিলেন, তিনিই ইনি।"

আর মতির ইঞ্জিলের নবম অধ্যায়ের ষষ্ঠ আয়াতে বলা হয়েছে—

"কিন্তু এইজন্য, যাতে তোমরা জেনে নিতে পারো যে, জমিনের ওপর যাবতীয় পাপ মার্জনা করার অধিকার ও ক্ষমতা আদম-সন্তান (মাসিহ আলাইহিস সালাম)-এর রয়েছে।"

এ ছাড়াও যদি নিউ টেস্টামেন্টে (আহদে জাদিদ) হযরত ইসা মাসিহ আলাইহিস সালাম-এর ابن বা 'পুত্র' শব্দটির প্রয়োগ বিদ্যমান থাকে, তবে ভালো মানুষদের জন্য ابناء الله 'আল্লাহর পুত্রগণ' শব্দের প্রয়োগ

---

[১৮৬] প্রথম অধ্যায়, আয়াত ১৫।

এবং খারাপ লোকদের জন্য ابناء ابليس 'শয়তানের পুত্ররা' শব্দের প্রয়োগও দেখতে পাওয়া যায়।

যেমন, মতির ইঞ্জিলের পঞ্চম অধ্যায়ের নবম আয়াতে বলা হয়েছে—

"তারাই বরকতময় বান্দা যারা মানুষের মধ্যে বন্ধন ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করিয়ে দেয়। কারণ, তাদেরকে আল্লাহর পুত্র বলা হবে।"

আর ইউহান্নার ইঞ্জিলে অষ্টম অধ্যায়ের ৪০ ও ৪১ সংখ্যক আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে—

"ইয়াসু (হযরত ইসা আলাইহিস সালাম) তাদেরকে (বনি ইসরাইলকে) বললেন, 'তোমরা যদি ইবরাহিম (আলাইহিস সালাম)-এর সন্তান হতে, তবে ইসরাহিম (আলাইহিস সালাম)-এর মতো কাজকর্ম করতে।' বনি ইসরাইল তাঁকে বললো, 'আমরা 'হারাম' থেকে পয়দা হই নি; আমাদের পিতা একজন, অর্থাৎ, খোদা।'"

সুতরাং, ত্রিত্ববাদের আকিদার ক্ষেত্রে খ্রিস্টানদের জন্য বিদ্যমান পবিত্র কিতাবসমূহেও (ইঞ্জিল চতুষ্টয়ে) কোনো দলিল বা প্রমাণ পাওয়া যায় না। এ-কারণে কোনো সন্দেহ ও সংশয় ব্যতিরেকেই এ-কথা বলা সঠিক যে, ত্রিত্ববাদের আকিদা মূর্তিপূজামূলক বিশ্বাসাবলির সঙ্গে সংমিশ্রণের ফল।

প্রণিধানযোগ্য বিষয়

এ-বিষয়টি কখনো ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ধর্ম ও মতাদর্শের পরিবর্তন ও বিকৃতি-সাধনে পরিবর্তনকারীরা এ থেকে প্রচুর সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছে যে, মৌলিক আকিদাসমূহকে স্পষ্ট ও পরিষ্কার ভাষায় প্রকাশ করার পরিবর্তে যুগের বর্ণনাকারী, ব্যাখ্যাকারী ও অনুবাদকগণ ইঙ্গিত, রূপক ও উপমা খুব বেশি প্রয়োগ করেছেন। এসব বর্ণনার ফল এই দাঁড়িয়েছে যে, যখন এ-সকল সত্যধর্মকে মূর্তিপূজক ও দার্শনিকদের সামনে পেশ করা হলো এবং কোনো-না-কোনোভাবে তারা সেসব সত্যধর্ম গ্রহণ করলো, তখন তাদের দার্শনিকতাসুলভ ও মুশরিকসুলভ ও চিন্তা ও অনুমানের জন্য এইসব রূপক ও উপমাকে তাদের সহায়ক ও সমর্থক বানিয়ে নিলো এবং ধীরে ধীরে সত্যধর্মের আকৃতি ও অবস্থা বিকৃত করে তাকে পাঁচমিশালি আরকে পরিণত করে ছাড়ালো। এই বাস্ত

বতার প্রতি লক্ষ করেই পবিত্র কুরআন আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব, তাওহিদ ও একত্ব, নবী ও রাসুল প্রেরণ, আসমানি কিতাবসমূহ, আল্লাহ তাআলার ফেরেশতাবৃন্দ—মোটকথা, যাবতীয় মৌলিক আকিদার বর্ণনায় দ্ব্যর্থবোধক শব্দ, জটিল উপমা, তাওহিদে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী রূপক ও ইঙ্গিত ব্যবহারের পরিবর্তে চূড়ান্ত স্পষ্ট ও দুর্বোধ্যতামুক্ত শব্দপ্রয়োগ অবলম্বন করেছে। যাতে খোদাদ্রোহীরা ও ধর্মদ্রোহীরা ও মুশরিক দার্শনিকেরা নির্ভেজাল তাওহিদ ও একত্ববাদে শিরক, ধারণা ও অনুমানের সূক্ষ্ম বিষয় ঢুকিয়ে দেয়ার সুযোগ পেতে না পারে। এমন স্পষ্টতা সত্ত্বেও যদি কোনো অন্যায়ভাবে দুঃসাহস করে, তবে কুরআনের সুস্পষ্ট ও অকাট্য আয়াতসমূহই তার ধর্মদ্রোহিতাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবে।

কাফ্ফারা বা প্রায়শ্চিত্ত

বর্তমানে খ্রিস্টধর্মে যে-দ্বিতীয় আকিদা খ্রিস্টধর্মের সত্যতাকে বিনষ্ট করে দিয়েছে তা হলো কাফ্ফারার আকিদা বা প্রায়শ্চিত্তের বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই অনুমানের ওপর যে, গোটা মানবজগৎ—যেখানে সততাপরায়ণ বান্দা, আল্লাহর পবিত্র নবী ও রাসুল সকলেই অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন—সৃষ্টির প্রথম লগ্ন থেকেই পাপবিদ্ধ ছিলো। অবশেষে আল্লাহর রহমত উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো এবং তাঁর অভিপ্রায় সিদ্ধান্ত নিলো যে, আপন পুত্রকে পৃথিবীর বুকে প্রেরণ করবেন এবং ওই পুত্র শূলিবিদ্ধ হয়ে আদি ও অন্ত গোটা বিশ্ববাসীর সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত (কাফ্ফারা) হয়ে যাবেন এবং এইভাবে মানবজগৎ পাপ থেকে পরিত্রাণ পাবে। কিন্তু এই আকিদার ভিত্তি প্রস্তুত করতে কয়েকটি জরুরি বিষয়ের প্রয়োজন ছিলো, যা ব্যতিরেকে এই ইমারত দাঁড় করানো সম্ভব হচ্ছিলো না। এ-কারণে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগে সর্বপ্রথম খ্রিস্টধর্ম ইহুদিধর্মের এই আকিদা মেনে নিলো যে, আল্লাহর পুত্রকে (ইসা মাসিহকে) শূলেও চড়ানো হয়েছিলো এবং হত্যাও করা হয়েছিলো। এই আকিদা সাধারণ মানুষের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতার মর্যাদা লাভ করার পর তাদের দ্বিতীয় প্রচেষ্টা ছিলো এই যে, 'খোদা' হওয়া সত্ত্বেও মাসিহ আলাইহিস সালাম-এর শূলিবিদ্ধ হওয়া ও নিহত হওয়া তাঁর নিজের জন্য

ছিলো না; বরং মানবজগতের পরিত্রাণের জন্য ছিলো। ফলে, যখন তাঁর ওপর এই ঘটনা ঘটে গেলো, তিনি আবার খোদাত্বের চাদর পরিধান করে নিলেন এবং আলমে লাহুতে বা অদৃশ্য জগতে পিতা ও পুত্রের মধ্যে পুনরায় সম্পর্ক স্থাপিত হলো।

সুতরাং, যখন ধর্মের মধ্যে মহান আল্লাহর সঙ্গে আকিদার বিশুদ্ধতা ও সৎকর্মপরায়ণতার সম্পর্ক বিলুপ্ত হয় এবং পরিত্রাণের ভিত্তি আমল ও সৎকাজের পরিবর্তে 'কাফ্ফারা' বা 'প্রায়শ্চিত্তে'র ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তার পরিণতি কী হয় তা কি অজানা?

পবিত্র কুরআন এ-কারণেই জায়গায় জায়গায় পরিষ্কার ভাষায় বলে দিয়েছে যে, পরিত্রাণ ও নাজাতের জন্য আকিদার বিশুদ্ধতা, অর্থাৎ, একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর যথার্থ ইবাদত ও সৎকর্ম ছাড়া আর কোনো পথ নেই। আর যে-কোনো ব্যক্তি এই সিরাতে মুস্তাকিম বা সরল পথকে পরিত্যাগ করে মনগড়া আকিদা এবং ধারণা ও অনুমানকে তার ধর্মাদর্শ বানিয়ে নেবে এবং সৎকর্ম ও যথার্থ ইবাদের ওপর অটল থাকবে না, সে সন্দেহাতীতভাবে পথভ্রষ্ট এবং সিরাতে মুস্তাকিম থেকে বিচ্যুত। আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেছেন—

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (سورة البقرة)

"নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে, যারা ইহুদি হয়েছে, এবং খ্রিস্টান ও সাবিয়িন[১৮৭]—যারাই আল্লাহ ও আখেরাতে ঈমান আনে[১৮৮] ও সৎকাজ করে, তাদের জন্য পুরস্কার আছে তাদের প্রতিপালকের কাছে। তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।" [সূরা বাকারা : আয়াত ৬২]

---

[১৮৭] সাবিয়িন বহুবচন, সাবি একবচন, অর্থা : যে-ব্যক্তি নিজের ধর্ম পরিত্যাগ করে অন্য ধর্ম গ্রহণ করে।—কুরতুবি। সে যুগে প্রচলিত সকল দীন থেকে তাদের পছন্দমত কিছু কিছু বিষয় তারা গ্রহণ করে নিয়েছিলো। তারা নক্ষত্র ও ফেরেশতার পূজা করতো। উমর রা. তাদেরকে কিতাবিদের মধ্যে গণ্য করেছেন।

[১৮৮] আল্লাহ তাআলার সকল নির্দেশের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে।

অর্থাৎ, পবিত্র কুরআন কর্তৃক বাতিল ধর্ম ও মতাদর্শের সংশোধনের আহ্বান জানানোর উদ্দেশ্য এই নয় যে, ইহুদি, নাসারা ও সাবিয়িন সম্প্রদায়গুলোর মতো একটি নতুন সম্প্রদায় মুমিন নাম ধারণ করে এইরূপে তাদের সঙ্গে যুক্ত হবে যে, তারাও একটি জাতিগত বা বংশগত বা দেশভিত্তিক দল এবং তাদের ইবাদত ও আমলের যিন্দেগি যতই ভ্রান্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হোক, যতই ধ্বংসাত্মক হোক, বা একেবারে না-ই হোক, এই দলটির সদস্য হওয়ার কারণে অবশ্যই সফলকাম হবে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাতের অধিকারী হবে। কুরআনের উদ্দেশ্য কখনোই এমন নয়। বরং কুরআন এই পয়গাম ঘোষণা করতে এসেছে যে, তার সত্যের প্রতি আহ্বানের পূর্বে কোনো ব্যক্তি যে-কোনো সম্প্রদায় বা যে-কোনো ধর্মীয় গোষ্ঠীর সঙ্গে রাখুক না কেনো, যদি সে কুরআনের সত্যের শিক্ষা অনুযায়ী আল্লাহ তাআলার ইবাদত ও সৎকাজ অবলম্বন করে, তবে নিঃসন্দেহে পরিত্রাণ পাবে ও সফলকাম হবে। অন্যথায়, সে যদি মুসলমানের ঘরেও জন্মলাভ করে, প্রতিপালিত হয় এবং মুসলমানদের সমাজেই জীবনযাপন করে মৃত্যুবরণ করে; কিন্তু কুরআনের সত্যের আহ্বান অনুযায়ী আল্লাহ তাআলার যথার্থ ইবাদত ও নেক আমল থেকে বঞ্চিত থাকে বা তার বিরোধী হয়, তবে তার জন্য সফলতাও নেই, পুরস্কার ও প্রতিদানও নেই।

বাকি থাকলো খ্রিস্টানদের ত্রিত্ববাদের বিশেষ ব্যাপারটি। তো পবিত্র কুরআন একে বাতিল ও খণ্ডন করার জন্য এই পথ অবলম্বন করেছে যে, যে-ভিত্তিগুলোর ওপর ত্রিত্ববাদের আকিদাকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে, কুরআন সেগুলোর শেকড় কেটে দিয়েছে। ইতোপূর্বে হযরত ইসা আলাইহিস সালামকে শূলিবিদ্ধ ও হত্যা করার বিষয়টিকে অস্বীকার এবং তাঁকে উর্ধ্বলোকে তুলে নেয়ার বিষয়টিকে দালিলিকভাবে প্রমাণিত করার আলোচনায় এ-ব্যাপারে যথেষ্ট আলোকপাত করা হয়েছে।